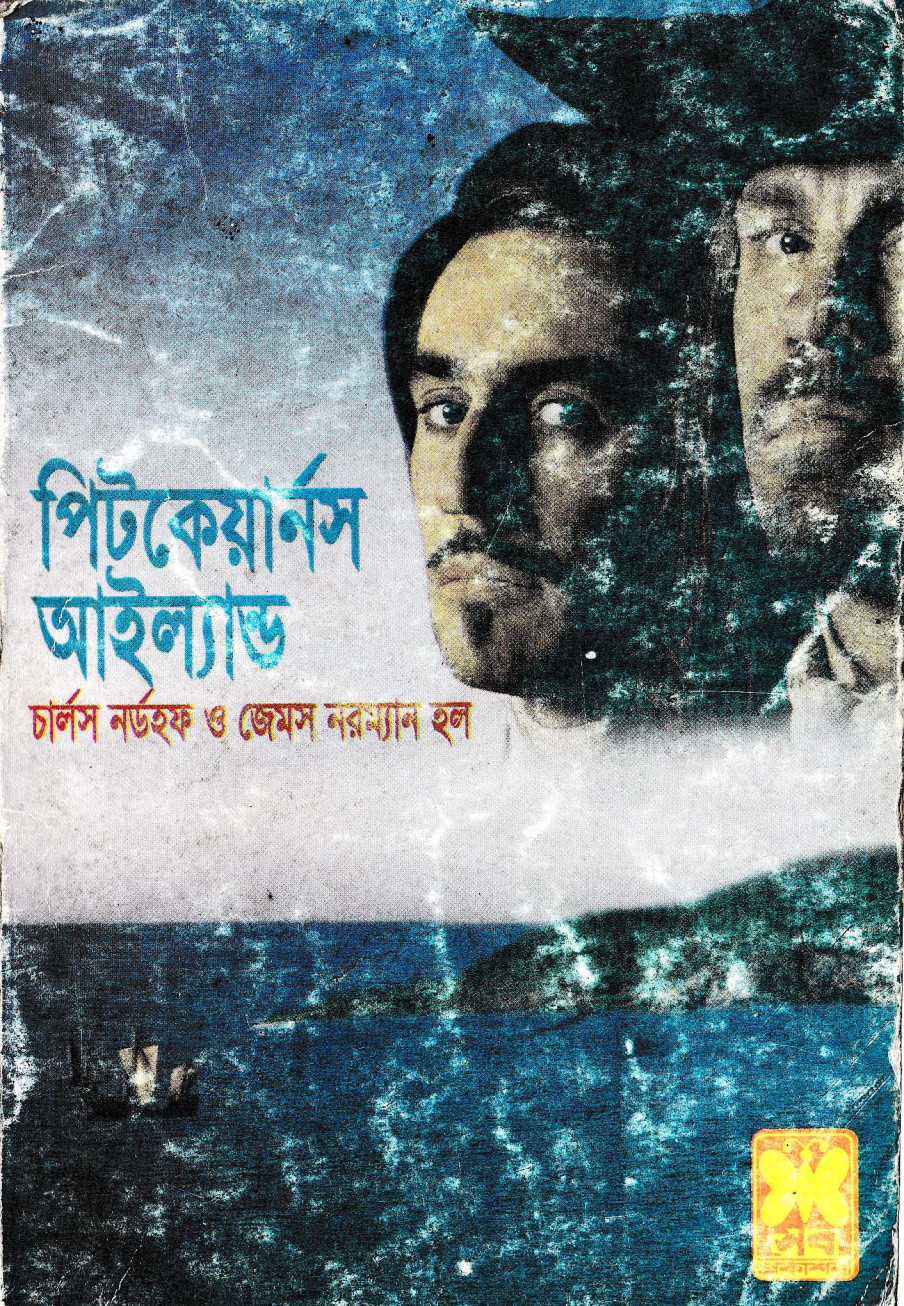

পিটকেয়ার্নস আইল্যান্ড

চার্লস নর্ডহফ ও জেমস নরম্যান হল

অনুবাদ

চার্লস নর্ডহফ ও জেমস নরম্যান হল-এর

পিটকেয়ার্নস আইল্যান্ড

রূপান্তরঃ নিয়াজ মোরশেদ

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-3090-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৮
দ্বিতীয় প্রকাশ: ২০০৩

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M.M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.amcbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

PITCAIRN'S ISLAND
By: Charles Nordhoff/James Norman Hall
Trans. by: Neaz Morshed

পঞ্চাশ টাকা

পিটকেয়ার্নস আইল্যান্ড

সেবা প্রকাশনীর
ক'টি কিশোর ক্লাসিক

লিউ ওয়ালেস/কাজী মায়মুর হোসেন
বেন-হার
চার্লস নর্ডহফ ও জেমস্ নরম্যান হল/নিয়াজ মোরশেদ
বাউন্টিতে বিদ্রোহ
সারভান্তেস/নিয়াজ মোরশেদ
ডন কুইক্সোট
কানাইলাল রায়
কিশোর রামায়ণ
দশ কুমার চরিত
শেক্সপীয়ার/কাজী শাহনূর হোসেন
নাটক থেকে গল্প
ভিক্টর হ্যুগো
লা মিজারেবল/**ইফতেখার আমিন**
দ্য ম্যান হু লাফস/**শেখ আবদুল হাকিম**
চার্লস ডিকেন্স/নিয়াজ মোরশেদ
অলিভার টুইস্ট
আ টেল অভ টু সিটিজ
মার্ক টোয়েন/শেখ আবদুল হাকিম
পুডন্‌হেড উইলসন
এমিলি ব্রনটি/নিয়াজ মোরশেদ
ওয়াদারিং হাইটস
হ্যারিয়েট বীচার স্টো/অনীশ দাস অপু
আঙ্কল টমস কেবিন
হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
চাইল্ড অভ স্টর্ম/**কাজী মায়মুর হোসেন**
মর্নিং স্টার/**নিয়াজ মোরশেদ**
লর্ড লিটন/নিয়াজ মোরশেদ
দ্য লাস্ট ডেজ অভ পম্পেই
লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডার/কাজী আনোয়ার হোসেন
ফার্মার বয়
লিটল হাউজ অন দ্য প্রেয়ারি
অন দ্য ব্যাঙ্কস অভ প্লাম ক্রীক
লিটল টাউন অন দ্য প্রেয়ারি
রাফায়েল সাবাতিনি/কাজী আনোয়ার হোসেন
দ্য ব্ল্যাক সোয়ান
লাভ অ্যাট আর্মস
টমাস হার্ডি/কাজী শাহনূর হোসেন
টেস অভ দ্য ডার্বারভিল
ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড
জুড দ্য অবসকিওর
দ্য মেয়র অভ ক্যাস্টারব্রিজ
চার্লস কিংসলে/শেখ আবদুল হাকিম
হাইপেশিয়া
এইচ. দ্য ভের স্ট্যাকপোল/মামনুন শফিক
ব্লু লেগুন
হেনরি হল কেইন/কাজী মায়মুর হোসেন
দ্য বন্ডম্যান
স্ট্যানলি ওয়েইম্যান/কাজী আনোয়ার হোসেন
আ জেন্টলম্যান অভ ফ্রান্স
আলেকজান্ডার বেলায়েভ/কাজী মায়মুর হোসেন
দি অ্যামফিবিয়ান ম্যান
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে/শেখ আবদুল হাকিম
দ্য ফিফথ্ কলাম
আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস/নিয়াজ মোরশেদ
আলেকজান্দার দ্যুমা/শেখ আবদুল হাকিম
মার্গারেট ডি-ভ্যালয়
জেরাল্ড ডুরেল/অনীশ দাস অপু
মানবজন্তু
রবার্ট লুই স্টিভেনসন/নিয়াজ মোরশেদ
কিডন্যাপড

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

ভূমিকা

'বাউন্টি' বিষয়ক ত্রয়ী উপন্যাসের শেষ এবং সম্ভবত সবচেয়ে চমকপ্রদ আর রোমান্টিক পর্ব 'পিটকেয়ার্ন'স আইল্যান্ড'। টুপুয়াই দ্বীপে বসতি গড়ে তোলার দুটি ব্যর্থ চেষ্টার পর বিদ্রোহীরা ফিরে আসে তাহিতিতে। সেখানে ওরা দু'ভাগ হয়ে যায়। বাউন্টির ভারপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট ও বিদ্রোহের হোতা ফ্লেচার ক্রিশ্চিয়ান আবার জাহাজে চেপে রওনা হয়ে যায় অজানা গন্তব্যের পথে। তার সঙ্গী হয় আট জন বিদ্রোহী আর আঠারো জন পলিনেশীয় (বারোজন নারী ছ'জন পুরুষ)। ১৭৮৯-এর সেপ্টেম্বরে ওরা যাত্রা করে তাহিতি থেকে; পরের আঠারোটা বছর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি লোকগুলোর। ১৮০৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকান সীল শিকারী জাহাজ 'টোপায' নোঙ্গর ফেলে পিটকেয়ার্ন উপকূলে এবং আবিষ্কার করে, এতদিন জনহীন বলে কথিত দ্বীপটিতে বাস করে মিশ্র রক্তের এক নবীন জনগোষ্ঠী। কিছু মধ্যবয়সী পলিনেশীয় নারী আর বিশজনেরও বেশি শিশু-কিশোর অবস্থান করছে সাদাচুলওয়ালা এক ইংরেজ নাবিকের সদয় শাসনাধীনে। এই নাবিকের নাম আলেকজান্ডার স্মিথ–আঠারো বছর আগে যে পনেরো পুরুষ এখানে অবতরণ করেছিল তাদের একমাত্র জীবিত জন।

টোপায পৌঁছুনোর আগের আঠারো বছরে পিটকেয়ার্ন-এ যা ঘটেছে সে সম্পর্কে অনেকগুলো পরস্পর বিরোধী বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। সবগুলোরই সূত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আলেকজান্ডার স্মিথ (বা জন অ্যাডামস, স্মিথ পরে এ নামে নিজের পরিচয় দিত)। প্রথমবার সে তাঁর কাহিনী শোনায় টোপাযের ক্যাপ্টেন ফলগারকে; তাপর ১৮১৪ সালে ইংলিশ ফ্রিগেট 'ব্রিটন' আর 'ট্যাগাস'-এর ক্যাপ্টেন যথাক্রমে স্টেইনস আর পিপনকে; তারপর ১৮২৫-এ এইচ.এম.এস. ব্লসম-এর ক্যাপ্টেন বীচিকে; এবং সবশেষে ১৮২৯-এ 'ভয়েজেস অ ইলে দু গ্রঁদ ওশঁ'-এর লেখক জে. এ. মোরেনহউকে। আরও পরে ১৮৫০-এ ওয়াল্টার ব্রোডি 'স্টোরি অভ পিটকেয়ার্ন আইল্যান্ড' নাম দিয়ে এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন আর্থার (ম্যাথু কুইনটালের ছেলে) আর রোজালিন্ড ইয়ং-এর কাছ থেকে শুনে।

এই সব বিবরণীর প্রত্যেকটা অন্যগুলো থেকে অদ্ভুতভাবে পৃথক। সে কারণে লেখকদ্বয় প্রতিটি বিবরণী সতর্কতার সঙ্গে পাঠ ও বিশ্লেষণ করে সময়ের ক্রম যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রেখে যুক্তিসংগত এবং কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত এক নতুন বিবরণী উপস্থাপন করেছেন এ বইয়ে। বলা বাহুল্য বইটির পুরোপুরি রসাস্বাদন করতে হলে 'বাউন্টিতে বিদ্রোহ' উপন্যাসটি আগে পড়ে নেয়া প্রয়োজন।

পিটকেয়ার্ন-জনগোষ্ঠী

বাউন্টির পুরুষরা	**তাদের নারীরা**
ফ্লেচার ক্রিশ্চিয়ান	মাইমিতি
এডওয়ার্ড ইয়ং	টাউরুয়া
আলেকজান্ডার স্মিথ	বলহাদি
জন মিলস	প্রুডেন্স
উইলিয়াম ম্যাককয়	মেরি
ম্যাথু কুইনটাল	সারাহ
জন উইলিয়ামস	ফাসটো (পরে হুটিয়া)
আইজাক মার্টিন	সুজানাহ
উইলিয়াম ব্রাউন	জেনি
ইন্ডিয়ান পুরুষরা	**তাদের নারীরা**
মিনারী	মোয়েটুয়া
তেতাহিতি	নানাই
টারারু	হুটিয়া
তে মোয়া	
নিহাউ	

পিটকেয়ার্নস আইল্যান্ড

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৮

এক

চারপাশে প্রশান্ত মহাসাগরের সুবিশাল বিস্তৃতি। সূর্য উঠছে মেঘমুক্ত পুব দিগন্তকে রাঙা করে দিয়ে। সাগরেও ঝরে পড়েছে তার লাল। অতীতের লক্ষ সকালের মত আরও একটা সকাল উঠে আসছে মহাকালের গর্ভ হতে। এরই ভেতর একটা জাহাজ এগিয়ে চলেছে ডাঙার সন্ধানে।

দু'বছর আগে স্পিটহেড থেকে রওনা হয়েছিল হিজ ম্যাজেস্টির সশস্ত্র জাহাজ বাউন্টি দক্ষিণ সাগরের তাহিতির পথে। উদ্দেশ্যটা ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের: ওখান থেকে কয়েক হাজার রুটিফলের চারা সংগ্রহ করে পৌঁছে দেবে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ব্রিটিশ খামারগুলোয়। আশা করা হয়েছিল ওগুলো দিয়ে সস্তায় ওখানকার ক্রীতদাসদের খাবারের চাহিদা পূরণ করা যাবে। বাউন্টি সাফল্যের সাথে তাহিতিতে তার দায়িত্ব শেষ করে রওনা হয়েছিল পশ্চিম দিকে। ফ্রেন্ডলি আর্কিপিলাগো বা টোঙ্গান গ্রুপের দ্বীপ তোফোয়ার কাছে পৌঁছে জাহাজটার সেকেন্ড ইন কম্যান্ড ফ্লেচার ক্রিশ্চিয়ান বিদ্রোহ করে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম ব্লাইয়ের বিরুদ্ধে। ক্যাপ্টেনের আচরণ তার কাছে মনে হয়েছিল নিষ্ঠুর এবং অসমর্থনযোগ্য। হঠাৎই বিদ্রোহের পরিকল্পনা করে সে এবং দ্রুত কাজ শুরু করে দেয় ১৭৮৯-এর ২৮ এপ্রিল ভোরে। ক্যাপ্টেন ব্লাইকে আঠারো জন অনুগত লোকসহ জাহাজের লঞ্চে নামিয়ে ভাসিয়ে দেয়া হয় সাগরে। এরপর আর কখনও তাঁদের দেখেনি বিদ্রোহীরা। টুপুয়াই দ্বীপে বসত করার এক ব্যর্থ চেষ্টার পর বাউন্টি ফিরে আসে তাহিতিতে। বিদ্রোহীদের কয়েকজন আর কয়েকজন নিরপরাধ নাবিক–যারা বাধ্য হয়ে বিদ্রোহীদের সাথে থেকে গিয়েছিল–রয়ে যায় সেখানে। বাকিরা ফ্লেচার ক্রিশ্চিয়ানের নেতৃত্বে আবার ভেসে পড়ে অজানার পথে। সঙ্গে যায় ছ'জন তাহিতীয় পুরুষ আর বারোজন নারী। সারা দক্ষিণ সাগর চষে তারা খুঁজতে থাকে একটা স্থায়ী আবাস–সভ্য জগতের অজানা একটি দ্বীপ, এমন দ্বীপ, যেখান থেকে অ্যাডমিরালটির সুদীর্ঘ বাহুও কোনদিন ধরতে পারবে না তাদের।

জাহাজের পেছনে খাঁচায় পোরা রয়েছে অনেকগুলো ছাগল, শুয়োর আর কয়েকশো মোরগ মুরগি। তাহিতি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে সব। তাদের ব্যা-ব্যা, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আর কক-কক শব্দে মুখর জায়গাটা। রেলিংয়ের কাছে দুটো কাটারে বড় নৌকা স্তূপ হয়ে আছে ইয়াম। বেশির ভাগই বিরাটায়তনের। কোন কোনটার ওজন হবে পঞ্চাশ পাউন্ডেরও বেশি। প্রধান হ্যাচের কাছে বসে আছে সুশ্রী কয়েকটি পলিনেশীয় তরুণী। সংগীতের মত মধুর স্বরে তারা গল্প করছে নিজেদের ভেতর, মাঝে মাঝে গড়িয়ে পড়ছে উচ্ছ্বসিত খিলখিল হাসিতে। হালের চাকা ধরে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী ম্যাথু কুইনটাল। যখন চাকা ঘোরাচ্ছে মৃদু ঢেউ খেলে যাচ্ছে তার

উল্কি আঁকা বাহুতে।

দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হালকা বাতাস ধীরে ধীরে পড়ে আসছে। একটু পরেই জাহাজ গতি হারিয়ে মৃদু দুলতে লাগল শান্ত সাগরের দোলায়। আড়কাঠ থেকে ঝুলে থাকা পালগুলো লটপট করছে। উত্তর দিগন্তে মেঘ জমতে শুরু করেছে। পিঠ সোজা করে কুইনটাল তাকাল দূরের কালচে, ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে এগিয়ে আসতে থাকা দেয়ালটার দিকে।

মই বেয়ে ওপরে উঠে এল ক্রিশ্চিয়ান। সদ্য দাড়ি কামানো গাল। পরনে নীল কোট। বিষুবীয় অঞ্চলের রোদে পুড়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে মুখ। কুইনটালের দৃষ্টি অনুসরণ করে সে-ও তাকাল উত্তরে, এগিয়ে আসা ঝড়ের দিকে।

'স্মিথ!' ডাকল ক্রিশ্চিয়ান।

গাট্টাগোট্টা এক তরুণ নাবিক দাঁড়িয়ে ছিল প্রধান মাস্তুলের কাছে। পেছনে চলে এল ডাক শুনে।

'পাল চিৎ করে তৈরি হও পানি ধরার জন্যে!'

'জি, স্যার!'

'সবাই, এখানে এসো! পাল চিৎ করতে হবে!' চিৎকার করতে করতে সামনে চলে গেল স্মিথ।

এক দল শ্বেতাঙ্গ নাবিক উঠে এল ফোকাস্‌ল থেকে। পলিনেশীয় লোকগুলো সরে গেল রেলিংয়ের পাশ থেকে। তরুণীদের কয়েক জন উঠে দাঁড়াল।

'সবাই যার যার জায়গায়!' নির্দেশ দিল স্মিথ। 'সামনের পাল আর প্রধান পাল নামিয়ে আনো খানিক। এবার ওপাশটা টেনে উঁচু করো!'

বড়দুটো পালের নিচের দিক ধীরে ধীরে উঠে গেল ওপরে। শামিয়ানার মত ঝুলতে লাগল জাহাজের ওপর। সবচেয়ে কাছে যে খালাসীকে দেখল তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করল স্মিথ:

'ম্যাককয়! মার্টিনকে নিয়ে পিপেগুলো ভরার জন্যে তৈরি হও! হাত চালাও!'

কোয়ার্টার ডেকে পায়চারি করছে ক্রিশ্চিয়ান। উত্তরের কালো হয়ে আসা আকাশের দিকে দৃষ্টি।

'স্মিথ!' ডাকল ও, 'বাকি পালগুলো বাঁ দিকে কষে বাঁধো!'

'বাঁধা হয়েছে, স্যার!' একটু পরে চিৎকার শোনা গেল স্মিথের।

বাউন্টির বর্তমান সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড এডওয়ার্ড ইয়ং উঠে এসেছে মইয়ের মাথায়। বছর চব্বিশেক বয়েস লোকটার। সামনের কয়েকটা দাঁত না থাকায় একটু বেশি সাবধানী মনে হয় ওকে। মাত্র দু'ঘণ্টা আগে দায়িত্ব শেষ করে শুতে গেছিল সে। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে আসায় চোখ দুটো এখনও ঢুলু ঢুলু।

'চেহারা খুব সুবিধার মনে হচ্ছে না,' উত্তরের মেঘটার দিকে তাকিয়ে ও মন্তব্য করল।

'দূর, দূর, সামান্য ঝড় আর একটু বৃষ্টি! উপরের পালগুলো খাটানোই থাকছে। খালি পিপেগুলো ভরে নেব এই সুযোগে।...কার্টারেট অক্ষাংশ হিসেব করতে ভুল করেছিল, আমার বিশ্বাস হয় না। তবে ওর ঘড়িটা যে যাচ্ছেতাই ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ওর দ্রাঘিমাংশের অন্তত একশো মাইল পুবে চলে এসেছি আমরা।'

হতাশ ভঙ্গিতে একটু হাসল ইয়ং। 'ওর সেই পিটকেয়ার্ন দ্বীপ–আদৌ আছে কিনা আমার সন্দেহ হতে শুরু করেছে। কখন আবিষ্কার করেছিল দ্বীপটা?'

'১৭৬৭-তে, যখন ও 'সোয়ালো'র ক্যাপ্টেন ছিল। প্রায় পনেরো লিগ দূর থেকে দ্বীপটা দেখেছিল। বড়সড় একটা পাথরের ঢিবি ছাড়া আর কিছু ওর মনে হয়নি, পাঁচ মাইলের বেশি হবে না বেড়। প্রচুর গাছপালা আছে, পাহাড় থেকে একটা ঝরনাও নাকি নেমে আসতে দেখেছিল।'

'নামেনি দ্বীপটায়?'

'না। খুব ঢেউ ছিল উপকূলে। পশ্চিম পাশে পঁচিশ ফ্যাদম গভীরতা পর্যন্ত যেতে পেরেছিল, মানে তীর থেকে মাইল খানেক দূরে।...এখানেই কোথাও আছে দ্বীপটা। যতক্ষণ না দেখা পাচ্ছি ততক্ষণ খুঁজে দেখতে চাই।' এক মুহূর্ত নীরব থেকে ক্রিশ্চিয়ান যোগ করল, 'লোকজন কি গাইগুঁই শুরু করেছে?'

'সবাই না, তবে অনেকেই অস্থির হয়ে উঠেছে।'

মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল ক্রিশ্চিয়ানের। 'করুক,' বলল ও। 'আমার কথা মতই চলতে হবে ওদের।'

ঝড়টা এসে গেছে। পশ্চিম থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে দিগন্তের। বাতাস বইতে শুরু করেছে এলোমেলো ভাবে। একমুহূর্ত পর বাউন্টি কেঁপে উঠল দমকা হাওয়ার প্রথম ধাক্কায়। উপরের পালগুলো কামানের গর্জনের মত শব্দ তুলে ফুলে উঠল। দড়িদড়ার ভেতর দিয়ে শিস কেটে ছুটে যেতে লাগল বাতাস। সূর্য ঝাপসা হয়ে এল বৃষ্টির তোড়ে।

'ডেকে ঘুরাও সামান্য হাল!' হেলমসম্যানের উদ্দেশ্যে চিৎকার করল ক্রিশ্চিয়ান।

এক ঘণ্টার ভেতর সাগর আবার শান্ত। মেঘ মিলিয়ে গেছে। সূর্য উঠে এসেছে দিগন্তের অনেকটা ওপরে। এর মধ্যেই শুকাতে শুরু করেছে বাউন্টির ডেক। বড় পালগুলো আবার ঠিকঠাক মত খাটানো হয়েছে। নির্ধারিত গতিপথে চলতে শুরু করেছে জাহাজ।

ইয়ং নিচে চলে গেছে। ক্রিশ্চিয়ান একা রেলিংয়ে হেলান দিয়ে তাকিয়ে আছে শূন্য সাগরের দিকে। চিন্তামগ্ন ও।

দীর্ঘাঙ্গিনী এক তরুণী উঠে এল মই বেয়ে। হালকা পায়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল ওর পাশে। হাত রাখল কাঁধে। আঠারোও হয়নি মাইমিতির বয়েস। এ বয়েসেই, তাহিতির উচ্চ বংশে জন্ম সত্ত্বেও, শ্বেতাঙ্গ প্রেমিকের হাত ধরে ছেড়ে এসেছে নিজের দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব। মিষ্টি দেখতে মেয়েটি। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। এক নজরেই জাহাজের আর সব পলিনেশীয় মেয়ে থেকে আলাদা করে চেনা যায় ওকে। কাঁধে ওর হাতের স্পর্শ পেতেই নরম হয়ে এল ক্রিশ্চিয়ানের মুখ।

'আজ আমরা ডাঙার দেখা পাব?' জিজ্ঞেস করল মাইমিতি।

'আশা করি। আমার মনে হয় না আর বেশি দূর যেতে হবে আমাদের।'

আর কিছু বলল না মাইমিতি। ক্রিশ্চিয়ানের মতই দু'কনুই রেলিংয়ের ওপর রেখে ঝুঁকে তাকিয়ে রইল সাগরের দিকে।

পেছনে ক্রিশ্চিয়ান আর মাইমিতি যখন এভাবে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তখন

সামনে, চরকি কলের ছায়ায় সবার অলক্ষ্যে নিচুস্বরে আলাপ করছে দুই শ্বেতাঙ্গ। একজন ম্যাককয়–নামটা আইরিশ হলেও জাতিতে সে স্কট: রোগা পাতলা, লালচে চুল মাথায়; অন্যজন আইজাক মার্টিন–আমেরিকান, দক্ষিণ সাগরের প্রাচুর্যময় দ্বীপগুলো দেখার আশায় ও নিজের জাহাজ ছেড়ে কাজ নিয়েছিল বাউন্টিতে। বছর ত্রিশেক বয়েস লোকটার, চেহারায় তেমন দৃঢ়তা না থাকলেও দৃষ্টিতে কেমন এক বুনো ভাব।

'যথেষ্ট সময় তো ওকে দিলাম, উইল,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মার্টিন। 'আমার মত যদি চাও তো বলব, অমন কোন দ্বীপ আসলে নেই! যদি থাকেও, কাছাকাছি কোথাও না।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। খামোকা বুনো রাজহাঁসের পেছনে ছুটে মরছি।'

'তাহলে চলো, ওকে বলি, এরকম উদ্দেশ্যহীন ভেসে বেড়াতে আর রাজি নই আমরা! মিলস-এর মতও তাই, ম্যাট কুইনটালও আমাদের দলে; আর ব্রাউন আমরা যা বলব তাই করবে। আলেক্সকে অবশ্য আগে থাকতে কিছু না বলাই ভাল; ক্রিশ্চিয়ান ওর কাছে ঈশ্বরের মত! আমার মনে হয় জ্যাক উইলিয়ামসও আমাদের মতেই মত দেবে। তাহলে দাঁড়ালটা কী?–আমরা ছ'জন আর ওরা তিন জন।...পশ্চিম দিকে যে দ্বীপটা দেখেছিলাম ওটার নাম যেন কী?'

'রারোটোঙ্গা, ইন্ডিয়ানরা বলে।'

'হ্যাঁ, ওটাই ঠিক জায়গা! দারুণ সব মেয়ে আছে ওখানে। আমি বলে রাখছি,' দেখো, এই পিটকেয়ার্ন দ্বীপের দেখা যদি পাইও দেখবে, স্রেফ একটা পাথরের পাঁজা ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের সঙ্গে যে ক'টা মেয়ে আছে এর বেশি একটাও পাব না। বারো জন পনেরো জন পুরুষের জন্যে!'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাককয়। 'হ্যাঁ, এটা একটা বড় সমস্যা। আরও অন্তত তিনটি মেয়ে যদি না পাওয়া যায় দুর্ভোগ আছে কপালে।'

'তাহলে বলো?–রারোটোঙ্গায় যদি এমনিতেই অনেক মেয়ে পাই, কেন আমরা যাব না? চলো, আমার মনে হয় সময় হয়েছে; ওর ইচ্ছে থাক আর না থাক, ওখানেই ওকে যেতে বাধ্য করতে হবে!'

'বাধ্য করতে হবে! ঈশ্বরের কসম, আইজাক, কেউ যখন শোনার থাকে না, দুর্দান্ত সাহসীর মত কথা বলো তুমি!'

মার্টিন জবাব দিতে গিয়েও চেপে গেল। কখন যে স্মিথ এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে, টের পায়নি ওরা। স্মিথ লোকটার শারীরিক গড়ন বিশাল, গায়ে শক্তিও ধরে তেমনি; যদিও বয়েস খুব বেশি না, বাইশ তেইশ হবে। নীল চোখগুলো বড় বড়, মুখে বসন্তের দাগ সামান্য। উল্কি আঁকা বাহু দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে দুই সহকর্মীর দিকে বিদ্রূপের হাসি ছুঁড়ে মারল সে। বিরক্ত চোখে ওর দিকে তাকাল মার্টিন।

'হ্যাঁ, আলেক্স,' বলল সে, 'তোমার আর জ্যাক উইলিয়ামস-এর জন্যেই আমাদের এই দশা–দু'সপ্তারও বেশি হয়ে গেল খোলা সাগরের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছি। তোমরা যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে, ক্রিশ্চিয়ানকে আমরা অনেক আগেই বাধ্য করতে পারতাম অন্য কিছু করতে।'

ম্যাককয়-এর দিকে ফিরল স্মিথ। 'শুনেছ কথা, উইল! আইজাক মিস্টার

ক্রিশ্চিয়ানকে কর্তব্য শেখাবে! কোথায় যেতে হবে আমাদের সবার চেয়ে ভাল জানেন উনি!'

'তবু, আলেক্স,' দোষ স্বীকারের ভঙ্গিতে বলল ম্যাককয়, 'কথাগুলো আসছে আমাদের মনে। তিনমাস হয়ে গেল আমরা তাহিতি ছেড়ে এসেছি, আর দু'সপ্তা ধরে খুঁজে মরছি এই পিটকেয়ার্ন দ্বীপ! এরকম একটা জায়গা যে আছে কী করে জানল ও?'

'কি জ্বালা! তোমরা কি ভাবো মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান এমনই বোকা, যে যার অস্তিত্ব নেই তা-ই খুঁজে বেড়াচ্ছেন দু'সপ্তা ধরে ? আমি বলছি, এ সপ্তা শেষ হওয়ার আগেই খুঁজে পাওয়া যাবে দ্বীপটা।'

'যদি না যায়, তাহলে?' জিজ্ঞেস করল মার্টিন।

'তা হলে কী হবে তুমি নিজেই ওঁকে জিজ্ঞেস করে দেখো। আমার মনে হয় ভাল মতই তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।'

মাস্তুলের ওপর থেকে ভেসে আসা এক চিৎকারে ছেদ পড়ল ওদের আলাপে।

'কী হয়েছে?' পাল্টা চিৎকার করল স্মিথ। 'কী দেখতে পেলে?'

'পাখি! মেঘের মত ঝাঁক! সোজা সামনে!'

পেছনের ডেকে মাইমিতির সঙ্গে পায়চারি করছিল ক্রিশ্চিয়ান। দাঁড়িয়ে পড়ল কথাগুলো শুনে।

'নিচে থেকে আমার স্পাই গ্লাসটা নিয়ে এসো তো,' মাইমিতিকে বলল ও।

কয়েক মিনিট পরেই দেখা গেল দূরবীন হাতে মাস্তুল বেয়ে উঠছে ক্রিশ্চিয়ান। স্থানীয়দের একজনও উঠছে পেছন পেছন। তার অভ্যস্ত চোখ এক পলক তাকিয়েই বুঝতে পারল দিগন্তের মেঘটা আসলে পাখির ঝাঁক। ক্রিশ্চিয়ান চোখ থেকে দূরবীন নামাতে ও বলল:

'টার্ন (এক ধরনের সামুদ্রিক চিল)। আর ওই দেখ, ওখানে আলবাকোর (এক ধরনের মাছ)। ডাঙা বেশি দূরে নেই।'

মাথা ঝাঁকাল ক্রিশ্চিয়ান। 'জাহাজ খুব আস্তে চলছে,' বলল সে। 'একটা ক্যানো নামিয়ে দেখ তো মাছ ধরতে পারো নাকি কিছু। আরও দুজনকে সঙ্গে নিয়ে নাও।'

দ্রুত দড়ির মই বেয়ে নেমে এল স্থানীয় লোকটা। সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করল :

'ছিপ, লাঠি নিয়ে এসো। মাছ ধরতে যাব।'

রেলিঙের ধারে লম্বা একটা ক্যানো কাত করে রাখা। ওটা সোজা করে তিন পলিনেশীয় উঠে বসল তাতে। বাউন্টির নাবিকরা বাকি পলিনেশীয়দের সহায়তায় ক্যানোটা নামিয়ে দিল সাগরে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জাহাজের আগে চলে গেল ওটা।

বাউন্টি তার নির্ধারিত গতিপথেই চলতে লাগল। ক্যানোটা দ্রুত এগিয়ে গেল তাকে পেছনে ফেলে। একটু পরেই একজন ছিপ ফেলে বসল, বাকি দু'জন বৈঠা বেয়ে কখনও সামনে কখনও পেছনে চালাতে লাগল হালকা নৌকাটা বিশাল এক আলবাকোর ঝাঁকের ভেতর দিয়ে। সামুদ্রিক পাখির একটা মেঘ উড়ছে মাথার ওপর দিয়ে। একটু পরপরই একটা দুটো গ্যানেট, নডি বা টার্ন ডানা গুটিয়ে ছোঁ মারছে

জলে, পর মুহূর্তে উপরে উঠে যাচ্ছে ঠোঁটে মাছ নিয়ে।

বাউন্টির নাবিকরা যখন অধীর আগ্রহে দেখছে এইসব তখন স্থানীয়দের একজন ডেকের ওপর আগুনের বন্দোবস্ত করে ফেলেছে মাছ রাঁধার জন্যে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, যা মাছ ধরা পড়ছে তা দিয়ে সবার হওয়ার পরও বেঁচে যাবে।

একটু পরেই ক্যানোটা ফিরে এল জাহাজের কাছে। দু'তিন ডজন বিরাটায়তন আলবাকোর ছুঁড়ে দেয়া হলো ডেকের ওপর। আলেকজান্ডার স্মিথ মাস্তুল বেয়ে উঠে গেল ওপরের লোকটাকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে। একটু পরে সবাই যখন ভাজা মাছ খাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে, ওপর থেকে ওর চিৎকার শোনা গেল;

'ডাঙা দেখা যায়!'

খাওয়া ভুলে সবাই দড়িদড়ার ভেতর দিয়ে ছুটে গেল রেলিংয়ের দিকে। ক্রিশ্চিয়ান আবার উঠে গেল মাস্তুলের মাথায়। স্মিথের পাশে কোনমতে একটু জায়গা করে নিয়ে দূরবীন চোখে লাগাল। আকাশ যেখানটায় সাগরের সাথে মিশেছে সেখানে ওর দৃষ্টি। প্রথমে সাগরের বহমান ঢেউ ছাড়া কিছু দেখতে পেল না। তারপর হঠাৎ সাগরের ওপর মাথা তুলে থাকা ছোট্ট একটা ত্রিভুজ চোখে পড়ল ওর। এত ছোট যে দৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ণ না হলে দেখতে পাওয়ার কথা নয়।

'ঈশ্বরের কসম, স্মিথ!' সবিস্ময়ে বলল ও, 'চোখ বটে তোমার!'

হাসল স্মিথ। জিজ্ঞে করল, 'ওটাই, স্যার, পিটকেয়ার্ন দ্বীপ?'

'আমার তা-ই বিশ্বাস।'

দুপুরের দিকে বাতাস একটু বাড়ল। ভরপেট মাছ খেয়ে সবাই আবার গিয়ে দাঁড়াল রেলিংয়ের কাছে। তাকিয়ে রইল দূরের ডাঙাটার দিকে।

যত কাছিয়ে আসছে দ্বীপটার চেহারা ততই পাল্টাচ্ছে। ক্রমশ উঁচু হচ্ছে চূড়া। স্থানীয়রা ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। ওরা সানন্দ কৌতূহল নিয়ে দেখছে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের মুখ গম্ভীর। সামনের ওই দ্বীপটায় কেমন হবে তাদের জীবনধারা এ নিয়ে চিন্তিত সবাই।

নিচে, নিজের কেবিনে পলিনেশীয়দের দুই নেতা মিনারী আর তেতাহিতির সঙ্গে বৈঠকে বসেছে ক্রিশ্চিয়ান।

মিনারী বিশালদেহী তাহিতীয়। চেহারায় রুক্ষ এক আভিজাত্য। চেহারাই বলে দেয় মর্যাদায় ও সাধারণের ওপরে। গম্ভীর, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর। সারা শরীরে অদ্ভুত সব ছবির উল্কি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, সাদা টাপা কাপড়ে ঢাকা থাকে সব সময়। তার সাথী তেতাহিতি টুপুয়াই-এর এক তরুণ সর্দার। ক্রিশ্চিয়ানের সাথে বন্ধুত্ব, আর সাদা মানুষরা টুপুয়াই ছাড়ার পর এই বন্ধুত্বের কারণে ওর জীবন সংশয় দেখা দিতে পারে ভেবে ও নিজের দেশ ছেড়ে এসেছে অনিশ্চিতের পথে। মিনারীর চেয়ে আয়তনে ছোট হলেও শরীরটা ওর পেটা লোহার মত। চেহারা মিনারীর মত রুক্ষ নয়, বরং এক ধরনের কোমলতা আছে তাতে। দু'জনকে ক্রিশ্চিয়ান ডেকেছে বাস্তব পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করার জন্যে।

'মিনারী, তেতাহিতি,' দীর্ঘ নীরবতার পর শুরু করল ক্রিশ্চিয়ান, 'এমন একটা কথা বলবার জন্যে তোমাদের ডেকেছি যা, আমি মনে করি, তোমাদের এবং বাকি

মাওরিদেরও জানা উচিত। এতদিন আমরা একসাথে জাহাজে কাটিয়েছি, সামনের দ্বীপটা যদি বসবাসের যোগ্য হয়, শিগ্‌গিরই আমরা ডাঙায়ও একসাথে থাকব। নীতিগত কারণে এতদিন সত্যি কথাটা তোমাদের জানাইনি। জাহাজে বেশি কথা বলা ভাল না। বুঝতে পারছ আমার কথা?'

মাথা ঝাঁকাল দু'জন।

'ব্লাই তাহিতির লোকদের বলেছিল সে ক্যাপ্টেন কুকের ছেলে,' বলে চলল ক্রিশ্চিয়ান, 'মিথ্যে বলেছিল ব্লাই। ও আরও বলেছিল, ও নিজের দেশের একজন সর্দার বা গোত্রপতি। এটাও মিথ্যে কথা। সর্দার হওয়ার মত ন্যায়বোধ বা চারিত্রিক গুণ ওর নেই। জাহাজের কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে ও যা খুশি তাই করতে শুরু করেছিল; ওর সিদ্ধান্ত সঠিক হোক না হোক, চাপিয়ে দিত আমাদের ওপর, নিষ্ঠুর আচরণ করতেও ছাড়ত না। ষোলো চাঁদ ধরে ও আমাদের সাথে এমন ব্যবহার করেছে, কোন মাওরি তার কুকুরের সাথেও তেমন করে না। নিশ্চয়ই তাহিতিতে তোমরা গল্প শুনেছ কী করে ও চাবকে নিজের লোকদের পিঠ দিয়ে রক্ত বইয়ে দিত? ওর ব্যবহার সবার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। রাজা জর্জের সরাসরি অনুমোদনে ও ক্যাপ্টেনের ক্ষমতা পেয়েছিল, সেই ক্ষমতা ও ব্যবহার করেছে নিজের লোকদের না খাইয়ে রেখে, শাস্তি দিয়ে, অপমান করে।'

গম্ভীর একটু হাসল মিনারী। 'বুঝতে পেরেছি,' বলল সে। 'তোমরা ওকে মেরে জাহাজ দখল করে নিয়েছ।'

'না। জাহাজ দখল করে আমি ভেবেছিলাম ওকে শিকলে বেঁধে নিয়ে যাব আমাদের রাজার কাছে; তিনি বিচার করে ঠিক করবেন কে দোষী। কিন্তু নাবিকরা ব্লাইয়ের ওপর এমন হাড়ে হাড়ে চটে ছিল যে ওরা তা করতে দিল না আমাকে। শেষে ব্লাইয়ের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ওকে একটা বড় নৌকা দিয়ে সাগরে নামিয়ে দিয়েছি। যারা যারা ওর সাথে যেতে চেয়েছে তাদের যেতে দিয়েছি। যতটা সম্ভব খাবার এবং পানিও দিয়েছি ওদের। অন্য যারা গেছে তাদের কথা ভেবে আমি প্রার্থনাও করেছি যেন ওরা ইংল্যান্ডে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু, আমাদের কথা যদি বলো, আমরা হয়ে গেছি দুর্বৃত্ত, আইন বিরোধী, বিদ্রোহী। এই ঘটনার কথা আমাদের রাজা যখন জানতে পারবেন, আমাদের খোঁজে জাহাজ পাঠাবেন। এই অঞ্চলের সাগর তন্ন তন্ন করে খুঁজবে ওরা। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কেন আমরা বসত করার জন্যে তাহিতি থেকে দূরে, অজানা দ্বীপ খুঁজছি? দ্বীপ আমরা পেয়েছি, মিনারী; তোমরা খুশি মনে থাকবে ওখানে? জায়গাটা যদি বসবাসের উপযুক্ত মনে হয়, আর এগোব না আমরা।'

মৃদু মাথা ঝাঁকাল মিনারী। 'আমি থাকব,' বলল সে।

'আর তুমি, তেতাহিতি?'

'নিজের দেশে আমি কোন দিনই ফিরে যেতে পারব না, কারণটা তো তুমি জানোই,' জবাব দিল টুপুয়াইয়ের তরুণ গোত্রপতি। 'তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানেই যাব।'

চারটের ঘণ্টা যখন বাজানো হচ্ছে, ক্রিশ্চিয়ান ডেকে এল। বাউন্টি এগিয়ে চলেছে

ডাঙার দিকে। আর মাত্র এক লিগ মত দূরে রয়েছে উত্তর-পুব থেকে দক্ষিণ-পুবে বিস্তৃত দ্বীপটা। উঁচু এক সারি গিরিশ্রেণী খাড়া হয়ে আছে দ্বীপের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত। দু'প্রান্তে আরও উঁচু দুটো চূড়া। দক্ষিণের চূড়াটা উচ্চতায় এক হাজার ফুটের নিচে হবে না, উত্তরেরটার চেয়ে অনেক কম খাড়া ঢালে এসে মিশেছে সাগরের সঙ্গে। প্রচুর গাছগাছালি দ্বীপটায়। তার মানে ভালই বৃষ্টিপাত হয় ওখানে। পাহাড়ের গা বেয়ে সবুজ গাছপালার ফাঁক ফোকর দিয়ে দুটো জলধারা নেমে এসেছে সাগর পর্যন্ত। উপকূলের এখানে ওখানে মাথা তুলেছে অসংখ্য আধাডুবো পাথর। সামুদ্রিক পাখির ঝাঁক উড়ছে সেগুলোকে ঘিরে। বাউন্টির ওপরেও উড়ছে অনেক পাখি।

জাহাজের সামনে দাঁড়িয়ে একজন জলের গভীরতা মাপছে। লোকটা যখন 'ত্রিশ ফ্যাদম' উচ্চারণ করল তখনও দ্বীপের সবচেয়ে উত্তরের বিন্দু প্রায় আধমাইল দূরে। পালগুলো একটু ঘুরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিল ক্রিশ্চিয়ান, যাতে জাহাজ উপকূলের কাছ দিয়ে এগিয়ে নেয়া যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে তীরের চার কেবল-এর ভেতর পৌঁছে গেল বাউন্টি। সামনে চমৎকার এক উপত্যকা। উত্তর ছাড়া বাকি তিন দিক পাহাড়, টিলা ইত্যাদিতে ঘেরা। কয়েকশো একর বর্ধিষ্ণু গাছে ছাওয়া সমান জমি আছে ওখানে।

সাগর শান্ত। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে বাউন্টি। আধঘণ্টা যাওয়ার আগেই একটা খাঁড়ি মত জায়গায় পৌঁছাল। জায়গাটা ডাঙায় নামার জন্যে তেমন সুবিধাজনক না হলেও আপাতত ওখানেই নোঙর ফেলার সিদ্ধান্ত নিল ক্রিশ্চিয়ান। পালগুলো সব গুটিয়ে ফেলে ধীরে ধীরে খাঁড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো জাহাজ। নোঙর নামিয়ে দেয়া হলো পানিতে।

কোয়ার্টার ডেকে দাঁড়িয়ে আছে ক্রিশ্চিয়ান। ইয়ং-এর দিকে ফিরল সে। 'আমার মনে হয় না এর চেয়ে ভাল নামার জায়গা আমরা পাব। তবু, দক্ষিণের উপকূলটা দেখা হয়নি, একবার দেখতে হবে। ইন্ডিয়ানদের তিনজনকে নিয়ে আমি যাচ্ছি এখনই। বাতাস দিক বদলালে জাহাজ দূরে নিয়ে যেও তীর থেকে।',

কয়েক মিনিটের ভেতর ছোট ক্যানোটা ভাসালো পানিতে। তেতাহিতি আর আরও দু'জন স্থানীয় বৈঠাল নিয়ে ক্রিশ্চিয়ান নেমে গেল। কয়েক মিনিটের ভেতর খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে একটা অন্তরীপের আড়ালে হারিয়ে গেল ক্যানোটা। আগের সেই উপত্যকার পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল দক্ষিণ দিকে। বিরাট বিরাট গাছগুলোর নিচে বেড়ে উঠছে ফার্ন আর নানা রকম ফুলের ঝোপ-ঝাড়। প্যান্ডানাস বা স্ক্রু পাইন গাছ মাথা তুলেছে জলের একেবারে কিনার থেকেই। দ্বীপের একেবারে পুবের অন্ত রীপটা ঘুরে এগিয়ে চলল ওরা।

ক্যানোর মুখ যখন পশ্চিম দিকে ঘুরল অগভীর এক অর্ধচন্দ্রাকৃতি উপসাগর ভেসে উঠল সামনে। খাড়া পাহাড় জলের কিনারা পর্যন্ত নেমে এসেছে ওখানে। কয়েক ফুটের সরু এক সৈকত আছে পাশে। তার ওপর গিয়ে প্রবল বেগে ভেঙে পড়ছে ঢেউ।

'ভয়ানক জায়গা!' খাড়া পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে বলল তেতাহিতি। 'কোন মানুষ ওখান দিয়ে উঠতে পারবে না, টিকটিকি পারলেও পারতে পারে।'

'বেয়ে চলো,' বলল ক্রিশ্চিয়ান। 'আরও ওপাশে কী আছে দেখতে হবে।'

দ্বীপটার দক্ষিণ উপকূলের চেহারাও এক রকম। ডাঙার শুরু যেখানে সেখান থেকেই উঠে গেছে খাড়া পাহাড় একটু আগের অর্ধচন্দ্র উপসাগরের মত। আরও ভয়ানক যেটা, এখানে অসংখ্য আধাডুবো পাহাড় মাথা বের করে আছে পানির ওপর। ঢেউ বাধা পেয়ে প্রবল তাণ্ডবে ভেঙে পড়ছে সেগুলোর ওপর। ক্যানো বাঁচানোর জন্যে ওদেরকে অনেকখানি সরে আসতে হলো উপকূল থেকে। পশ্চিম পাশটাও এক রকম। অবশ্য সাগর এ পাশে একেবারে শান্ত। কিন্তু নামবার মত কোন জায়গা নেই। পুরো দ্বীপটাকে চক্কর দেয়ার পর ক্রিশ্চিয়ান বুঝতে পারল, যে খাঁড়ির নোঙ্গর ফেলেছে সেটাই একমাত্র অবতরণ স্থান এ দ্বীপের।

ওরা যখন বাউন্টির কাছে ফিরে এল তখন সূর্য ডুবছে। জাহাজে উঠেই ক্রিশ্চিয়ান নোঙ্গর তোলার নির্দেশ দিল। গোটানো পালগুলো ছেড়ে দিতে বলল। তীর থেকে দূরে গিয়ে রাত কাটাবে ওরা। কারণ রাতে আবহাওয়ার অবস্থা কেমন হবে কেউ বলতে পারে না।

দুই

পরদিন সকাল আটটার দিকে আবার বাউন্টি নোঙ্গর ফেলল সেই খাঁড়িতে। ক্রিশ্চিয়ান আর ইয়ং দাঁড়িয়ে কোয়ার্টার ডেকে। চোখে দূরবীন লাগিয়ে উপকূল পর্যবেক্ষণ করছে ক্রিশ্চিয়ান। একটু পরেই দূরবীন নামিয়ে সে ফিরল ইয়ং-এর দিকে।

'মনে হচ্ছে দিনের বেশির ভাগ সময় আমাকে তীরে কাটাতে হবে,' বলল সে। 'এর ভেতর আবহাওয়া যদি বদলে যায় জাহাজ দূরে নিয়ে যেও।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

'এবার তাহলে একটা ইন্ডিয়ান ক্যানো জলে ভাসাতে বলো।'

নির্দেশ পালনে দেরি করল না ইয়ং। কয়েক মিনিট পরেই মিনারী, আলেকজান্ডার স্মিথ, ব্রাউন আর নারীদের দু'জন–মাইমিতি আর মোয়েটুয়াকে নিয়ে সৈকতের দিকে রওনা হলো ক্রিশ্চিয়ান। মিনারী বসল হাল ধরে। পুরো খাঁড়িটা বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই-এ গড়া। ওই সব পাথরে ঢেউ ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ছে ভয়ানক চেহারা নিয়ে। ডানে আর বাঁয়ে পাথরের দেয়াল প্রায় খাড়া নেমে এসেছে পানি পর্যন্ত। শুধু মাঝখানে এক চিলতে একটা সৈকত দেখা যাচ্ছে বালিতে গড়া। পুরো খাঁড়িতে ওই একটা মাত্র জায়গা যেখানে নিরাপদে ভিড়তে পারবে নৌকা। ওই দিক লক্ষ্য করেই ক্যানো চালিয়ে নিয়ে গেল মিনারী। সৈকতের কাছে পৌঁছে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ একটা ঢেউকে ভেঙে পড়তে দেয়ার জন্যে। তারপর সুযোগ বুঝে উঠে পড়ল আরেকটা ঢেউয়ের চূড়ায়। ঢেউটা মাথায় করে নিয়ে গিয়ে ওদের ছুড়ে দিল সৈকতের ওপর। লাফ দিয়ে নেমে ওরা ক্যানোটা টেনে ধরে রাখল যাতে

ঢেউটার ফিরতি টান তাকে ভাসিয়ে নিতে না পারে। পরের ঢেউটা আসার আগেই ওরা ক্যানো নিয়ে উঠে গেল সৈকতের অনেকটা ওপারে।

ওপর দিকে সৈকত যেখানে শেষ সেখানে শুরু গাছপালা ছাওয়া এক ঢালের। দু'একটা গাছ বিরাট। অন্য সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে সেগুলো। এখানে ওখানে ঝাউ ঝোপ। নারকেল আর স্ক্রু পাইনের সীমা সংখ্যা নেই। একাধিক জাতের ফার্ন দেখতে পেল ওরা, ঝড় গাছগুলোর নিচে ঝোপ তৈরি করে আছে। নীরবে ওরা কয়েক মুহূর্ত দেখল এসব। তারপর মাইমিতি খুশির এক অস্ফুট চিৎকার করে ছুটে গেল একটা ঝোপের দিকে। মসৃণ চকচকে পাতা আর থোকা থোকা সাদা ফুলওয়ালা একটা ডাল ভেঙে নিয়ে এল। ফুলগুলো সস্নেহে গালে চেপে ধরে সে ফিরল ক্রিশ্চিয়ানের দিকে। বলল:

'এই হলো তেফানো।'

মোয়েটুয়াও সমান খুশি। দু'জনে তক্ষুণি হাতভর্তি ফুল-পাতা এনে মালা গাঁথতে বসল মাথায় দেয়ার জন্যে।

'এখানে আমরা সুখেই থাকব, মাইমিতি,' মোয়েটুয়া বলল। 'দেখ! প্যানডানাস, আইটো, পুরাউ–সব ধরনের গাছ আছে। একদম তাহিতির মত।'

'কিন্তু সাগরের দিকে যখন তাকাবে তখন আর তাহিতির মত লাগবে না,' জবাব দিল মাইমিতি। 'এখানে কোন প্রবাল প্রাচীর নেই। শান্ত ল্যাগুন নেই। আর নদী? বলছি, দেখে নিও, একটাও নেই এখানে। এত ছোট দ্বীপে নদী থাকতেই পারে না।'

'হ্যাঁ,' বলল ক্রিশ্চিয়ান। 'তাহিতির মত নদী আমরা এখানে পাব না, তবে ঝরনা আছে নিশ্চয়ই; কী বলো, মিনারী?'

মাথা ঝাঁকাল তাহিতীয়। 'পানির অভাব হবে না,' বলল সে। 'মাটি ভাল এখানকার, খাবারের অভাবও হবে বলে মনে হয় না। আমাদের টারো, ইয়াম আর মিষ্টি আলু ভালই বাড়বে এ মাটিতে। কপাল ভাল হলে হয়তো দেখব ওগুলো এমনিতেই জন্মায় এখানকার বনে। আর কলা যে পাওয়া যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার।'

সামনের গাঢ় সবুজ ঢালটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ক্রিশ্চিয়ান বলল, 'এখানে খেত খামার করতে প্রথমে বেশ খাটুনি করতে হবে আমাদের। গাছ, ঝোপ-ঝাড় কেটে জমি পরিষ্কার করতে হবে।'

'আমি খুশি মনেই করব, স্যার,' স্মিথ জবাব দিল। 'আবার মাটির গন্ধ শুঁকতে পারব ভাবতেই আমার মন নেচে উঠছে। ব্রাউন আর আমি, স্যার, খুব খুশি হব যদি জাহাজ ছেড়ে এখানে থাকার কথা ভেবে থাকেন। কী বলো, উইল?'

মাথা ঝাঁকাল উইলিয়াম ব্রাউন। 'আমরা এখানে থাকব, স্যার?' জিজ্ঞেস করল সে। 'এটাই আপনার সেই পিটকেয়ার্ন দ্বীপ?'

'কোন সন্দেহ নেই আমার,' জবাব দিল ক্রিশ্চিয়ান। 'ক্যাপ্টেন কার্টারেটের মানচিত্রে যেখানে দেখানো হয়েছে সেখান থেকে বেশ দূরে হলেও এটাই যে পিটকেয়ার্ন সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

দুই তরুণীর মালা বানানো শেষ। মেঘের মত কালো চুলে সেগুলো লাগাতে

লাগতে ওরা উঠে দাঁড়াল। ক্রিশ্চিয়ান সপ্রশংস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। ওর মনে হলো নারীর এত রূপ আর কখনও দেখেনি। সবুজ সাদা মালার বাঁধন ছাড়িয়ে ওদের দীর্ঘ কালো চুল নেমে এসেছে কাঁধে, বুকে, পিঠে।

'চলো,' মাইমিতি বলল, 'দ্বীপটার কোথায় কী আছে দেখতে খুবই ইচ্ছে হচ্ছে আমার।'

মিনারীর নেতৃত্বে উঠে চলল ওরা খাড়াই বেয়ে। শ'দুয়েক গজ ওঠার পর খাড়াই অনেকটা কমে প্রায় সমভূমির চেহারা নিল। তার ওপর দিয়ে যেতে যেতে ওরা দেখল দক্ষিণ দিকে খানিকটা জায়গা সামান্য উঁচু হওয়ার পর হঠাৎ খাড়া উঠে গেছে ওপর দিকে শৃঙ্গের চেহারা নিয়ে। ওই শৃঙ্গের ওপাশে আর যাচ্ছে না তাদের দৃষ্টি। উত্তর-পশ্চিম দিকে আরেকটা পাহাড় দেখা গেল, সবুজ বনানী উঠে গেছে তার শিখর পর্যন্ত। উত্তর দিকেও একটা পাহাড়, সেটার গা আরও খাড়া, প্রায় লম্বভাবে উঁচু হয়ে উঠেছে। সামনের জায়গাটা যতটা না উপত্যকা তার চেয়ে বেশি মালভূমি অর্থাৎ পাহাড়ের ওপর সমভূমি। গোটা কয়েক গিরিখাত আছে এখানে ওখানে। মালভূমিটার সামনে উঁচু অংশের সূচনা দক্ষিণের মূল পাহাড়টা থেকে, আর সবচেয়ে নিচু অংশের শেষ পুবের সাগরমুখী পাহাড়ের পাদদেশে।

বনের ভেতর দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর ছোট্ট একটা ঝরনা দেখে থামল ওরা। কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে ঝরনার ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি পান করল আকণ্ঠ। তারপর ছোট্ট দলটাকে ভাগ করে ফেলল ক্রিশ্চিয়ান।

'মিনারী, তুমি আর মোয়েটুয়া যাও বাঁ মানে দক্ষিণ দিকে, পাহাড়টার ওপরে উঠে দেখে আসবে ওপাশে কী আছে। স্মিথ, তুমি আর ব্রাউন যাও পশ্চিম দিকে; আমি আর মাইমিতি যাব উত্তরে। ঠিক দুপুর বেলা সামনে ওই যে চূড়াটা দেখছ ওটার গোড়ায় আমরা মিলিত হব।'

তিন দিকে রওনা হয়ে গেল তিন জোড়া মানুষ। ক্রিশ্চিয়ান আর মাইমিতি এগোতে লাগল উত্তর-পশ্চিমের চূড়া লক্ষ্য করে। মাঝে মাঝেই গাছপালার ফাঁক ফোকর দিয়ে দেখতে পাচ্ছে সামনের পাহাড়ের বন ছাওয়া উঁচু শিখরদেশ। নিঃশব্দে হেঁটে চলল ওরা। ছোট্ট একটা ধুলোরঙা পাখি, এক ধরনের বাদামী ইঁদুর কয়েকটা আর একটা ছোট বুনো গিরগিটি ছাড়া কোন জীবিত প্রাণী ওদের চোখে পড়ল না। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল মাইমিতি।

'এক সময় এখানে মানুষ ছিল,' বলল ও।

'এখানে? কী বলছ, মাইমিতি! একথা মনে হলো কেন তোমার?'

'আমি টের পাচ্ছি,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল মাইমিতি। 'যেখান দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি এখানে পথ ছিল এক সময়। হয়তো অনেক অনেকদিন আগে, কিন্তু ছিল।'

হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল ক্রিশ্চিয়ান কথাটা। 'আমি বিশ্বাস করি না।'

'কারণ তুমি আমাদের রক্তের নও,' জবাব দিল মাইমিতি। 'মোয়েটুয়া দেখলে বুঝত, কিংবা মিনারী। যেখানে আমরা নেমেছি সেখান থেকেই উঠতে উঠতে আমার মনে হচ্ছিল একথা; এখন আর কোন সন্দেহ নেই। আমার জাতের মানুষ এখানে ছিল কোন সময়।'

'তাহলে চলে গেল কেন?'

'কে জানে? হয়তো–হয়তো জায়গাটা ভাল না।'

'ভাল না! এত সুন্দর, গাছগাছালিঅলা জায়গা ভাল না!'

'ওরা হয়তো কোন পুরনো দুঃখ সাথে নিয়ে এসেছিল। আসলে জায়গার তো কোন দোষ থাকে না, দোষ থাকে যারা বাস করতে আসে তাদের।'

'হয়তো তুমি ঠিকই বলেছ,' এক মুহূর্ত নীরব থেকে বলল ক্রিশ্চিয়ান। 'কিন্তু এত দূরে ওরা এল কী করে?'

'খালি তোমরা শ্বেতাঙ্গরাই বড় বড় জাহাজে লম্বা সাগর পাড়ি দাও না,' মাইমিতি জবাব দিল। 'এই বিরাট সাগরের এমন কোন দেশ বা দ্বীপ নেই যেখানে তোমাদের আগে আমার রক্তের লোকেরা না গেছে। এখানেও ওরা এসেছে।'

'হয়তো।...তোমার মনে হয় না আমরা এখানে সুখে থাকব?' এক মুহূর্ত পরে আবার জিজ্ঞেস করল, 'এখানে এসেছি বলে তুমি দুঃখ পাওনি তো?'

'না তবে...' একটু ইতস্তত করল মাইমিতি। 'এতদূরে এ জায়গা।...আর কোনদিন আমরা তাহিতিতে ফিরে যাব না, না?'

মাথা নাড়ল ক্রিশ্চিয়ান। 'কোনদিন না।' তারপর নরম কণ্ঠে যোগ করল, 'আসার আগেই তো তোমাকে বলেছি।'

'হ্যাঁ...।' মুখ তুলে চেষ্টা করে একটু হাসল মাইমিতি, চোখ দুটো ঝাপসা জলে। 'তাহিতির কথা যদি মাঝে মাঝে ভাবি তুমি কিছু মনে করতে পারবে না।'

'মনে করব! নিশ্চয়ই না।...কিন্তু, মাইমিতি, তুমি এত চিন্তা করছ কেন? আমি বলছি, দেখো, আমরা এখানে ভালই থাকব। এখন এ জায়গা আমাদের কাছে নতুন, কিন্তু শিগ্‌গিরই আমরা ঘর বানাব, আমাদের ছেলেমেয়ে হবে। তখন আমাদের দেশ হয়ে উঠবে এটা; কোন দুঃখ থাকবে না আমাদের।'

'চলো, এগোই,' ক্রিশ্চিয়ানের হাত ধরে আবার একটু হাসার চেষ্টা করে বলল মাইমিতি।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা পৌঁছুল প্রশস্ত এক ফাঁকা জায়গায়। বিরাট বিরাট গাছ চারদিক থেকে ঘিরে আছে জায়গাটাকে। ওদের ডানদিকে ডালপালা মেলেছে প্রাচীন এক অশ্বত্থ গাছ। গাছটা পেরিয়ে সামান্য এগোনোর পর ছোট্ট একটা ঢাল। ঢালের নিচে প্রায় গোল একটা টিলা। টিলার পরে আবার ঢাল খাড়া নেমে গেছে সাগর পর্যন্ত। অদ্ভুত সুন্দর জায়গাটা। চারপাশে ঝোপঝাড়ে ফুটে আছে অসংখ্য ফুল। তাদের সৌরভে মৌ মৌ করছে সাগর থেকে ভেসে আসা শীতল বাতাস। ওপাশে, উত্তর দিকে ওরা দেখতে পেল সরু একফালি উপত্যকা। সঙ্গিনীর দিকে ফিরল ক্রিশ্চিয়ান।

'মাইমিতি, এই জায়গাটা আমি পছন্দ করছি আমাদের ঘর বাঁধবার জন্যে।'

মাথা ঝাঁকাল মাইমিতি, 'আমি ভাবছিলাম তুমি এটাই বলবে। সত্যিই চমৎকার জায়গা!'

'উত্তরের ওই ঢালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে আমাদের ঘর। পেছনের ওই উপত্যকায় নিশ্চয়ই পানির খোঁজ পাব।'

মাইমিতির মন হালকা হয়ে গেছে। ঘাসে ছাওয়া একটা ঢিবির ওপর বসে ওরা

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ করতে লাগল–ঠিক কোন কোন জায়গায় ঘর বানানো হবে, বনের কোনখান দিয়ে পথ তৈরি করতে হবে, কোথায় বাগান হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশেষে উঠল ওরা। সামনের ছায়া ঢাকা উপত্যকার দিকে এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছুল একটা বিরাট রুটিফল গাছের কাছে। আশপাশের আর সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে ওটা। দ্বীপে নামার পর এই প্রথম ওরা দেখল এই গাছ। গাছটার এক শিকড় থেকে আরেকটা ছোট গাছ মাথা তুলেছে। ছোট গাছটার সাহায্য নিয়ে শিগ্‌গিরই মাইমিতি বড় গাছটার নিচের দিকে ফল ছাওয়া এক ডালে উঠে পড়ল। ডজন খানেক বড় বড় রুটিফল ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিল ও ক্রিশ্চিয়ানের দিকে।

'আজ আমরা ভোজ খাব,' উপর থেকে চিৎকার করল সে। 'তুমি তোমার আগুন জ্বালানোর জিনিসপত্র এনেছ?'

চকমকি পাথর আর লোহার টুকরো ক্রিশ্চিয়ানের সঙ্গেই ছিল। আশপাশ থেকে শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করে ও আগুন জ্বালল। মাইমিতি নেমে এসেছে গাছ থেকে। দু'জনে মিলে আগুন ঠিকমত জ্বেলে পোড়াতে দিল কয়েকটা ফল। ফলগুলোর খসখসে গা কালো হয়ে যাওয়ার পর ওগুলো গরম ছাইয়ের ওপর রেখে আবার রওনা হলো ওরা চারপাশ ঘুরে দেখার জন্যে। ঘণ্টাখানেক পর ফিরে দেখল মিনারী আর মোয়েটুয়া অনেকগুলো সামুদ্রিক পাখির ডিম পুড়িয়ে সেদ্ধ করছে। ডিমগুলো পেয়েছে দক্ষিণ দিকের চূড়ায়। এছাড়া এক ছড়া ডাব আর এক কাঁদি চমৎকার কাঁচকলাও এনেছে ওরা।

'আজ ভাল খাব আমরা,' বলল মিনারী। 'দারুণ একটা দ্বীপ খুঁজে পাওয়া গেছে। আর ভেসে বেড়াতে হবে না আমাদের।'

'আমারও তাই মনে হয়,' জবাব দিল ক্রিশ্চিয়ান। 'দক্ষিণের পাহাড়টার ওপরে উঠেছিলে তোমরা?'

'হ্যাঁ। ওপাশে ভাল জমি আছে। এখানকার চেয়ে ভাল। দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। তবে আমাদের থাকতে হবে এপাশেই। ওপাশে খোলা সাগরের ঝাপটা খেতে হবে।'

'কোন ঝরনা দেখেছ?'

'মাত্র একটা। ছোট তবে পানিটা ভাল।'

'ডিমের অভাব হবে না আমাদের,' মোয়েটুয়া বলল। 'দক্ষিণের সবগুলো চূড়ায় গাদা সামুদ্রিক পাখির বাসা দেখলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই এতগুলো জোগাড় করেছি আমি।'

কিছুক্ষণ পর ফিরল স্মিথ আর ব্রাউন। দু'জনেই উত্তেজিত তাদের আবিষ্কারে।

'ছোটর ভেতর এত সুন্দর জায়গা আর দেখিনি, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান,' কলকণ্ঠে বলল স্মিথ। 'পশ্চিমের ওই পাহাড়টার চূড়া পর্যন্ত উঠেছিলাম আমরা।'

'ওপাশে কতটুকু জমি আছে?'

'সামান্য, স্যার। আর যা আছে তা পাথুরে।'

ব্রাউনের দিকে ফিরল ক্রিশ্চিয়ান। 'দরকারী গাছপালা কী দেখলে আসা যাওয়ার পথে?'

'নারকেল গাছের কথা না বলাই ভাল–এত আছে যে আমাদের দ্বিগুণ তিনগুণ লোক থাকলেও অসুবিধা হত না। তাছাড়া, প্যানডানাস দেখলাম; আরও দেখেছি মিরো, চন্দন আর টুটুই...'

'টুটুই! মানে মোমবাদাম (ক্যান্ডলনাট)! যাক, একদিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।'

'আরও দেখেছি, স্যার, বুনো ইয়াম আর এক ধরনের টারো,' যোগ করল স্মিথ।

'চূড়ার ওপর থেকে দ্বীপটা পুরো দেখা যায়?'

'হ্যাঁ, স্যার,' জবাব দিল ব্রাউন।

'কী মনে হলো? কতবড় হবে দ্বীপটা?'

'লম্বায় দুই মাইলের বেশি না, স্যার, আর চওড়ায় আধমাইল খুব বেশি হলে। তবে আমার মনে হয় এখানে, স্যার, আমরা থাকতে পারব। ওই দিকে রুটিফল গাছের একটা ঝোপ দেখেছি। তাছাড়া আমরা নিজেরাও তো কিছু চারা নিয়ে এসেছি। মোট কথা খাবারের অভাব হবে না।'

'আমাদের আগে এখানে মানুষ ছিল এমন কোন প্রমাণ পেয়েছ?'

'সত্যি কথা বলতে কি, স্যার, এনিয়ে আমি ভাবিইনি,' জবাব দিল ব্রাউন।

'সাদা মানুষের কথা বলছেন না নিশ্চয়ই, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান?' জিজ্ঞেস করল স্মিথ।

'না, সাদা মানুষ আমরাই প্রথম, তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু মাইমিতির মনে হচ্ছে এক সময় নাকি ইন্ডিয়ানদের বসতি ছিল এখানে।'

'থাকলেও অনেক আগে। তার কোন প্রমাণ আমাদের চোখে পড়েনি।'

মিনারীর দিকে ফিরল ক্রিশ্চিয়ান। স্থানীয় ভাষায় জিজ্ঞেস করল:

'মিনারী, তোমার কি মনে হয় আমাদের আগে মাওরিরা এসেছিল এ দ্বীপে?'

'হ্যাঁ,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল তাহিতীয় সর্দার। 'এখানে একটা বসতি ছিল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এখানেই ছিল একটা গ্রাম। ওই অশ্বত্থ গাছটা এমনি এমনি হয়নি, লাগানো হয়েছিল, রুটিফলের গাছগুলোও।'

ক্রিশ্চিয়ানের দিকে তাকাল মাইমিতি। 'দেখেছ?' বলল ও। 'বলেছিলাম না?'

হাসল ক্রিশ্চিয়ান। 'তোমার বুদ্ধি বিবেচনার ওপর আমার বিশ্বাস আছে, মিনারী, কিন্তু এক্ষেত্রে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমার ভুল হয়েছে। আমাদের আগে সামুদ্রিক পাখি ছাড়া আর কেউ বাস করেনি এদ্বীপে।'

মিনারী তার টাপা কাপড়ের ঊর্ধ্ববাসের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল ছোট একটা পাথরের বাটালি, ফলার দিকটা মসৃণ করে শান দেয়া।

'বলতে চাও এটাও পাখিতে এনেছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

ওরা জাহাজে ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল স্মিথ আর ব্রাউন সোজা চলে গেল সামনে। সেখানে অন্য নাবিকরা ঘিরে ধরল ওদের ডাঙার খবরাখবরের জন্যে। ক্রিশ্চিয়ান কেবিনে ঢুকল। একা কিছু সময় কাটিয়ে উঠে এল ডেকে। ইয়ং তখন রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে সূর্যাস্ত দেখছে। ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল ক্রিশ্চিয়ান।

'উপসাগরটার নাম দিতে চাই *বাউন্টি বে*,' বলল সে। 'এরচেয়ে ভাল কোন নাম মনে আসছে তোমার, ইয়ং?'

'আমি ভাবছিলাম *ক্রিশ্চিয়ান'স ল্যান্ডিং* রাখলে কেমন হয়।'

মাথা নাড়ল ক্রিশ্চিয়ান। 'না। এখানকার কোন কিছুর সাথে আমার নাম যুক্ত হবে না,' বলল ও। 'একটা ডুবোপাথরের সাথেও না।...এখন বলো, জায়গাটা কেমন মনে হচ্ছে তোমার?'

'আমাদের জন্যেই যেন সৃষ্টি হয়েছে। সারা প্রশান্ত মহাসাগর খুঁজে এরচেয়ে ভাল জায়গা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

'হ্যাঁ। সবচেয়ে যেটা সুবিধা, সত্যিকার অর্থে নোঙ্গর করার মত কোন জায়গা নেই এখানে। এই খাঁড়িটাই সবচেয়ে ভাল। কিন্তু কল্পনা করেছ, উত্তর থেকে যখন ঝড়ের ঝাপটা আসবে কী দশা হবে এখানে কোন জাহাজ থাকলে? দশ মিনিট যাওয়ার আগেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ওই সব পাথরে ধাক্কা খেয়ে। আমাদের এখানে থাকতে চাওয়ার অর্থটা তাহলে কী দাঁড়াবে বুঝতে পারছ? জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এখানেই কাটাতে হবে।'

'বুঝতে পারছি, স্যার,' ইয়ং শান্তকণ্ঠে জবাব দিল।

'তুমি তাতে খুশি থাকবে?'

'পুরোপুরি।'

ঘাড় ফিরিয়ে ইয়ং-এর মুখের দিকে তাকাল ক্রিশ্চিয়ান। অনুসন্ধিৎসু চোখে কী যেন খুঁজল। তারপর আবার যখন কথা বলল, মনে হলো না বাউন্টির ক্যাপ্টেন তার অধস্তনের সাথে কথা বলছে। ওর চোখে ফুটে উঠেছে আন্তরিক এক চাউনি, একটু যেন আবেদন তাতে।

'বন্ধু,' ও বলল, 'এখন থেকে জাহাজের আনুষ্ঠানিকতা আর থাকবে না আমাদের ভেতর। এখানে যে ছোট্ট উপনিবেশ আমরা গড়ে তুলতে যাচ্ছি তার সাফল্য বা ব্যর্থতা অনেকখানি নির্ভর করছে আমাদের ওপর। তোমার সাহায্য সহযোগিতা খুবই দরকার পড়বে আমার, হয়তো আমার সহযোগিতাও প্রয়োজন হবে তোমার। যা-ই হোক, যা-ই ঘটুক আমরা একসাথে মোকাবিলা করব সব কিছুর।'

'আমার পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন আপনি পাবেন; আমি কথা দিচ্ছি,' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে দিল ইয়ং।

হাতটা ধরে আন্তরিকভাবে চাপ দিল ক্রিশ্চিয়ান। 'রুক্ষ সব লোকজন নিয়ে চলতে হবে আমাদের।...আচ্ছা, ইয়ং, লুকোচুরি না করে বলো তো, তুমি কেন এলে? তুমি বিদ্রোহে অংশ নাওনি। তুমি তো তাহিতিতে থেকে যেতে পারতে আর সব নির্দোষীর সাথে।'

'দেখুন, আমি যা করেছি সেজন্যে কোন অনুতাপ নেই আমার।'

আবার ওর চোখে চোখে তাকাল ক্রিশ্চিয়ান। 'সত্যি বলছ! কিন্তু...'

'ভ্যান ডিয়েমেনস ল্যান্ডের সেই ঘটনা মনে আছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল ইয়ং, 'ব্লাই আমাকে কামানের সঙ্গে বেঁধে চাবকেছিল খামোকা?'

'ও-কথা ভোলার মানুষ আমি নই, ইয়ং,' গম্ভীর মুখে জবাব দিল ক্রিশ্চিয়ান।

'সেদিন থেকেই আমি মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে গেছি,' বলে চলল ইয়ং। 'আপনাকে বা কাউকে কখনও বলিনি একথা, কিন্তু, বিশ্বাস করুন, তাহিতি ছাড়ার আগে সুযোগ পেলে আমি পালাতাম। বিদ্রোহের সময় আমি ঘুমিয়ে ছিলাম; জেগে উঠে ডেকে এসে দেখি জাহাজ আপনার দখলে, ব্লাই আর তার সঙ্গের ওরা দূরে চলে গেছে লঞ্চ নিয়ে, তখন যে কী খুশি হয়েছিলাম আপনি ভাবতে পারবেন না…'

'যাক ওসব কথা,' বাধা দিয়ে বলল ক্রিশ্চিয়ান। 'তুমি এখানে, আমার সাথে আছ এটাই বড় কথা। এ যে কী একটা স্বস্তি আমার জন্যে…যদি বাছাই করে লোক আনতে পারতাম, আমরা চাইলে, অনায়াসে স্বর্গ রচনা করতে পারতাম এই পিটকেয়ার্ন দ্বীপে। আমরা যে সুযোগ পেয়েছি এমনটা খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। লোভ লালসা হিংসা বিদ্বেষপূর্ণ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই ছোট্ট দ্বীপে আমরা আমাদের সন্তানদের বড় করে তুলতে পারি, নতুন একটা দুনিয়া গড়তে পারি।'

'যদি বাছাই করার সুযোগ পেতেন বাউন্টি থেকে কাকে কাকে আনতেন?' জিজ্ঞেস করল ইয়ং।

'সে আর এখন ভেবে লাভ নেই। যাদের পেয়েছি তাদের নিয়েই চলতে হবে, চালাতে হবে আমাদের। ইন্ডিয়ান ক'জন চমৎকার মানুষ, একটা বা দুটো ব্যতিক্রম ছাড়া। ওদের নিয়ে কোন ভয় বা দুশ্চিন্তা আমার নেই। আমার নিজের জাতের মানুষগুলোকে নিয়েই…' বাক্যটা অসমাপ্ত রেখেই চুপ করে গেল ক্রিশ্চিয়ান।

'ব্রাউন আর ম্যালেক্স স্মিথকে নিয়ে চিন্তার কিছু আছে বলে তো মনে হয় না।'

'হ্যাঁ, দু'জনই ভাল মানুষ।'

'আর আপনার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা যা, রীতিমত পূজা করার মত,' মৃদু হেসে বলল ইয়ং। 'বিশেষ করে স্মিথ।'

'স্মিথ সম্পর্কে কতটুকু জানো তুমি? বাড়ি কোথায় ওর?'

'যা জানার জেনেছি গত তিন মাসে–এমনিতে ও একটু চাপা প্রকৃতির লোক তো। ব্লাই যখন বাউন্টির জন্যে লোকদের চুক্তিবদ্ধ করছিল তখন ও টেমস-এ মালটানা নৌকায় কাজ করত। কাজটা ওর একদম পছন্দ ছিল না, তাই প্রথম সুযোগেই ছেড়ে চলে আসে। ওর আসল নাম অ্যাডামস, জন অ্যাডামস; জন্মেছে লন্ডনে, বড় হয়েছে লন্ডনেরই এক এতিমখানায়।'

'আশ্চর্য! নাম বদলানোর কী এমন কারণ ঘটল ওর?'

'ঠিক জানি না। ও নিজে থেকে বলেনি বলে আমিও জিজ্ঞেস করিনি।'

'ভাল করেছ। যাহোক লোকটা ভাল তাতে সন্দেহ নেই।' কিছুক্ষণ নীরব থেকে ক্রিশ্চিয়ান আবার বলল, 'শিগ্‌গিরই একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের, ইয়ং। জাহাজটার ব্যাপারে।'

'নষ্ট করে ফেলতে চান?'

'হ্যাঁ। তুমি রাজি এ প্রস্তাবে?'

'আনন্দের সাথে।'

'এছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের। দ্বীপটার যা অবস্থা–রেখে দিলে কয়েক মাস বা সপ্তার ভেতর এমনিতেই যাবে ওটা তারচেয়ে কাঠ খুঁটি যতটা খুলে

কাজে লাগানো যায় ততটাই লাভ। তবে আমি চাই প্রস্তাবটা অন্যদের ভেতর থেকে আসুক।'

'ধরুন যদি নোঙ্গর করে রাখার মত নিরাপদ জায়গা থাকত?'

'তবু আমি ওটা রাখতে চাইতাম না। না, পিছুটানার মত প্রতিটা সেতু আমাদের ধ্বংস করে দিতে হবে। তাছাড়া অতবড় একটা জিনিস লুকিয়ে রাখা তো সম্ভব নয়। নোঙ্গর করে রাখলে এখান দিয়ে কোনদিন যদি কোন জাহাজ যায় ওটা দেখতে পাবেই। তখন কী দশা হবে আমাদের? জাহাজটা না থাকলে কোন ভয়ই আমাদের থাকবে না। দূর থেকে দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না এ দ্বীপে মানুষ আছে বা থাকতে পারে।'

'একটা পরামর্শ দেব?'

'নিশ্চয়ই, নেড। দেখ, যখন যা তোমার মনে আসবে খোলাখুলি বলবে আমাকে।'

'সবাই অস্থির হয়ে উঠেছে আপনার উদ্দেশ্য জানার জন্যে। আজ রাতেই ওদের জানানো ভাল যে দ্বীপটা আপনার পছন্দ হয়েছে।'

এক মুহূর্ত ভাবল ক্রিশ্চিয়ান। 'ঠিক আছে। ডাকো তাহলে সবাইকে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে পেছন মাস্তুলের কাছে সাদা বাদামী সবাইকে জড় করল ইয়ং। পুরুষদের পেছনে মেয়েরা। ফিসফিস করে নিজেদের ভেতর আলাপ করছে তারা।

'আর কিছু করার আগে,' শুরু করল ক্রিশ্চিয়ান, 'আমি জেনে নিতে চাই, তোমরা সবাই খুশিমনে এ দ্বীপটাকে বাড়ি হিসেবে মেনে নিতে রাজি কিনা। তোমরা নিশ্চয়ই এর মধ্যে তোমাদের সঙ্গী যারা তীরে গিয়েছিল তাদের কাছে শুনেছ দ্বীপটা কেমন, কী তার দেয়ার ক্ষমতা আছে। একটা কথা আমি পরিষ্কার বলে দিতে চাই, ডাঙায় যদি আমরা নামি নামব থাকার জন্যে এবং চিরদিনের জন্যে। সুতরাং কারও আপত্তি থাকলে এখনই বলবে।'

অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল।

'আমি থাকার পক্ষে, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান।'

'জায়গাটা এত ছোট, আরও ভাল কোন জায়গা খুঁজে দেখলে হত না, স্যার?'

প্রথম সরাসরি বিরোধিতা এল মিলস-এর কাছ থেকে।

'এত ছোট দ্বীপে থাকার ইচ্ছা আমার নেই।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল ক্রিশ্চিয়ান।

একটু ইতস্তত করল মিলস 'আমার মনের কথা আমি বলেছি, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান, জায়গাটা আমার পছন্দ হয়নি।'

'এটা তো কোন কারণ হলো না। কেন পছন্দ হয়নি সেটা তোমাকে জানতে হবে। আপত্তির কী দেখলে বলো?'

'কোন জায়গাই ওর পছন্দ হবে না, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান,' বলল কামার উইলিয়ামস।

'তাহিতিই তোমার পছন্দ, তাই তো?' জিজ্ঞেস করল ক্রিশ্চিয়ান।

'পছন্দ কি না জানি না, তবে সুযোগ দেয়া হলে তাহিতিতে যে যাব না তা

বলতে পারব না।'

স্থির চোখে ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ক্রিশ্চিয়ান। তারপর বলল:

'শোনো, মিলস; তোমরা অন্যরাও। আগেও বলেছি, এখন আবার বলছি–এবং এই শেষবারের মত: আমরা আর দশটা স্বাভাবিক ইংলিশ জাহাজের নাবিকদের মত নই, ইচ্ছেমত চলার ক্ষমতা আমরা হারিয়েছি। আমরা ফেরারী আসামী। বিদ্রোহ ও দস্যুতার দায়ে আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছি বিচার ও আইনের হাত এড়াতে। বিদ্রোহের ব্যাপারটা জানাজানি হওয়া মাত্র আমাদের খোঁজে তল্লাশী শুরু হবে।'

'বুড়ো ব্লাই ইংল্যান্ডে পৌঁছুতে পারবে ভাবছেন না নিশ্চয়ই?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল মার্টিন।

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল ক্রিশ্চিয়ান। গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল:

'যে সব নিরপরাধ মানুষ ওর সঙ্গে গেছে অন্তত তাদের স্বার্থে আমি তাই কামনা করি। যদিও জানি সে সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। যা-ই হোক, ওরা ইংল্যান্ডে পৌঁছাক না পৌঁছাক হিজ ম্যাজেস্টি তাঁর একটা জাহাজ স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল এটা বিনা তল্লাশীতে মেনে নেবেন না। কী হলো ওটার জানার জন্যে এক বা একাধিক যুদ্ধ জাহাজ পাঠানো হবে, এবং তাহিতি হবে তার বা তাদের প্রথম গন্তব্য। ওখানে আমাদের যারা রয়ে গেছে তাদের কাছ থেকে ওরা বিদ্রোহের কথা শুনবে। তারপর, আমাদের খোঁজে চষে ফেলা হবে সারা প্রশান্ত মহাসাগর। আমরা যদি ধরা পড়ি মৃত্যুই হবে আমাদের একমাত্র প্রাপ্য। তোমাদের ইচ্ছা কী জানি না, আমি ধরা পড়তে চাই না।'

'আমিও না, স্যার,' বলল স্মিথ। বাকি বিদ্রোহীরা গলা মেলাল ওর সাথে।

'বেশ,' বলে চলল ক্রিশ্চিয়ান, 'বোঝা গেল একটা ব্যাপারে আমরা, সবাই না হোক অন্তত বেশির ভাগ, একমত যে ফাঁসিতে কেউ ঝুলতে চাই না। তাহলে এখন কী আমাদের করণীয়? যেখান থেকে কেউ আমাদের খুঁজে বের করতে পারবে না এমন কোন দ্বীপে বসত করা। তাই তো, নাকি অন্য কিছু?'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ!'

'তেমন একটা দ্বীপ আমরা পেয়েছি। ওই যে আমাদের সামনে সেটা। তাহিতি থেকে হাজার মাইলেরও বেশি দূরে, এবং এমন জায়গায় যার আশপাশ দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করার জন্যে কোন নৌ-পথ নেই। দ্বীপটা উর্বর এবং সুন্দর। ইচ্ছে হলে তোমরা নিজের চোখে দেখে আসতে পারো। আমাদের ইন্ডিয়ান বন্ধুরা বলছে, আমাদের সব রকম চাহিদা এই দ্বীপ ভালমতই মেটাতে পারবে। তার ওপর দ্বীপটা জনহীন। আমাদের ওপর কেউ কোনদিন অত্যাচার চালাতে পারবে না। টুপুয়াইয়ের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখানে ঘটবে না। এখন বলো, ভাল করে ভেবে চিন্তে বলো, আমরা এখানে থাকব, না থাকব না? যারা বিরোধিতা করবে অবশ্যই মিলস-এর চেয়ে যুক্তিসংগত কারণ দেখাতে হবে।'

'থাকলে কি চিরদিনের জন্যে, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান?' ম্যাককয় জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। একবার তো বলেইছি, এখানে যদি নামি নামব চিরদিনের জন্যে।'

'তাহলে, স্যার, দ্বীপটা আমার পছন্দ নয়।'

'কেন?'

'খুব ছোট এটা। বিদ্রোহের পর টুপুয়াইয়ের দিকে যাওয়ার সময় যে দ্বীপটা দেখেছিলাম আমার মনে হয় সেটা এরচেয়ে অনেক ভাল।'

'রারোটোঙ্গার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। ওটাই ভাল হবে আমাদের জন্যে।'

ক্রিশ্চিয়ান ভাবল এক মুহূর্ত।

'ম্যাককয়, রারোটোঙ্গায় যাওয়ার কথা আমি যে ভাবিনি তা নয়, কিন্তু কিছু অসুবিধা আছে বলেই বাদ দিয়েছি পরিকল্পনাটা। প্রথমত তাহিতিতে আমাদের যারা রয়ে গেছে তারা চেনে জায়গাটা। আমাদের খোঁজে যে জাহাজ আসবে তার অফিসারদের ওরা বলবে ওটার কথা—ওরা যদি বলতে নাও চায় ওদের দিয়ে বলানো হবে। তাছাড়া তাহিতি থেকে মাত্র শ'খানেক লিগ দূরে দ্বীপটা। ওখানে থাকাটা নিরাপদ হবে না।...আর কিছু বলার আছে কারও?'

অপেক্ষা করতে লাগল ক্রিশ্চিয়ান। একে একে তাকাচ্ছে সব বিদ্রোহীর দিকে। মিলস চোখ নামিয়ে নিল। মার্টিন কুইনটালের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল ওকে কিছু বলবার তাগিদ দিয়ে। কিন্তু আর কোন আপত্তি কেউ তুলল না।

'বেশ, এবার তাহলে হাত তোলো যারা পিটকেয়ার্ন দ্বীপে থাকতে চাও।'

পাঁচটা হাত উঠল তক্ষুণি। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ম্যাককয়ও যোগ দিল তাদের সাথে। তারপর মার্টিন।

'মিলস?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ক্রিশ্চিয়ান।

বেশ একটু চেষ্টা করে অবশেষে হাত তুলল প্রৌঢ় নাবিক। 'উপায় নেই বলে হাত তুলছি মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান, কিন্তু বাকি জীবন এরকম একটা পাথরের ওপর কাটাতে হবে, কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।'

'ফাঁসিতে ঝোলার ব্যাপারটা মেনে নেয়া আরও কষ্টকর হবে,' জবাব দিল ক্রিশ্চিয়ান।

'জাহাজটার কী হবে, স্যার?' জিজ্ঞেস করল মার্টিন।

'আমার মতে পুড়িয়ে ফেলাই উচিত হবে।' জবাবটা দিল ক্রিশ্চিয়ান নয় স্মিথ।

'হ্যাঁ, আমারও তা-ই মনে হয়,' যোগ করল উইলিয়ামস, 'পুড়িয়ে ফেলতে হবে নয়তো ডুবিয়ে দিতে হবে। এছাড়া কোন উপায় নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ উঠল; বিশেষ করে মার্টিন এবং মিলস-এর পক্ষ থেকে। অমনি শুরু হয়ে গেল মহা হৈ-চৈ। ক্রিশ্চিয়ান অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ, তারপর চুপ করার নির্দেশ দিল সবাইকে।

'তোমরা সবাই নাবিক,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে। 'জাহাজটা যে এখানে রাখা সম্ভব নয় এটুকু বোঝার যোগ্যতা তোমাদের আছে আশা করি। তাহলে এটাকে ডুবিয়ে দেয়া বা পুড়িয়ে ফেলা ছাড়া আর কী করতে পারি আমরা?'

ব্যাপারটা নিয়ে আরও কিছুক্ষণ আলাপ হলো, কিন্তু বিকল্প কোন সমাধান বেরোল না। সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল ওটা পুড়িয়ে ফেলা ছাড়া সত্যিই কোন উপায় নেই। অবশেষে প্রস্তাব যখন ভোটে দেয়া হলো সিদ্ধান্তটা সর্বসম্মতই হলো।

'আমার আর একটা কথা বলার আছে,' ক্রিশ্চিয়ান বলল, 'এখন থেকে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেব। প্রতিটা লোকের ভোটাধিকার

থাকবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছায় প্রত্যেকটা প্রশ্নের সমাধান হবে। আমার এ প্রস্তাবে রাজি তোমরা?'

সবাই রাজি। কথাটা সবাইকে স্মরণ রাখতে বলে সভা ভঙ্গ করল ক্রিশ্চিয়ান। ওরা চলে যাওয়ার পর ইয়ং তাকাল কম্যান্ডারের দিকে।

'একটু বেশি বদান্যতার পরিচয় দিয়ে ফেললেন, ক্রিশ্চিয়ান; কাজটা উচিত হলো কিনা বুঝতে পারছি না।'

'সব ব্যাপারে ওদের মত দেয়ার সুযোগ দেয়াটা?'

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাটা আপনার হাতে থাকলেই ভাল হত।'

'বিপদটা আমিও বুঝতে পারছি,' জবাব দিল ক্রিশ্চিয়ান, 'কিন্তু কী করব বলো, এছাড়া উপায় ছিল না। ওদের আজকের এই অবস্থার জন্যে আমিই দায়ী। আমি যদি ওদের বিদ্রোহের প্ররোচনা না দিতাম আজ সবাই বাড়ির কাছাকাছি থাকত। কথাটা এখন না জাগলেও শিগ্‌গিরই জাগবে ওদের মনে। তখন যদি দেখে আমিও একজন ব্লাই কী ওরা করতে পারে বলে ভাবো তুমি?'

'সবাই স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিল আপনার সাথে,' ইয়ং বলল, 'আপনি কাউকে তো জোর করেননি।'

'জানি। তবু, বুদ্ধিটা তো আমিই দিয়েছিলাম, আর ভাবনা চিন্তার জন্যে ওদের কোন সময়ও দেইনি। পরিণাম কী হবে বুঝিয়ে বললে নিশ্চয়ই সবাই যোগ দিত না আমার সাথে। না, এডওয়ার্ড, এটুকু অধিকার ওদের প্রাপ্য। কেউ যে এই অধিকারের অপপ্রয়োগ করবে না বা করতে চাইবে না তা জোর করে বলা যায় না। তবে আমি মনে করি তুমি আমি একসাথে থাকলে ওদের ঠিক পথে রাখতে অসুবিধা হবে না।'

তিন

পরদিন ভোরে শুরু হয়ে গেল মালপত্র সব তীরে নেয়ার তোড়জোর। মালী ব্রাউন ছাড়া বিদ্রোহীদের সবাই ইয়ং-এর নেতৃত্বে জাহাজে রইল। দুটো কাটার আর দুটো ক্যানোয় জিনিসপত্র নামিয়ে দিতে লাগল ওরা। ইন্ডিয়ান পুরুষরা সেগুলো পৌঁছে দিতে লাগল ডাঙায়। কামার উইলিয়ামস কয়েকটা কাটল্যাসের দীর্ঘ ফলা কেটে ছোট করে বুশ নাইফ বানিয়ে দিল। ওগুলো আর কুঠার, কোদাল, বেলচা ইত্যাদি দিয়ে মিনারী আর তার দুই স্থানীয় সঙ্গী ঝোপ ঝাড় ছেঁটে, মাটি সমান করে মোটামুটি একটা পথ তৈরি করে দিল খাঁড়ির লাগোয়া ঢালের ওপর পর্যন্ত। সেই পথ ধরে মেয়েদের কয়েকজন মালপত্র বয়ে নিয়ে তুলতে লাগল ঢালের ওপরে অস্থায়ী শিবিরে। বাকি মেয়েরা জাহাজে সাহায্য করছে বিদ্রোহীদের।

বাউন্টির মালপত্র যদিও তাহিতিতে রয়ে যাওয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে ভাগাভাগি হয়ে গেছে তবু যা আছে তার পরিমাণ কম নয়। মদের পিপে কয়েকটা, নুন দেয়া

গরু ও শুয়োরের মাংস; বিভিন্ন ধরনের শুকনো ডাল, বীন; প্রচুর কাপড়চোপড়; বারুদ আর, পেরেকের পিপে, কামারের কাজের জন্যে লোহা, যন্ত্রপাতি; মাস্কেটের গুলি বানানোর সীসা ইত্যাদি ইত্যাদি। চোদ্দটা মাস্কেট আর কয়েকটা পিস্তলও আছে। এছাড়া জীবন্ত প্রাণীর ভেতর আছে এক ডজন বড় বাক্স ভর্তি মোরগ-মুরগি, বিশটা মাদী শুয়োর–যার দুটো আবার জাহাজে থাকা অবস্থায় বাচ্চা দিয়েছে কয়েকটা করে, পাঁচটা মর্দা শুয়োর আর তিনটে ছাগল। দ্বীপটা ছোট বলে ঠিক করা হলো মোরগ-মুরগি আর জানোয়ার সব ছেড়ে দেয়া হবে এখন, যাতে বাড়ি ঘর তৈরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওরা নিজেরাই চরে খেতে পারে।

আবহাওয়া মানুষ যেমন কামনা করে তেমন। আকাশ মেঘশূন্য; বাতাস মৃদু, বইছে দক্ষিণ পশ্চিম থেকে। পুরো পাঁচদিন এমনই রইল। এই সময়ের ভেতর তাহিতি থেকে আনা বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা, আর পশু-পাখি সহ জাহাজের বেশিরভাগ মালপত্র অস্থায়ী শিবিরে নিয়ে তোলা হলো। বাউন্টির অতিরিক্ত পালগুলো দিয়ে তাঁবু খাটানো হয়েছে।

এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যার ফলে ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি হলো মাওরিদের ভেতর। স্মরণাতীত কাল থেকে পলিনেশীয়দের একটা রীতি হচ্ছে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে বসতি করার সময় আগে যেখানে থাকত সেখানকার মারাএ বা মন্দির থেকে কয়েকটা পবিত্র পাথর নিয়ে যাওয়া, সেগুলো নতুন দেশে নতুন মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ করে। বাউন্টির তাহিতীয়রাও তাদের ফারেরোই-এর মারাএ থেকে একজোড়া এ ধরনের পাথর নিয়ে এসেছিল। ওদের সর্দার মিনারীর দায়িত্বে ছিল ওগুলো। মিনারী পাথরগুলো সময় সুযোগমত তীরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নিচে থেকে ডেকে এনে রেখেছিল। মার্টিন রেলিংয়ের পাশে দেখতে পায় জিনিসগুলো। স্থানীয়দের কাছে ওগুলোর মর্যাদা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না মার্টিনের, তাই জঞ্জাল মনে করে পাথর দুটো ও ছুঁড়ে ফেলে দেয় পানিতে। মাওরি পুরুষরা সবাই তখন ডাঙায়। কিন্তু নারীদের একজন দেখে ফেলে মার্টিনের কাণ্ড। সে আতঙ্কিত কণ্ঠে চিৎকার করতে করতে লাফিয়ে পড়ে পানিতে এবং সাঁতরে তীরে গিয়ে মিনারীকে জানায় খবরটা। সঙ্গে সঙ্গে সব ক'জন ইভিয়ান হাতের কাজ ফেলে ছুটে আসে জাহাজে। এদিকে শ্বেতাঙ্গ নাবিকরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মার্টিন ভুল করুক আর ঠিক করুক ওর পেছনে ওরা থাকবে।

মাইট্রিতির উপস্থিত বুদ্ধি আর ইয়ং-এর কৌশলে অল্পের জন্যে একটা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়ানো গেল। ভাগ্যক্রমে পাথর দুটো তখনও অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল পানির নিচে। ইয়ং বলল কেউ একজন ডুব দিয়ে গিয়ে ওগুলোর সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে দিয়ে এলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ইভিয়ান লোকগুলো পছন্দ করত ইয়ংকে। ওরা ওর প্রস্তাব মেনে নিল। কয়েক মিনিটের ভেতর পাথর দুটো আগের জায়গায় স্থান পেল। শান্তি ফিরে এল জাহাজে। স্থানীয়রা ফিরে গেল তাদের কাজে।

পঞ্চম দিন সকালে বাতাস দিক বদলে উত্তর পুব থেকে, মানে খাঁড়ির ভেতর দিকে বইতে লাগল। বেগ একটু বেড়েছে। সবাই একমত হলো, বাতাস এরকম অনুকূল থাকতে থাকতেই জাহাজটাকে যতখানি সম্ভব ডাঙায় তুলে ফেলতে হবে।

সেই অনুযায়ী সবকিছু ঠিকঠাক করতে লেগে গেল ইয়ং। পাল খুলে দেয়া হলো কয়েকটা, নোঙ্গর তোলা হলো। বাউন্টি তার শেষ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করল।

মুহূর্তটা উদ্বেগের সন্দেহ নেই। শ্বেতাঙ্গ-অশ্বেতাঙ্গ, নারী-পুরুষ সবাই রেলিংয়ে ঝুঁকে সামনের সরু জলখণ্ডটার দিকে তাকিয়ে আছে। মার্টিন, ম্যাককয় আর কুইনটাল দাঁড়িয়ে বাঁ পাশের রেলিং ধরে।

শুকনো মুখে মাথা নাড়ল মার্টিন। 'এই দিনটার জন্যে, দেখো, সবাইকে একদিন অনুশোচনা করতে হবে।'

কুইনটাল ওর পিঠে বুড়ো আঙুলের খোঁচা দিয়ে বলল, 'কী দরকার অনুশোচনা করার জন্যে এখানে থেকে? লাফ দিয়ে পড়ো, সাঁতরে চলে যাও তাহিতিতে। আমি থাকছি এখানে।'

'টিটকারি মারো আর যা-ই করো, ম্যাট কুইনটাল,' জবাব দিল মার্টিন, 'বছর ঘোরার আগেই টের পাবে আমি ঠিক বলেছি কিনা। ...ও ঈশ্বর! ওই তো তলা!'

উপকূল থেকে সিকি মাইল মত দূরে থাকতে প্রথম বারের মত তলে মাটি ঠেকল জাহাজের। যদিও খুব হালকাভাবে। তারপর আবার এগিয়ে যেতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার ঘা খেলো, তারপর আবার এবং আবার। ক্রমে বাড়ছে আঘাতের তীব্রতা। সৈকত থেকে ত্রিশ গজ মত দূরে থাকতে শেষ বারের মত ঘা খেলো বাউন্টির তলা। ভয়ানক জোরে। এরপর আর এগোল না সে। তলি আটকে গেছে সাগর তলের সাথে। লম্বা মজবুত দড়ি দিয়ে তীরের মোটা কয়েকটা গাছের সাথে বেঁধে দেয়া হলো বাউন্টিকে। ক্রিশ্চিয়ান নিজে বাঁধনগুলো পরখ করে সন্তুষ্ট হলো। এখন ছোটখাট ঝড়ও ভাসিয়ে নিতে পারবে না ওটাকে। দেরি না করে লোকদের লাগিয়ে দেয়া হলো জাহাজ ভাঙার কাজে।

আস্তে আস্তে পাল, দড়িদড়া, মাস্তুল, পাটাতনের কাঠ, লকার, কেবিন–মোট কথা কম পরিশ্রমে যা যা সম্ভব সব খুলে নিয়ে তোলা হলো ডাঙায়। পুরুষরা ওগুলো খুলে বা কেটে ফেলে দিল পানিতে, মেয়েরা সাঁতরে বা সেগুলোকে ভেলা বানিয়ে নিয়ে গেল তীরে। সৈকতের ওপরে ঢালটা এত খাড়া যে, কাঠ, তক্তা ইত্যাদি সাগরের ধরা ছোঁয়ার বাইরে রাখার জন্যে এক জায়গায় পাহাড়ের গা কেটে সমান করতে হলো।

সপ্তাখানেক লেগে গেল এসব শেষ করতে। এরপর একদিনের বিশ্রাম মঞ্জুর করা হলো সবার জন্যে। বাউন্টি ইংল্যান্ড ছাড়ার পর এই প্রথম একজনও রইল না জাহাজে। সকালে প্রচুর মাছ ধরা হয়েছে। সেগুলোর সঙ্গে দ্বীপ থেকে সংগ্রহ করা তাজা রুটিফল, কাঁচকলা আর বুনো ইয়াম দিয়ে খাওয়া সারল সবাই। তাহিতি থেকে রওনা হয়ে আসার পর এত ভাল এত তৃপ্তির সঙ্গে আর কোনদিন খায়নি ওরা। খাওয়ার সময় ক্রিশ্চিয়ান আর ইয়ং নানা কথা বলে সবাইকে উৎফুল্ল রাখার চেষ্টা করল, তবু খাওয়া মোটামুটি নীরবেই সারল সবাই। মেয়েরা পলিনেশীয় রীতিতে পুরুষদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর খেতে বসল। পুরুষরা খাওয়ার পর ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন গাছের ছায়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। মার্টিন, মিলস আর ম্যাককয় এখন পর্যন্ত সামান্যই দেখেছে দ্বীপটার। বিকেলের দিকে ওরা আলেকজান্ডার স্মিথের নেতৃত্বে

রওনা হলো ভাল করে দেখার জন্যে।

আস্তে আস্তে হেঁটে ওরা উপত্যকার গভীরে ঢুকে পড়ল। ঘন জঙ্গল আর ঝোপঝাড়ের কারণে এগোতে অসুবিধা হচ্ছে, তবু ওরা হাঁটছে। ঘণ্টাখানেকের ভেতর দ্বীপের পশ্চিমাংশের পাহাড়চূড়ায় পৌঁছুল চারজন। চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে আসছে সাগর থেকে। ছায়া ঢাকা একটা জায়গায় বসল ওরা। মাথার ওপর পাতার মর্মরধ্বনি আর ওদের নিজেদের শ্বাস প্রশ্বাসেরা শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। দু'হাঁটুর ওপর হাত রেখে নিচের বনের দিকে তাকিয়ে আছে মিলস।

'এই তো, এখানে আমাদের নিয়ে এসেছে ক্রিশ্চিয়ান!' বলল সে। 'এখান থেকে যতটুকু দেখতে পাচ্ছি এটুকুই, ব্যস।'

'আমাদের ক'জনের জন্যে এটুকুই যথেষ্ট,' বলল ম্যাককয়।

'যথেষ্ট? অল্পেই তুমি খুশি হয়ে যাও,' মুখ কালো করে বলল মার্টিন। 'জঘন্য একটা পাথর ছাড়া আর কিছু আমি বলব না একে!'

'ঠিক, তাহিতিই সবচেয়ে ভাল!' বিদ্রূপের সুরে বলল স্মিথ। 'ইংল্যান্ড থেকে প্রথম যে জাহাজ আসবে সেটাই যাতে আমাদের ধরতে পারে তা-ই তুমি চাও! দড়ির মাথায় ঝুলে মরা তোমার পছন্দ হতে পারে, আমার নয়!'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাককয়। 'আয়তনের দিক থেকে দারুণ কিছু না হলেও এই পিটকেয়ার্ন দ্বীপ–ক্রিশ্চিয়ান ঠিকই বলেছে, আর যা-ই হোক নিরাপদ। কেউ কোনদিন খুঁজে পাবে না আমাদের।'

'এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়ে দেব এখানে,' বলল মিলস। 'এই কথাটা তোমরা কেউ ভেবে দেখেছ? ঈশ্বরের অভিশাপ লাগবে আমাদের ওপর। কোন আক্কেলে জাহাজটা ভাঙলাম আমরা!'

ম্যাককয় শুয়ে পড়েছিল, ঝট করে উঠে বসল। 'শোনো, জন, তুমি আর আইজাক তাহিতিতে থাকার সুযোগ পেয়েছিলে। কেউ তোমাদের জোর করেনি আসার জন্যে; নিজের ইচ্ছায়ই তোমরা এসেছ। তারপর এখন গজ গজ করছ কেন? নিরাপদ জায়গা খুঁজছিলাম আমরা, পেয়েছি। ছোট হলেও এই পিটকেয়ার্ন দ্বীপ নিরাপদ, আমরা সবাই জানি। তাহলে কেন এখন মন খারাপ করা? আর তোমার জাহাজ–ওটা নিয়ে কী করতে পারতাম আমরা? তিনশো ফুট পাহাড়ের ওপর টেনে তুলতাম? কোথায় রাখতাম ওটাকে?'

'তাছাড়া মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান যেমন বলছিলেন,' যোগ করল স্মিথ, 'যেখানে খুশি যাওয়ার উপায় আমাদের নেই।'

'কার দোষ সেটা?' সক্রোধে বলল মিলস। 'ও যদি ভাল মানুষের মত নিজের কাজ করত···'

'ঠিক,' বলল মার্টিন, 'এতদিন আমরা বাড়ি পৌঁছে যেতাম, নিদেনপক্ষে কাছাকাছি থাকতাম। ঐ ক্রিশ্চিয়ানের জন্যেই আজ এখানে পচে মরছি আমরা।'

'পারলে তাঁর মুখের ওপর গিয়ে বলো না কথাটা,' মুখ বাঁকিয়ে বলল স্মিথ, 'এরপর কী বলবে তা-ও আমি জানি। বলবে ও-ই আমাদের টেনে এনেছিল

বিদ্রোহে। জাহাজ দখল করার ব্যাপারে তোমার চেয়ে বেশি উৎসাহ কারও ছিল না, আইজাক মার্টিন।'

'কথাটা সত্যি,' বলল ম্যাককয়। 'খামোকা ক্রিশ্চিয়ানকে দোষ দিয়ে লাভ আছে? আমরা সবাই সেদিন এক মন, একমত হয়ে কাজ করেছিলাম।'

'লোকটা বিকারগ্রস্ত, তোমরা কেউ তা দেখতে পাচ্ছ না?'

'বিকারগ্রস্ত!...'

'বসো, আলেক্স, ওরকম লাফিয়ে উঠো না। আমি যা বলেছি বুঝে শুনেই বলেছি। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, ওর তালে পড়ে আমরাও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। অদ্ভুত ধ্যান ধারণা লোকটার। জাহাজ দখল করার পর থেকেই ওর মনে একটা ধারণা আসন গেড়ে বসেছে যে, পৃথিবীটা যথেষ্ট বড় নয় ওর বা আমাদের লুকিয়ে থাকার জন্যে। কথা বলতে পারে ভাল, সেই কথা দিয়েই ভুলিয়েছে আমাদের। তা না হলে আমাদের একজনকেও ও আনতে পারত তাহিতি থেকে? একটা জাহাজ যদি আসতই কী হত? পাহাড়ে লুকিয়ে থাকতে পারতাম না আমরা? তাহিতির পাহাড়গুলোয় এমন হাজার হাজার জায়গা আছে যেখান থেকে খোদ ঈশ্বরও খুঁজে বের করতে পারত না আমাদের। আর যদি দেখতাম সত্যিই ধরা পড়ার ভয়, বড় একটা ইন্ডিয়ান ক্যানো নিয়ে এইমিও বা আর কোন দ্বীপে—তাহিতি থেকে একশো-দুশো মাইল দূরে—চলে যেতে পারতাম না? এক ডজন রাজার জাহাজের সাথে আমরা আরামে লুকোচুরি খেলতে পারতাম, যতক্ষণ না ওরা তিত বিরক্ত হয়ে ফিরে যেত দেশের পথে। পরের বার জাহাজ আসার আগে দশ বা পনেরো বছর নিশ্চিন্ত মনে কাটিয়ে দিতে পারতাম। কী বলো, উইল, তোমার সাধারণ বুদ্ধিতে কী বলে?'

'তা ঠিক,' একটু অস্বস্তির সঙ্গে জবাব দিল ম্যাককয়। 'এটা বোধ হয় আমরা করতে পারতাম।'

'বোধ হয়! তোমাদের মাথায় ঘিলু বলতে কিছু নেই। ক্রিশ্চিয়ানের মাথায় জাহাজ ঢুকে আছে বলে জাহাজের কথা বললাম। আসল কথাটা হচ্ছে জাহাজ আসবেই না। ব্লাই কোনদিন দেশে ফিরতে পারবে না; ক্রিশ্চিয়ান নিজেও জানে একথা। তাহলে?—ওইটুকুন একটা জাহাজের কী হলো জানার জন্যে অর্ধেক দুনিয়া দূরে আরেকটা জাহাজ পাঠাবে? খেয়ে দেয়ে কাজ নেই রাজার?'

'পেটে এত কথা থাকতে ক্রিশ্চিয়ানের সামনে অমন চুপ করে ছিলে কোন দুঃখে?' গর্জে উঠল মিলস। 'এখন এসব বলে লাভ কী?'

'বললাম না, আমরাও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম? ওর কথা ও আমাদের বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছে।'

'তোমাদের সবকটার গলায় দড়ি পড়লে আমি খুশি হতাম,' বলল স্মিথ। 'তাহলে আর ক্রিশ্চিয়ানকে পাগল ঠাউরাতে পারতে না।'

'বাদ দাও, বাদ দাও,' গা ঝাড়া দিয়ে বলল ম্যাককয়। 'এখানেই আমাদের থাকতে হবে, সুতরাং এধরনের আলাপ না করাই ভাল।'

'তাহলে কি ক্রিশ্চিয়ানের ইচ্ছেমতই সব হবে? সব সময় ও জিতবে?' ক্রূর চাউনি হেনে বলল মার্টিন।

'মাথা খারাপ!' জবাব দিল মিলস। 'শুনে রাখো, বন্ধুরা, আর আমরা তোতা পাখি হয়ে থাকব না। এখন থেকে প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদেরও একটা বক্তব্য থাকবে। ও নিজে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।'

'এ নিয়ে তোমাদের চিন্তা না করলেও চলবে,' বলল ম্যাককয়। প্রস্তাবটা ক্রিশ্চিয়ান নিজে দেয়নি? তাহলে? ও কথা রাখবে।'

'এত জোর দিয়ে বলছ কী করে? ও বলেছিল না যতদিন আমাদের মদ থাকবে নিয়মমত সবাইকে ভাগ দেবে? গত দু'দিনে এক ফোঁটাও দিয়েছে?'

'আর কাজ পেলে না, পরান ছেঁদা করা কথাটা মনে করিয়ে দিলে?' হতাশ একটু হাসি হেসে বলল ম্যাককয়।

'কী করে দেবে?' বিরক্ত হয়ে বলল স্মিথ। 'আমরা কাজ করছিলাম জাহাজে, মদ ছিল ডাঙায়।'

'তা অবশ্য ঠিক,' ম্যাককয় বলল, 'আমরা এখনও তো স্থির হয়ে বসতেই পারিনি। সময় দাও ওকে; আজ না হোক কাল সন্ধ্যা থেকে নিশ্চয়ই দেবে।'

'কী দেবে সে জানা আছে, আমাদের এই আলেক্স বাবাজী যখন আছে,' বলল মিলস।

'তোমার মাথাটা বড্ড মোটা, জন। আমি চাইছি কয়েকটা বছর পুরো যেন চলে। তাছাড়া এখন জাহাজে থাকতে যা পেতে তা দাবি করতে পারো না। কতটুকু আছে আমাদের? দুটো পিপে, মানে ১৬৪ গ্যালন আর তিনটে পাঁচ গ্যালনি ছোট পিপে।'

'ভাল, খাব মোটে আট জন। ব্রাউন তো মদ ছোঁয় না।'

'ধন্যবাদ ঈশ্বরকে,' স্বস্তির সঙ্গে বলল ম্যাককয়, 'ব্রাউন আর এই ইন্ডিয়ানগুলো মদ খায় না। খেলে···'

'খেলেও দিচ্ছিল কে ওদের?' বলল মিলস। 'নিজেরাই পাই না তার ওপর ভাগ বসাবে জংলীর বাচ্চাগুলো! বললেই হলো।'

'আমার কথা শোনো,' আবার বলল স্মিথ, 'তোমরাই মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানকে বলেছ, দিনে আধ পাইন্ট পেলেই তোমরা খুশি থাকবে। তাহলে দাঁড়াচ্ছেটা কী? সপ্তায় সাড়ে তিন গ্যালন। বছর পোরার আগেই শেষ হয়ে যাবে সব। তারপর কী করবে? কোন ডেপটফোর্ড স্টোর নেই এখানে যে ইচ্ছে হলেই গিয়ে কিনে নিয়ে আসবে এক বোতল। বাকি জীবন মদ ছাড়াই কাটাতে হবে।'

'শেষ হলে কী হবে তা ভেবে এখন মাথা গরম করার কোন মানে হয় না,' বলল ম্যাককয়। 'যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আমরা খাব, ফুর্তি করব। আজকের বরাদ্দটুকু যদি এখনই পাওয়া যেত!'

'মানে আধ পাইন্ট তো?' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে জিজ্ঞেস করল মার্টিন। 'আধ ঘণ্টার ভেতর তার কয়েক গুণের ব্যবস্থা যদি আমি করে দিতে পারি?'

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ম্যাককয় মার্টিনের দিকে। 'মানে, আইজাক! কী বলতে চাইছ তুমি? মদের পিপেগুলো সব ক্রিশ্চিয়ানের তাঁবুতে না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওগুলো হলো সাধারণ মদ,' ধূর্ত একটু হাসি হেসে বলল মার্টিন. 'আমি বলছি ব্র্যান্ডির কথা।'

মিলস এবার অস্থির হয়ে উঠল। 'কী রহস্য করছ? পরিষ্কার করে কথা বলতে পারো না? জাহাজে কোন ব্র্যান্ডি ছিল না।'

'যদি বলি ছিল?'

'দেখ, আইজাক, ওষুধের বাক্স থেকে চুরি করার কথা যদি ভেবে থাকো···'

'মাথা খারাপ? অমন কাজ আমি কক্ষনো করব না।' হাঁটুতে কনুই রেখে একটু ঝুঁকে বসল মার্টিন। 'রহস্যটা ভাঙছি, শোনো: কেবিনের দেয়ালগুলো যখন খুলছিলাম বুড়ো পার্সেলের খাটিয়ার নিচে আট কোয়ার্ট ব্র্যান্ডি পেয়েছি আমি। মনে হয় ও লুকিয়ে রেখেছিল কখনও অভাবে পড়লে খাবে বলে। এক কোয়ার্টের বোতল আটটা। ওগুলো দাবি করার মত কেউ এখন যেহেতু নেই সেহেতু যে প্রথম দেখেছে ওগুলো তারই। তাই কাল রাতে তীরে আসার সময় আমি গোপনে নিয়ে এসেছি বোতলগুলো। নিরাপদ এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি। ভেবো না একা খাব বলে, তাহলে আর বলতাম না তোমাদের।'

'সে তো বোঝাই যাচ্ছে, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!' বলল ম্যাককয়। 'আমি হলে একাই সাবড়ে দিতাম সবটুকু।'

'তা আমরা জানি,' বলল মিলস। 'আইজাক, কোথায় রেখেছ। বোতলগুলো?'

'যে পথে এখানে এসেছি তারই পাশে এক জায়গায়। তাঁবু থেকে মোটামুটি দূরেই।'

'তাহলে আর বসে আছি কেন? চলো···,' বলল মিলস।

'ওগুলো জাহাজের সম্পত্তি। মানে সবার,' বাধা দিয়ে বলল স্মিথ। 'সবার ভেতর ভাগ হওয়া উচিত ওগুলো।'

'আমরা তিন জনে বলছি, না,' বলল মিলস।

উঠে দাঁড়াল স্মিথ। 'তোমাদের যা খুশি করতে পারো,' বলল সে। 'তবে মনে রেখো শুরুটা তোমরা খুবই বাজে ভাবে করছ। আমি এর ভেতর নেই। চললাম।'

এক মুহূর্ত ওর সঙ্গীরা তাকিয়ে রইল ওর অপসৃয়মান মূর্তিটার দিকে। তারপর মার্টিন চিৎকার করে বলল, 'আমাদের খুঁজলে বোলো, বনের ভেতর হাঁটছি, রাতে এখানেই ঘুমাব।'

ঘাড় ফিরিয়ে হাত নাড়ল স্মিথ। একটু পরেই হারিয়ে গেল বনের ভেতর।

প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ম্যাককয়। 'বড় শক্ত লোক। আশ্চর্য হলো, মদ ও আমাদের কারও চেয়ে কম পছন্দ করে না।'

'ব্র্যান্ডির বোতলগুলো সঙ্গে থাকলে দেখতাম কেমন শক্ত,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জবাব দিল মার্টিন। 'যাকগে, চলো যাওয়া যাক।'

আধঘণ্টাখানেক হাঁটার পর শীর্ণ এক ঝরনার কাছে এলো ওরা। কাছেই একটা বড় গাছের শিকড়ের নিচ থেকে মার্টিন বের করল বোতলগুলো। চকচক করে উঠল ওর সঙ্গীদের চোখ।

'তোমার মত লোক হয় না, আইজাক,' বিগলিত হয়ে বলল ম্যাককয়।

'কিন্তু খাব কোথায়?' বলল মিলস, 'এখানে তো আরাম করে বসতেই পারব না।'

ম্যাককয় আর মার্টিন প্রত্যেকে তিনটে করে আর মিলস দুটো বোতল নিয়ে

হেঁটে গেল আরও পঞ্চাশ গজ মত। তারপর সুন্দর ফার্ন ছাওয়া একটা জায়গা দেখে বসে পড়ল হাত পা ছড়িয়ে। মাথার ওপর বিরাট একটা গাছ। তার ডাল পাতার ফাঁক ফোকর গলে আসছে টুকরো টুকরো সূর্য। মার্টিন কোমরের বেল্ট থেকে ছুরি বের করে ঘা মেরে ভেঙে ফেলল একটা বোতলের গলা।

'এত অস্থির হওয়ার দরকার নেই,' বলল ম্যাককয়। 'বোতলগুলো কাজে লাগবে পরে।'

জবাব দেয়ার আগে লম্বা একটা চুমুক দিল মার্টিন। 'একটা গেলে কিছু হবে না, পনেরো ডজন খালি বোতল আনা হয়েছে জাহাজ থেকে।'

ম্যাককয় আর মিলসও পিছিয়ে রইল না। যার যার বোতলের মুখ খুলে একে একে চুমুক দিল দু'জন।

'তোমার এই উদারতা কোনদিন ভুলব না, আইজাক,' বোতলের ছিপি আঁটতে আঁটতে বলল ম্যাককয়, 'তোমার জায়গায় আমি হলে কাউকে জানাতাম কিনা সন্দেহ।'

'সাধ মিটিয়ে খাও উইল, প্রচুর আছে। দুই বোতল শেষ করার আগেই আমি বদ্ধ মাতাল হয়ে যাব মনে হচ্ছে।'

'এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই, সারা বিকেল এবং রাত রয়েছে আমাদের হাতে,' বলল ম্যাককয়।

'ভাগ্য ভাল ম্যাট কুইনটাল নেই আমাদের সাথে,' বলল মিলস।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মার্টিন। 'ওর মত লোক হয় না, কিন্তু পেটে মাল পড়লে···'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাককয়। 'দানব হয়ে ওঠে। পোর্টসমাউথে *থ্রী ব্ল্যাক মুরস* সরাইখানায় কী কাণ্ডটা করেছিল মনে আছে?'

'থাকবে না আবার!' বলল মিলস। 'আমার গায়ে এখনও দাগ আছে।···এ কী?'

ফুল আর ফার্ন পাতার ছোট্ট একটা তোড়া নেমে এসেছে ওপর থেকে। লম্বা সরু একটা লতায় বাঁধা। দুলছে মিলস-এর নাকের সামনে। মুহূর্ত পরেই ওপর থেকে ভেসে এল খিলখিল হাসি। মুখ তুলে ওরা দেখল, দুষ্টু মিষ্টি একটা মুখ উঁকি দিচ্ছে সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে।

'আরে! এ যে দেখছি তোমার মেয়েমানুষ, মিলস!' মার্টিন বলল।

'তা-ই তো দেখছি!' মিলস-এর কর্কশ মুখটা নরম হলো একটু। 'নেমে এসো, এই খুদে ডাইনী! কী করছ এখানে?'

নিচের দিকের একটা ডালে নেমে এসে হাসতে লাগল মেয়েটা ওদের দিকে তাকিয়ে।

'দারুণ মেয়ে বুঝলে!' স্নেহের সুরে বলল মিলস। 'বন আর পাহাড় চষে বেড়ানোর জন্যেই ওর জন্ম হয়েছে যেন। কই নেমে এসো।'

লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ল মেয়েটা। পর মুহূর্তে ধরা দিল মিলস-এর বাহু বন্ধনে। হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে পড়া বাকল-কাপড়ের ঘাগরা ওর পরনে। লম্বা ঘন চুলরাশি নেমে এসেছে নিরাবরণ বুকে, কাঁধে। মিলস দু'হাতে ধরে যতটা দূরে সরানো যায় সরিয়ে প্রশংসার চোখে তাকাল ওর দিকে।

'ঠিকই বলেছ, জন,' বলল মার্টিন। 'সত্যিই একটা খুদে ডাইনী ও!'

'হ্যাঁ,' বলল ম্যাককয়, 'ভাগ্যবান তুমি, মিলস; সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটাকে দখল করেছ। ভেবে পাই না তোমার মত বুড়োর ভেতর কী দেখল ও যে এক কথায় আত্মীয় স্বজন সব ছেড়ে চলে এল!'

মেয়েটার চুলে আলতো হাতে বিলি কাটতে কাটতে মিলস বলল, 'সত্যিই আমি ভাগ্যবান। প্রুডেন্সের মত মেয়ে হয় না। জানো, তাহিতি ছাঁড়ার পর একদিনও ওর চোখে পানি দেখিনি। আর আমি ভেবেছিলাম আত্মীয় স্বজন চোখের আড়াল হলেই কেঁদে-কেটে অস্থির হবে।'

'সেদিক থেকে আমার সুজানাহ সেরা,' বলল মার্টিন। 'নিজের ইচ্ছায় এসেছে, এখন বাড়ি যাওয়ার জন্যে নাকের জলে চোখের জলে এক হচ্ছে।'

'এটা অস্বাভাবিক কিছু না,' বলল ম্যাককয়। 'আমার ছুঁড়িটারও এক দশা। কিছুদিন যাক, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। কী বলো, প্রুডেন্স?' মেয়েটার দিকে তাকিয়ে শেষ করল ও।

লজ্জা একটু হাসল মেয়েটা। মুক্তোর মত ঝকঝকে দাঁত দেখা গেল।

'কী করে তুমি চালাও, জন?' জিজ্ঞেস করল মার্টিন। 'ইন্ডিয়ান ভাষা তো এক অক্ষরও বলতে পারো না। আকার ইঙ্গিতে কাজ সারো?'

'সে নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে,' জবাব দিল মিলস। 'ওদের ওই বর্বর ভাষা শেখার কোন ইচ্ছে আমার নেই। পায়রা যেমন করে দানা তুলে নেয় আমার প্রুডেন্স তেমনি করেই ইংরেজি তুলে নিচ্ছে ঠোঁটে। ক'দিন পরে দেখো আমাদের কারও চেয়ে খারাপ বলবে না ও।'

'জিজ্ঞেস করে দেখ না, খাবে নাকি এক চুমুক?' হাতের বোতলটা দেখিয়ে বলল মার্টিন।

'একটু চেখে দেখবে নাকি, পিয়ারী?' আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল মিলস। মাথা নাড়ল প্রুডেন্স। 'নাহ, ওর ভাল লাগে না এ জিনিস,' বলল মিলস। 'আমিও জোর করতে চাই না।'

'বললেই হলো, মনের মানুষের সাথে খাবে না তো কার সাথে খাবে?' বলল মার্টিন। 'দাও, দাও, মিলস, এক চুমুক স্বাদ নেয়াও ওকে।'

'তা যা বলেছ,' জবাব দিল মিলস। 'এসো, লক্ষ্মী, এক ফোঁটা মুখে দিয়ে দেখ।'

কাঁধের ওপর দিয়ে ধরে মেয়েটাকে কাছে টানল মিলস। বোতলের মুখ ঠেসে ধরল ওর মুখে। এবার আর প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করতে পারল না প্রুডেন্স। চোখ বন্ধ করে গিলে ফেলল দু'তিন ঢোক। তারপরই মুখ বিকৃত করে কাশতে কাশতে ছুটে গেল ঝরনার দিকে। তিন নাবিক হেসে উঠল হা-হা করে।

'ভাবো একবার দেশের কোন মেয়ে এমন ব্র্যান্ডি পেলে কী করত!' বলল মার্টিন।

'আমার বউ হলে দু'চুমুকেই আধ পাইন্ট শেষ করে ফেলত,' বলল ম্যাককয়। '...আশ্চর্য কী জানো?—গত বারো মাসে আমি ওর কথা দু'বারও ভেবেছি কিনা সন্দেহ।'

'বিয়ে করা বউ তো? নাকি...'

'নিশ্চয়ই। নিখুঁত ব্রিস্টল ধাঁচে বিয়ে হয়েছিল আমাদের। ওকে সত্যিই পছন্দ করতাম আমি।'

'আর দেখগে তুমি যখন বাইরে ও কার সাথে রাত কাটাচ্ছে,' বলল মিলস।

'জানি, বহুদিন আগেই ও নোঙ্গর তুলে ফেলেছে আমার বন্দর থেকে,' বলে বোতল উঁচু করল ম্যাককয়। 'য়া-ই হোক, যেখানে থাকুক, যেভাবে থাকুক কামনা করি ও সুখে থাকুক।'

ঝরনার কাছ থেকে ফিরে এল প্রুডেন্স। মিলস-এর পাশে বসল আবার।

'কেমন লাগল?' জিজ্ঞেস করল মিলস।

সলজ্জ একটু হাসি উপহার দিল মেয়েটা। বোতলটার দিকে ইশারা করে বলল, 'আরেকটু।'

'এই তো মজা টের পেয়েছ,' হেসে বলল মার্টিন। 'কটা দিন যেতে দাও, মিলস, তারপর দেখবে তুখোড় মদখোর হয়ে উঠেছে তোমার পিয়ারী।'

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসল মিলস, গর্বের হাসি। 'হ্যাঁ। নাও, পিয়ারী, আরেকটু নাও।'

'এই যে, দোস্তরা!'

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তিনজন। কুইনটাল দাঁড়িয়ে আছে ওদের পেছনে।

'ও ঈশ্বর! এ যে খোদ ম্যাট!' অস্বস্তির সঙ্গে বিড় বিড় করল ম্যাককয়।

'এসো, ম্যাট, তোমাকেই খুঁজছিলাম মনে মনে,' গলায় দরাজ ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বলল মার্টিন।

'তাতে কোন সন্দেহ নেই,' এগিয়ে এসে ওদের সামনে বসতে বসতে বলল কুইনটাল, 'তারপর সারা দ্বীপ চষে না পেয়ে এসে বসেছ এখানে? এগুলো পেলে কোথায়?'

'সে নিয়ে তোমার না ভাবলেও চলবে। আমরা চুরি করিনি। একটু খাবে নাকি?'

তৃষ্ণার্ত চোখে বোতলগুলোর দিকে তাকাল কুইনটাল। 'সে আর বলতে? দাও, দাও, একটা বোতল দাও।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা আনকোরা বোতল এগিয়ে দিল মার্টিন।

সময় নষ্ট না করে ছিপি খুলে চুমুক দিল ম্যাথু কুইনটাল।

'জ্যাক উইলিয়ামস কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মিলস।

'গত দু'ঘণ্টায় ওর চেহারা দেখিনি আমি। কোথায় ঘুরছে কে জানে?'

'যেখানেই থাক একা নেই,' বলল ম্যাককয়। 'আর ওর সাথে যে আছে সে ফাসটো নয়।'

'হ্যাঁ, ওই মেয়েটা—কী যেন নাম? হুটিয়া?'

'নিজেরটা নিয়ে কেন যে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না—' বিরক্তির সাথে বলল মিলস।

'দরকার কী সন্তুষ্ট থাকার?' বলল মার্টিন। 'সুযোগ পেলে আমিও লাগব ওটিয়ার পেছনে।'

'তা না হলে আর গণ্ডগোল বাধাবে কী করে?' বলল কুইনটাল। 'ইন্ডিয়ানদের মেয়েমানুষ ভাগিয়ে নেবে তোমরা আর ওরা চুপচাপ বসে থাকবে ভাবছ? আমি জনের দলে, নিজেরটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত সবার।'

'হ্যাঁ, আমারও সেই মত,' যোগ করল ম্যাককয়। 'ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে গণ্ডগোল একবার শুরু হলে কোথায় গিয়ে যে তার শেষ হবে কেউ বলতে পারে না। যতদিন আমরা চাইব ততদিনই আমরা শান্তিতে থাকার সুযোগ পাব। সুযোগটা ধরে রাখতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু ইন্ডিয়ানরা ক'দিন ধরে রাখবে ভাবো?' জিজ্ঞেস করল মার্টিন। 'ওদের তিনজন আছে মেয়েমানুষ ছাড়া। আমার তো মনে হয় শিগ্‌গিরই আমাদেরগুলোর দিকে হাত বাড়াবে।'

'আমারটার দিকে যে বাড়াবে না সে আমি বলতে পারি,' বলল মিলস।

'হ্যাঁ, তা-ই তোমার ধারণা, জন! ওর দিকেই প্রথম বাড়াবে। এর মধ্যেই কেউ বাড়িয়েছে কিনা কে জানে?'

মুহূর্তের মধ্যে হাঁটু গেড়ে সোজা হয়ে বসল মিলস। দু'হাতে মার্টিনের কাঁধ চেপে ধরে ঝাঁকাতে লাগল ভয়ানক ভাবে।

'কী বললি, শয়তান! বল্ কবে দেখেছিস। বল, নইলে আজই তোর শেষ!'

'ছেড়ে দাও, জন। ঈশ্বরের দোহাই। কিছু দেখিনি আমি! একটু রহস্য করছিলাম তোমার সাথে।'

সন্দেহের চোখে মার্টিনের দিকে তাকিয়ে রইল মিলস, ছাড়ল না ওর কাঁধ। অবশেষে অন্যরা যখন আশ্বাস দিল সত্যিই মার্টিন ঠাট্টা করছিল ও ছাড়ল ওকে।

'এসো, এসো, খামোকা বন্ধুতে বন্ধুতে ঝগড়ার কোন মানে আছে?' হালকা সুরে বলল ম্যাককয়। 'প্রুডেন্স, আমাদের একটু নাচ দেখাবে তুমি?' মিলস-এর দিকে ফিরল ও। 'তুমি আবার কিছু মনে করছ না তো, জন? ওর নাচ দেখতে এত ভাল!'

'মনে করবে? কেন?' বলল মার্টিন। 'নাচো, প্রুডেন্স।'

ব্র্যান্ডির তাত এর মধ্যে মেয়েটার মগজে পৌঁছেছে। দ্বিতীয়বার সাধতে হলো না তাকে। উঠে দাঁড়াল। হাঁটুর ওপর চাপড় মেরে দ্রুত লয়ে তাল দিতে লাগল লোকগুলো। নাচ শুরু করল প্রুডেন্স। উন্মুক্ত বাহু ঘুরিয়ে, কোমর দুলিয়ে, প্রত্যেকটা পুরুষের সামনে পালা করে থেমে কটাক্ষ হেনে নাচল সে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ খিলখিলিয়ে হেসে ছুটে গেল এক ঝোপের আড়ালে।

লোকগুলো হৈ-হৈ করে উঠল উৎফুল্ল কণ্ঠে।

'যেও না, যেও না, ডানাকাটা পরী!' চিৎকার করল মার্টিন। 'ফিরে এসো, আরও দেখব আমরা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বলল ম্যাককয়। 'জন, যেদিন বলবে সেদিনই আমি মেয়েমানুষ বদল করতে রাজি তোমার সাথে।'

'দরকার নেই,' হেসে বলল মিলস। 'তোমারটা তোমার থাক, আমি আমারটা নিয়েই খুশি। কই, পিয়ারী, জান, এসো, আমরা আরও দেখব।'

না শোনার ভান করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটা। তারপর ফিরে এসে

মিলস-এর হাত থেকে ব্র্যান্ডির বোতলটা ছোঁ মেরে নিয়ে পান করল আবার। কুইনটাল মুগ্ধ চোখে ওকে দেখতে লাগল আর মাথা চুলকাতে লাগল। ওদেরও ধরতে শুরু করেছে ব্র্যান্ডি।

'ম্যাট কুইনটাল!' ম্যাককয় বলল, 'এত তাড়াহুড়োর কী আছে, আরেকটু আস্তে খাও।'

'কেন, হিংসে হচ্ছে আমার খাওয়া দেখে?' দাঁত বের করে হাসল কুইনটাল। 'তোমার সামনে আস্ত একটা বোতল, বেশি বক বক করলে কিন্তু ওটা নিয়ে নেব।'

'না, না, ম্যাট, হিংসে করব কেন? বলছি আসলে আস্তে খেলে অনেকক্ষণ খেতে পারব তো তাই।'

'হ্যাঁ,' বলল মিলস, 'আস্তে খাও, ম্যাট, সারারাত চলে যাবে।'

বিকেল অনেক দূর গড়িয়েছে। সন্ধ্যার বেশি বাকি নেই। পশ্চিমে পাহাড়টার ছায়া ওদের ওপর দিয়ে চলে গেছে দূর পুবে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই কারও। হৈ-হল্লা করতে করতে বোতলে চুমুক দিয়ে চলেছে ওরা। প্রুডেন্সও একটু পরপরই এসে মিলস-এর গলা জড়িয়ে ধরে খেয়ে নিচ্ছে এক ঢোক। তারপর আবার গিয়ে শুরু করছে নাচ। এখন আর সাধতে হচ্ছে না ওকে। নিজে থেকেই নাচছে সে মনের আনন্দে। যত সময় যাচ্ছে, তত ব্র্যান্ডি পেটে পড়ছে আর ততই উদ্দাম হয়ে উঠছে ওর লীলায়িত দেহ ভঙ্গিমা। ঘোর লেগেছে ওর মনে। চাহনিতে স্পষ্ট আমন্ত্রণ। ক্ষণে ক্ষণে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে চুল ঢাকা স্তন। সবাই উপভোগ করছে ওর এই উদ্দামতা কেবল মিলস ছাড়া। ওর মুখ একটু একটু করে গম্ভীর হচ্ছে। অবশেষে সে বলতে বাধ্য হলো:

'হয়েছে, জান, আর না! চলো আমরা যাই।'

কথাটা কানেই ঢুকল না প্রুডেন্সের। বরং মিলসকে রাগিয়ে দেয়ার জন্যেই যেন হেসে উঠল খিলখিল করে। নাচের ছন্দে ছন্দে এগিয়ে গেল কুইনটালের দিকে। এই সুযোগটার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল কুইনটাল। বিদ্যুৎগতিতে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল ওকে। টেনে এনে বসাল কোলের ওপর। জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো সজোরে। অমনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মিলস। আগুন ঝরছে ওর দু'চোখ থেকে।

'ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও, বদমাশ।'

এতক্ষণে একটু শান্ত হয়েছে মেয়েটা নিজেকে ছাড়ানোর জন্যে হাত্ পা ছুঁড়তে শুরু করল সে কিন্তু কুইনটাল শক্ত করে ধরে রইল ওকে। মত্ত চোখে তাকাল মিলস-এর দিকে।

'ও জানে পুরুষ হিসেবে কে যোগ্য, তাই না, মেয়ে?' বলে আবার কুইনটাল চুমু খেলো মেয়েটার ঠোঁটে। তারপর আবার। মিলস ফুঁসে উঠে এগিয়ে গেল। ও যখন প্রায় ঘাড়ের ওপর চলে এসেছে তখন নিরুপায় হয়েই যেন প্রুডেন্সকে ছেড়ে উঠে দাড়াল কুইনটাল অমনি ওর মুখে এসে লাগল মিলস-এর ঘুসি। রক্ত বেরিয়ে এল কুইনটালের নাক দিয়ে। টলে উঠে পিছিয়ে গেল এক পা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে রুখে দাঁড়াল সে। নীল চোখ জোড়ায় দেখা দিয়েছে উন্মত্তের দৃষ্টি।

'ব্যাটা বেজন্মা বদমাশ! তোকে খুন করব আজ!' গর্জে উঠে মিলস-এর বুকে

ঘুসি চালাল কুইনটাল। চিৎ হয়ে পড়ে গেল মিলস। মুহূর্তের মধ্যে উঠে দাঁড়াল আবার। ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে ছুটে গিয়ে আঁকড়ে ধরল কুইনটালের কোমর। ম্যাককয় আর মার্টিন এর মধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। উদ্বিগ্ন চোখে দেখছে দুই সঙ্গীর মত্ত লড়াই।

'থামো। থামো তোমরা।' অনুনয়ের সুরে বলল ম্যাককয়। 'ম্যাট, থামো। কী করছ-ভেবে দেখেছ!'

ঘাড় ফিরিয়ে বুনো চোখে তাকাল কুইনটাল। দশাসই ওজনের এক ঘুসি হাঁকাল ম্যাককয়-এর চোয়াল লক্ষ্য করে। হাত পা ছড়িয়ে ছিটকে পড়ে গেল ম্যাককয়। মিলস প্রচণ্ড শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত তরুণ কুইনটালের সাথে পারল না। একটু পরেই দেখা গেল হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে সে। আর তার পিঠের ওপর বসে গলা চেপে ধরেছে কুইনটাল। চোখ দুটো মিলস-এর বিস্ফারিত হয়ে গেছে, জিভ বেরিয়ে এসেছে।

'আইজাক। ঠেকাও ওকে। খুন করে ফেলল মিলসকে!' চিৎকার করল ম্যাককয়।

পরমুহূর্তে দু'জন পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুইনটালের ওপর। দু'জনের মিলিত শক্তির সাথে পেরে উঠল না কুইনটাল। মিলস-এর পিঠের ওপর থেকে টেনে নামিয়ে ওকে পেড়ে ফেলল মাটিতে। এক সেকেন্ড পরে মিলসও উঠে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। এখনও যুঝছে কুইনটাল। সর্বশক্তিতে চেষ্টা করছে তিনজনকে ফেলে দিতে বুকের ওপর থেকে।

'ধন্যবাদ ঈশ্বরকে! আলেক্স এসে গেছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ম্যাককয়। 'জলদি, আলেক্স!'

কুইনটাল ঘাড় ফেরানোর সুযোগ পাওয়ার আগেই স্মিথের বিরাট শরীরটাও ওর ওপর স্থান পেল। দানবের মত লড়ল কুইনটাল, কিন্তু লাভ হলো না। শিগ্‌গিরই স্মিথের বলিষ্ঠ হাতের গোটা কয়েক ঘুসি খেয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ল ও। হাঁপাচ্ছে ভীষণ ভাবে। রক্ত আর ঘাম দরদর করে নামছে ওর মুখ বেয়ে।

'আজ তোকে জানে মেরে ফেলব!' চিৎকার করল স্মিথ। 'মাতলামি করার আর জায়গা পাস না।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নব উদ্যমে ধস্তাধস্তি শুরু করল কুইনটাল।

'তোমাদের কারও কাছে রশি আছে?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল স্মিথ। 'বেঁধে ফেলতে হবে শয়তানটাকে।'

'গ্রুডেন্স!' মিলস ডাকল, 'জলদি খানিকটা পুরাউ-এর বাকল নিয়ে এসো তো!'

মেয়েটা এতক্ষণ আতঙ্কিত চোখে দেখছিল লোকগুলোর লড়াই। মিলস-এর কথা শেষ হতে না হতেই ছুটল কাছের এক হিবিকাস গাছের দিকে। নিচু একটা ডাল থেকে লম্বা দড়ির মত খানিকটা মসৃণ ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে এল। বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর তা দিয়ে কুইনটালকে বেঁধে ফেলতে পারল স্মিথ, মার্টিন, মিলস আর ম্যাককয়। এরপর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল ম্যাথু কুইনটাল।

'তুমি এসে পড়ে বড় বাঁচা বাঁচিয়েছ, আলেক্স!' বলল ম্যাককয়। 'আরেকটু হলে

ছুটে গেছিল আমাদের তিন জনের হাত থেকে।...আর চিন্তা নেই, এবার আমরা নিশ্চিন্তে খেতে পারব। ম্যাট ঘুমিয়ে গেছে।'

'তোমাদের ডেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পাঠানো হয়েছে আমাকে,' বলল স্মিথ। 'মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান ঠিক করেছেন আজ রাতেই জাহাজ পুড়িয়ে দেবেন। তোমরা ইচ্ছে করলে যেতে পারো দেখার জন্যে, ইচ্ছে করলে থাকতেও পারো এখানে। তবে উনি চান তোমরা জানো খবরটা।'

'পুড়িয়ে দিতে বলো। আমরা আর কী দেখব?' বলল মিলস।

'ওর ধারণা বাকি-যা কাঠ আছে তা খুলে তীরে নিতে যে ঝামেলা হবে সে তুলনায় কাজে লাগবে না ওগুলো।'

'তিন দিন আগেই আমরা একথা বলেছি,' বলল মার্টিন। 'দেখ, আলেক্স, বেশ খানিকটা ব্র্যান্ডি এখনও আছে; ইচ্ছে হলে আমাদের সঙ্গে থেকে যেতে পারো তুমি।'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করল স্মিথ। তারপর হঠাৎ ধপ করে বসে পড়ল মাটিতে।

'দাও, আইজাক,' বলল সে। 'জাহান্নামে যাক জাহাজ পোড়ানো। দেখে কী হবে?'

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হলো। কুইনটালের নাসিকা গর্জনে প্রকম্পিত হচ্ছে বনভূমি। মার্টিন এখন বদ্ধ মাতাল। কখনও বিড় বিড় করে নিজের সঙ্গে কথা বলছে, কখনও সঙ্গীদের সঙ্গে; কখনও তুড়ে গাল দিচ্ছে ক্রিশ্চিয়ানকে মাঝ সাগরে এমন এক পাথরের ওপর চিরদিনের জন্যে এনে ফেলার অভিযোগে। স্মিথ আর ম্যাককয় বৃথাই চেষ্টা করল ওকে শান্ত করার। অবশেষে বিরক্ত হয়ে ওরা ওর দিকে মন দেয়া বন্ধ করল। মিলস নিঃশব্দে পান করে চলেছে। প্রুডেন্স ঘুমিয়ে গেছে ওর কোলে মাথা রেখে।

'তুমি এক তুখোড় মদখোর, উইল,' স্মিথ বলল। 'বাজি ধরে বলতে পারি মার্টিনের দ্বিগুণ খেয়েছ তুমি, কিন্তু কথা শুনে বোঝার উপয় নেই।'

'আমার আছে একটা চমৎকার স্কচ পেট আর শক্ত স্কচ মাথা,' জবাব দিল ম্যাককয়, 'যত মদই খাই হজম হয়ে যায় সুন্দর, মাথায় ওঠে না।'

হাসল স্মিথ। 'তা যা বলেছ।'

এই সময় পুব দিকের পাহাড়ের পেছন থেকে আকাশে উঠল লালচে এক আভা। ক্রমশ বাড়ছে তা। দেখতে দেখতে ওদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছুল সে আলো। লাল বর্ণ ধারণ করল ওদের মুখ, শরীর; আশপাশের গাছপালা।

উঠে দাঁড়াল স্মিথ। 'চলো উইল, শেষটা দেখি গিয়ে। ম্যাটের বাঁধন কেটে দিয়ে যাই। এখন আর কোন গোলমাল করতে পারবে না। জন, তুমি কী করবে, থাকবে না যাবে আমাদের সাথে?'

মিলস উঠে কোলে তুলে নিল মেয়েটাকে। 'তাঁবুর পাশ দিয়ে যেও,' বলল ও। 'একে নামিয়ে দিয়ে যাব।'

মার্টিন ঘুমিয়ে গেছে। ম্যাককয় ওর পাশে পড়ে থাকা বোতলটা তুলে নিয়ে উঁচু করল আলোর বিপরীতে।

'অনেকটা রয়ে গেছে দেখছি,' বলল ও।
'রেখে দাও,' মিলস বলল। 'ওটুকু ওর না?'
'সেটা কি উচিত হবে? ম্যাট হয়তো জেগে উঠবে...'
'হ্যাঁ, ভাল একটা স্কচ কারণ আছে তার,' স্মিথ বলল। 'উইল, হাতে হাতে দাও ওটা, শেষ করে ফেলি।'
বোতলটা শূন্য করে মার্টিনের পাশে রেখে রওনা হলো ওরা। স্মিথ চলল পথ দেখিয়ে। তাঁবুতে পৌঁছে কাউকে দেখা গেল না। মিলস প্রুডেন্সকে ভেতরে শুইয়ে দিয়ে আবার রওনা হলো। খাঁড়ির তীরে পৌঁছে দেখল দাউ দাউ করে জ্বলছে জাহাজ। আগুনের লকলকে শিখা আর স্ফুলিঙ্গ ছিটকে উঠছে আকাশে। বাউন্টির নাবিকরা সৈকতে বসে তাকিয়ে আছে সেদিকে।
'দারুণ আলো ছড়াচ্ছে!' অস্ফুটে উচ্চারণ করল ম্যাককয়।
'হ্যাঁ,' বলল স্মিথ।
আর কোন কথা বলল না কেউ।

চার

এখন সবাই আরও গভীর ভাবে উপলব্ধি করছে বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারটা। শূন্য সাগর চারদিক থেকে বেষ্টন করে আছে ওদের। জলের প্রান্তসীমায় বাউন্টির দগ্ধাবশেষ তেমনি পড়ে আছে। ওগুলো ভাসিয়ে নেয়ার মত উদ্দাম উত্তাল এখনও হয়নি সাগর, যেন নিয়তির অলঙ্ঘনীয়তাকে দেখিয়ে দিতে চায় চোখে আঙুল দিয়ে। রোজ দিনের কাজ শেষে ওরা আসে, একা বা দু'তিনজনে দল বেঁধে, খাঁড়ির সোজাসুজি ঢালের চূড়ায় বসে। দিনের শেষ আলো যতক্ষণ না আকাশ ছেড়ে যায় ততক্ষণ বসে থাকে চুপচাপ। কখনও দেখে দিগন্ত বিস্তৃত সাগরের বিস্তার, কখনও বা ওদের জাহাজের ধ্বংসাবশেষ। পোড়া কাঠের স্তূপ দেখে ওরা যেন ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারে না সত্যিই ওটা এককালে বাউন্টি ছিল, ওরা চিরদিনের জন্যে হারিয়েছে জাহাজটাকে।
বিদ্রোহীদের ভেতর সবচেয়ে বেশি মুষড়ে পড়েছে মালী ব্রাউন। লোকটা ছোটখাট, একটু লাজুক প্রকৃতির, বছর ত্রিশেক বয়েস; স্বভাব চরিত্রে দলের আর সবার চেয়ে আলাদা; জাহাজের কাজ বা সাগর সম্পর্কে কিছুই প্রায় জানে না। রুটিফলের চারার পরিচর্যায় সাহায্যের জন্যে ওকে আনা হয়েছিল উদ্ভিদ বিজ্ঞানী নেলসনের পরামর্শে। বিদ্রোহের দিন ভোরে মার্টিন ওকে জাগিয়ে ওর হাতে একটা মাস্কেট ধরিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিল ডেকে চলে যাওয়ার। সেখানে ও অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে ছিল হাঁদার মত আর সবিস্ময়ে দেখেছিল, শুনেছিল বিদ্রোহীদের কাজকর্ম, হৈ-হল্লা। ক্রিশ্চিয়ান স্বয়ং বিদ্রোহীদের ভেতর ওকে দেখে অবাক হয়েছিল, দুঃখ পেয়েছিল। ফুল, মাটি, গাছপালা-মোট কথা প্রকৃতিকে ব্রাউন অসম্ভব ভালবাসে। এই একটা ব্যাপারই ওকে বাঁচিয়েছে। নইলে বেচারা হয়তো মরেই যেত বাড়ি আর

আত্মীয় স্বজনের কথা ভাবতে ভাবতে।

তাহিতি থেকে আসা মেয়েগুলোর অবস্থাও ব্রাউনের মত। রোমাঞ্চ আর উত্তেজনার সন্ধানে ওরা রওনা হয়েছিল বিদ্রোহীদের সাথে। এই দ্বীপে ওঠার পর সেই রোমাঞ্চ সেই উত্তেজনা ওদের থিতিয়ে এসেছে। এখন বাড়ির জন্যে কাঁদে সবাই—একমাত্র মিলস-এর প্রুডেন্স আর ব্রাউনের জেনি ছাড়া। প্রুডেন্স এমনিতে লঘু স্বভাবের মেয়ে; তার ওপর মিলস-এর মত উষ্ণ পুরুষের সান্নিধ্য একেবারেই ভুলিয়ে দিয়েছে ওকে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কথা। আর জেনি অত্যন্ত কর্মঠ মেয়ে। কাজই ওর প্রাণ। তাছাড়া ব্রাউনকে ও প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। এর একটা কারণ বোধ হয় ব্রাউন ওর ওপর নির্ভর করে অনেকখানি। ব্রাউনের যে মানসিক শক্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা নেই ওর তা আছে। তাছাড়া এখানকার মেয়েদের ভেতর ও-ই সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। সে কারণে ও মনে মনে বেশ একটা দায়িত্ব বোধ করে বাকি মেয়েদের দেখে শুনে রাখার। কাজ, কাজ আর কাজ, সেই সাথে এতগুলো দায়িত্ব—সব মিলিয়ে দেশের কথা ভাবার ফুরসতই ও প্রায় পায় না। বয়েসে বড় হলেও মর্যাদায় যারা বড়—যেমন ক্রিশ্চিয়ানের মাইমিতি, ইয়ং-এর টাউরুয়া, মিনারীর মোয়েটুয়ার ওপর কখনও খবরদারি ফলাতে যায় না। জানে সেটা বেয়াদবি হবে।

দিন গড়ানোর সাথে সাথে নিঃসঙ্গতার বোধটা ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগল সবার ভেতর থেকে। সামনে প্রচুর কাজ। নিজেদের স্বার্থেই সেগুলো ওদের করতে হবে। মন খারাপ করে বসে থাকার সময় কোথায়? অস্থায়ী আবাসস্থলের কাছাকাছি এক টুকরো জমি বাছাই করা হয়েছে প্রথম বাগানের জন্যে। প্রায় এক সপ্তাহ সবাইকে সেখানে ব্যস্ত থাকতে হলো জমি পরিষ্কার, চাষ এবং গাছ লাগানোর কাজে। এরপর বাগানটা ছেড়ে দেয়া হলো ব্রাউনের হাতে; কয়েকটা মেয়েকে দেয়া হলো ওর সহকারী হিসেবে। অন্যরা ক্রিশ্চিয়ানের নেতৃত্বে শুরু করল গৃহনির্মাণ।

স্থায়ী আবাসস্থল হিসেবে বাছাই করা হয়েছে সেই অশ্বত্থ গাছওয়ালা উপত্যকাটাকে—প্রথম দিন দ্বীপ দেখতে বেরিয়ে যেটা পছন্দ করেছিল ক্রিশ্চিয়ান আর মাইমিতি। জায়গাটার নাম দিয়েছে ওরা 'গোট হাউস পীক'। উপত্যকার কোন অংশে কে থাকবে তা ঠিক করা হয়েছে আলাপ আলোচনা করে। ব্রাউন আর জেনি ছাড়া সবাই মূল উপত্যকার সাগরমুখী ঢালে জায়গা বাছাই করেছে—ওরা দু'জন বেছেছে ভেতর দিকে। বিশাল অশ্বত্থ গাছটার নিচে হবে ক্রিশ্চিয়ান আর মাইমিতির বাড়ি। দ্বিতীয় বাড়িটায় থাকবে ইয়ং আর আলেকজান্ডার স্মিথ তাদের মেয়েমানুষ টাউরুয়া আর বলহাদিকে নিয়ে। মিলস, মার্টিন আর উইলিয়ামস গড়ে তুলবে তৃতীয় গৃহস্থালী তাদের নারী প্রুডেন্স, সুজানাহ আর ফাসটোকে নিয়ে। চতুর্থ গৃহস্থালী হবে কুইনটাল আর ম্যাককয়, সারাহ আর মেরীকে নিয়ে, আর পঞ্চম এবং সবচেয়ে বড়টা ইন্ডিয়ানদের নিয়ে। যেটায় থাকবে ন'জন—মিনারী, তেতাহিতি, টারারু, তে মোয়া, নিহাউ আর হু আর প্রথম তিনজনের স্ত্রী মোয়েটুয়া, নানাই আর হুটিয়া। তে মোয়া, নিহাউ আর হু-এর কোন মেয়েমানুষ নেই।

শ্বেতাঙ্গরা—ব্রাউন ছাড়া—তৈরি করল কাঠের বাড়ি কাঠের যোগান এল আংশিক বাউন্টির সাজ সরঞ্জাম থেকে আংশিক দ্বীপের গাছ থেকে। ছাদ বা চাল

তৈরি হলো প্যানডানাস পাতা দিয়ে। ইন্ডিয়ানদের বাড়ির জন্যে জায়গা বাছাই করা হয়েছে বাউন্টি বে থেকে সিকি মাইল মত দূরে এক বন বীথিকায়। কুইনটাল আর ম্যাককয়ের বাড়ি অবতরণস্থলের সবচেয়ে কাছে। বাকি বাড়িগুলো তৈরি হলো কাছাকাছি; তবে এমন ভাবে যাতে একটা থেকে অন্যটা দেখা না যায়, বাড়িগুলো থাকে গাছপালার আড়ালে।

বাগান তৈরি শেষ আর বাড়ি তৈরি শুরুর মাঝখানে আরেকটা কাজ করল ওরা: জাহাজ থেকে নামানো মালপত্র, কাঠ-খুঁটি সব বয়ে নিয়ে গেল স্থায়ী আবাসস্থলে। একাজে লাগানো হলো ইন্ডিয়ানদের, ওদের সাহায্য করল মেয়েদের ভেতর যারা একটু শক্ত পোক্ত তারা। শ্বেতাঙ্গরা ব্যস্ত রইল একটা গুদাম ঘর তৈরির কাজে। গুদাম তৈরি হওয়ার পর নষ্ট হওয়ার মত বা যত্ন করে রাখার মত সব জিনিস তাতে ঢুকিয়ে তালা মেরে দেয়া হলো। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চাবি রইল ক্রিশ্চিয়ানের কাছে।

কঠোর নিরপেক্ষতা আর ন্যায়পরায়ণতার সাথে ছোট্ট উপনিবেশটাকে শাসন করতে লাগল ক্রিশ্চিয়ান। সাদা এবং বাদামী–সবাইকে ও সমান অধিকার দিয়েছে। কাজকর্ম করার সময় কারও ভাগে বেশি বা কম যেন না পড়ে সেদিকে কড়া নজর রাখে। উইলিয়ামসকে দেয়া হয়েছে ছোট একটা কামারশালা গড়ে তুলে লোহার জিনিস পত্র বানানোর দায়িত্ব। ইন্ডিয়ান হু-কে দেয়া হয়েছে ওর সহকারী হিসেবে। মিলস আর স্মিথ পেয়েছে কাঠ চেরাই-এর দায়িত্ব। কুইনটাল আর ম্যাককয় দেখা শোনা করছে জীবজন্তুর, তাছাড়া বসতির কাছেই দুটো ঘের তৈরি করছে মোরগ-মুরগি আর গাভীন মাদী শুয়োরগুলোর জন্যে। ব্রাউনকে আর সব কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে যাতে সে তার সময়ের সম্পূর্ণটা ব্যয় করতে পারে বাগানের পরিচর্যায়। মাওরিদের লাগানো হয় প্রয়োজন অনুসারে। উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে ওরাই মাছ ধরে খাইয়েছে সবাইকে, বন বাদাড় চুঁড়ে সংগ্রহ করে এনেছে কলা, টারো, মোম-বাদাম, বুনো ইয়াম বা রুটিফল। ক্রিশ্চিয়ান আর ইয়ং রয়েছে সব কাজের তদারকিতে। তদারকি মানে শুধু ঘুরে ঘুরে কে কেমন করছে দেখে বেড়ানো নয়, রীতিমত গায়ে খাটা। নিজের নিজের কাজ করার সময় যখনই যে ঠেকছে ওরা গিয়ে সাহায্য করছে। ওরা দু'জন কঠোর পরিশ্রমের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সবার সামনে। দুপুরে খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া উদয়াস্ত পরিশ্রম করে তারা। নারীরাও বসে নেই। পুরুষরা যখন ঘর বানাচ্ছে ওরা তখন চালের জন্যে সংগ্রহ করে আনছে পানডানাস পাতা। সেগুলো সাগরের পানিতে ভিজিয়ে মসৃণ এবং সোজা করে চালে লাগানোর উপযোগী করে দিচ্ছে।

দ্বীপে অবস্থানের শুরু থেকেই রবিবারটাকে ক্রিশ্চিয়ান আলাদা করে রেখেছে বিশ্রাম দিবস হিসেবে। এদিন বসতির কোন কাজ কাউকে করতে হয় না। ক্রিশ্চিয়ান বা ইয়ং কেউই ধর্মপ্রাণ লোক নয়, বাকি শ্বেতাঙ্গরাও তাই। ফলে রবিবারগুলোয় কোন প্রার্থনাসভা বা ধর্মানুষ্ঠান হয় না; সবাই যার যেমন ইচ্ছে কাটিয়ে দেয় দিনটা।

শেষ ফেব্রুয়ারির এক রোববার বিকেলে ক্রিশ্চিয়ান আর ইয়ং দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু

চূড়া দুটোকে সংযুক্ত করেছে যে পাহাড় সেটায় গিয়ে উঠেছে। জায়গাটা চমৎকার এক পর্যবেক্ষণ স্থান। পুব দিকে বিছিয়ে আছে মূল উপত্যকা। উল্টো দিকে পাথুরে ঢাল নেমে গেছে সাগর পর্যন্ত। কয়েকটা ছোট ছোট জলপ্রপাত--সাম্প্রতিক বর্ষণের ফল--ঝরে পড়ছে পাহাড়ের গা বেয়ে। দ্বীপটা ছোট হলেও এত উঁচু থেকে তার সবুজ সরল অবয়ব মন্দ দেখাচ্ছে না। দ্বীপের চারপাশে আদিগন্ত বিস্তৃত বিশাল বারিধি; কোনদিকে কূল নেই, কিনার নেই। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এই বিস্তৃতির ওপর দিয়ে এগিয়ে গেলেও বুঝি এর শেষ হবে না।

একটা পাথরের ওপর পাশাপাশি বসেছে দু'জন। দু'জনই চুপ। লোক সমাজের বাইরে এই নির্জন দ্বীপটা ক'দিনেই ওদের বদলে দিয়েছে ভীষণভাবে। এত দিনকার মন-মানসিকতা, ধ্যান-ধারণা পাল্টে ফেলতে হচ্ছে। এ এক নতুন জীবন। এর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া সহজ নয়। সকল ব্যস্ততার মাঝেও ঘুরে ফিরে আসে ভবিষ্যতের চিন্তা। শেষ পর্যন্ত এখানে নিরুপদ্রবে থাকা যাবে তো? রাজার জাহাজ যদি আসে খুঁজে পাবে না তো ওদের?

'অনেক দিন ধরে ভাবছি, একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমাকে,' হঠাৎ নীরবতা ভাঙল ক্রিশ্চিয়ান। 'তোমার কী মনে হয়, নেড, শেষ পর্যন্ত ব্লাই তার সঙ্গীদের নিয়ে পৌঁছুতে পারবে দেশে?'

চকিতে একবার ক্রিশ্চিয়ানের দিকে তাকাল ইয়ং। 'এই প্রশ্নটার জন্যে এতদিন অপেক্ষা করছিলাম,' বলল সে। 'দু'একবার ভেবেছি আমিই আপনাকে করব, সাহস পাইনি।'

'যাহোক, বলো তোমার মত।'

'আমার মনে হয় পৌঁছুতে পারবে।'

'সত্যি বলছ, নেড?' আকুল কণ্ঠে বলল ক্রিশ্চিয়ান। 'সত্যিই ওরা বেঁচে যাবে শেষ পর্যন্ত?...নাহ্, কী করে তা সম্ভব? উনিশজন নিরস্ত্র মানুষ অত কম খাবার পানীয় নিয়ে কী করে পাড়ি দেবে বারোশো লিগ সাগর? পথে যেসব দ্বীপ পড়বে কোনটায় নামতে পারবে না। নামার অর্থ মৃত্যু। তাহলে?'

'তবু আমার মনে হয় পারবে,' জবাব দিল ইয়ং। 'ওদের নেতৃত্বে আছে কে একবার ভাবুন; ভাবুন তার নৌচালনায় দক্ষতার কথা। প্রশান্ত মহাসাগরে যতগুলো জানা দ্বীপ আছে তার প্রত্যেকটার অবস্থান--অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ তার মুখস্থ। তাছাড়া একবার ভাবুন লোকটার মানসিক শক্তি কী প্রচণ্ড! আমার মনে হয় পারবে ও যদি সবার সহযোগিতা পায় ঠিকমত।'

'তা ঠিক, তা ঠিক। তুমি বোধহয় ঠিকই বলছ, নেড। কেউ যদি পারে ব্লাইই পারবে।'

'এখন, যখন ওদের নিয়ে আমরা আলাপ করছি, তখন ওরা হয়তো পৌঁছে গেছে ইংল্যান্ডের কাছাকাছি,' গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ইয়ং। 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ পর্যন্ত পুরো পথ ওদের পুবাল বাতাস পাওয়ার কথা। যদি পেয়ে থাকে, নিশ্চয়ই বাতাভিয়া থেকে অক্টোবর বহর ধরতে পেরেছে।'

'হুঁ, তা সম্ভব।...তবু যদি--যদি একটু নিশ্চিত হতে পারতাম।'

'অনিশ্চিতের কিছু নেই। যে পথে ওরা যাবে সেপথে এত দ্বীপ আছে তাদের

অনেকগুলোতে নেমেই ওরা খাবার-পানি সংগ্রহ করে নিতে পারবে। ওসব দ্বীপে যদি জংলীরা থাকে তবু পারবে। অতটুকু একটা নৌকা এক দু'দিন জংলীদের চোখের আড়ালে রাখা অসম্ভব নয়।'

'যাকগে ওসব নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই; যা হবার তা হবে।'

'আচ্ছা ধরুন ব্লাই পৌঁছে গেল ইংল্যান্ডে। তারপর?'

তিক্ত একটু হাসি হাসল ক্রিশ্চিয়ান। 'তারপর হৈ-চৈ শুরু হয়ে যাবে। এমন হৈ-চৈ যা শত বছরের ভেতর ইংল্যান্ডের মানুষ দেখেনি। আমার সম্পর্কে বলা হবে···।' থেমে গেল সে। একটু পরে আবার বলতে লাগল, 'কি অদ্ভুত না, নেড?—এই ছোট্ট দ্বীপে আমরা বুড়ো হব, আমাদের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনীরা বড় হবে আমাদেরকে ঘিরে। সভ্য দুনিয়া আমাদের কথা জানতেই পারবে না কোনদিন।'

ইয়ং হাসল একটু। 'পঞ্চাশ বছর পর কেমন আশ্চর্য এক উপনিবেশ হবে এটা! নতুন একটা জাতির সূচনা বলা যাবে।'

'আর ভাষা! এখনই, আমার মনে হয়, অদ্ভুত এক ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছি আমরা। অর্ধেক ইংরেজি অর্ধেক ইন্ডিয়ান।'

'শেষ পর্যন্ত ইংরেজিই বেঁচে থাকবে আমার ধারণা,' ইয়ং বলল। 'মিলস, কুইনটাল আর উইলিয়ামস এতদিন আছে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে অথচ প্রায় শেখেইনি তাদের ভাষা, কোনদিন শিখবে বলেও মনে হয় না। এর একটা কারণ বোধহয় ওদের মেয়েমানুষরা ইংরেজি শিখে নিচ্ছে তাড়াতাড়ি। ব্রাউনের জেনি আর মিলস-এর মেয়েটা তো সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে এ ব্যাপারে।'

'খেয়াল করে দেখেছ কখনও কখনও তাহিতীয় ভাষায় চিন্তা করো তুমি?'

'হ্যাঁ, প্রায়ই। নিজের অজান্তেই। ইন্ডিয়ানদের দেশে থাকব কিন্তু কখনও তাদের মত করে ভাবব না এ কি হয়?'

'শুনে বড় ভাল লাগছে, নেড। নিশ্চিন্ত বোধ করছি। মানে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। সবাই এখানকার পরিবেশের সঙ্গে চমৎকার খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করেছে। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'যদি আমরা ওদের ব্যস্ত রাখতে পারি—শারীরিক; মানসিক দু'ভাবেই··· আপাতত আশঙ্কার কিছু নেই। বিপদ ঘটলে ঘটবে বাড়িঘর বানানো শেষ করে স্থির হয়ে বসার পর। সবার হাতেই তখন অবসর থাকবে প্রচুর।'

'ঈশ্বর করুন যেন তা না হয়।'

'আশা করি তেমন কিছু হবে না, তবু তৈরি থাকা ভাল। আচ্ছা, আমাদের লোকদের সাথে ইন্ডিয়ানদের কোনরকম গণ্ডগোল বা ঝামেলা বা তার আভাস তোমার নজরে এসেছে?'

'না। মার্টিন সেই যে ওদের পবিত্র পাথর পানিতে ফেলে দিয়েছিল তারপর আর কিছু হয়নি।'

গম্ভীর হলো ক্রিশ্চিয়ানের মুখ। 'এই মার্টিনের ওপর নজর রাখতে হবে আমাদের,' বলল সে। 'ওর মত জঘন্য স্বভাবের মানুষ হয় না। দক্ষিণ সাগরের

সবচেয়ে ইতর মাগুরিটাও ওর চেয়ে ভাল। সাদা চামড়ার সুযোগ ও নেয়ার চেষ্টা করবে আমার মনে হয়।'

'এই চেষ্টা শুধু মার্টিনই করবে না,' ইয়ং জবাব দিল, 'মিলস এবং কুইনটালেরও একই মনোভাব ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে।'

'তবু ওদের ভেতর একটা শালীনতা বোধ আছে যা মার্টিনের ভেতর নেই। মিনারী আর তেতাহিতির কাছে ওর সম্পর্কে আমি বলেছি। বলেছি, শ্বেতাঙ্গ সমাজের খুবই নিচু গোত্রে জন্ম ওর, ওর আচার ব্যবহারে ওরা যেন কিছু মনে না করে। ওরা বুঝেছে আমার কথা। সত্যি বলতে কি আমি বলার আগেই ওরা টের পেয়েছে।'

ইয়ং মাথা ঝাঁকাল। 'মিনারী আর তেতাহিতিকে মার্টিন ঘাঁটাবে বলে আমি মনে করি না। পারলে ও হু, টারারু আর তে মোয়ার পেছনে লাগবে।'

'আর জ্বালাবে ওর নিজের মেয়েমানুষ সুজানাহকে,' ক্রিশ্চিয়ান যোগ করল। 'মেয়েটার জন্যে দুঃখ হয়। আমার তো ধারণা এর ভেতরেই নানা খুঁটিনাটি নিয়ে ওর জীবন দুর্বিষহ করে ছেড়েছে মার্টিন।' উঠে দাঁড়াল ও। 'চলো যাওয়া যাক, নেড। শিগ্‌গিরই অন্ধকার হয়ে যাবে।'

ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। ধীরে ধীরে এপিয়ে চলল প্যানডানাস আর রাটা গাছের ঘন ঝোপ ঝাড়ের পাশ কাটিয়ে।

এইসব ঝোপেরই একটার ভেতর বাউন্টির আরও দু'জন বিকেল কাটিয়েছে।

ক্রিশ্চিয়ান আর ইয়ং ঝোপটা পেরিয়ে যেতে না যেতেই ঘন ফার্নের পাতা সরিয়ে ওদের অপসৃয়মান মূর্তিদুটোর দিকে তাকাল হুটিয়া। উনিশ কুড়ি বছর বয়েস মেয়েটার। সুন্দরী। সুগঠিত স্তন আর হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে পড়া ঘন কালো চুলের অধিকারী। সতর্ক হরিণীর মত দেখল ও ক্রিশ্চিয়ান আর ইয়ং-এর চলে যাওয়া। তারপর ঘুরে তাকাল পেছনে কারও দিকে।

'ক্রিশ্চিয়ান?' ফিসফিস করে বলল ও। 'ক্রিশ্চিয়ান আর এটুয়াটি!'

ফার্নের বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে উইলিয়ামস, মাথার নিচে হাত।

'তো কী হলো?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল ও। 'এসো, বসো এখানে।'

হাত ধরে সে হ্যাঁচকা টানে বুকের ওপর নিয়ে এল মেয়েটাকে। মেয়েটা মৃদু ধস্তাধস্তি করে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। হাসল একটু।

'তুমি, আউয়ে, জ্যাক!' বলল সে। 'খুব তাড়াতাড়ি খুব বেশি চাও। আমি যাই এখন। নইলে টারারু বলবে, "হুটিয়া কই?" আর ফাসটো বলবে, "আমার পুরুষ কই?" '

কাঁধে ধরে আবার হুটিয়াকে কাছে টানল উইলিয়ামস। 'ফাসটোকে নিয়ে ভাবতে হবে না তোমার। কাকে তুমি বেশি পছন্দ করো, টারারুকে না আমাকে?'

চতুর একটা হাসি হাসল মেয়েটা। 'তোমাকে,' বলে হঠাৎ ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে ছুট লাগাল। চোখের পলকে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

পাঁচ

সরু একটা পায়ে চলা পথ। প্রতিদিন সেটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। এঁকেবেঁকে বাউন্টি বে থেকে ঢাল বেয়ে উঠে গেছে বসতির সর্বপশ্চিম প্রান্ত অর্থাৎ ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ি পর্যন্ত। এই পথ থেকেই আরেকটা পথ বেরিয়ে চলে গেছে ছোট্ট এক উপত্যকার ধার ঘেঁষে দ্বীপের ভেতর দিকে। শেষ হয়েছে ব্রাউনের কুয়ার কাছে গিয়ে। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা একটা ঝরনার নাম রেখেছে ওরা ব্রাউনের কুয়া। অদ্ভুত গঠন ঝরনাটার। শিখর থেকে নেমেছে সরু কয়েকটা ধারায়, খানিকটা নিচে এক গিরিখাতে পড়ে তৈরি হয়েছে ছোট্ট এক হ্রদ; সেখান থেকে আবার নেমে গেছে ওটা ছোট কয়েকটা জলপ্রপাত তৈরি করে। জলপ্রপাতগুলো থেকে তৈরি হয়েছে আবার আরেকটা হ্রদ। এই হ্রদ থেকে নেমে গেছে আরও জলপ্রপাত। এইভাবে ধাপে ধাপে নেমে একেবারে নিচে তৈরি হয়েছে একটু বড় আয়তনের টলটলে জলের এক হ্রদ। একেবারে উপরের হ্রদটার একাংশকে পাথর সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে পানীয় জলের চৌবাচ্চা। ওটাতে নামা, স্নান করা বা অন্য কোনভাবে ওটার পানি দূষিত করা কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ। একেবারে নিচের অর্থাৎ সবচেয়ে বড় হ্রদটা ব্যবহার হয় স্নানের জন্যে। অন্যগুলো থেকে নেয়া হয় খাওয়া ছাড়া বাকি সব কাজের পানি। বিকেলের শেষ সময়টুকু স্নানের হ্রদটা সংরক্ষিত থাকে শুধুমাত্র মেয়েদের গোসলের জন্যে।

প্রতিদিন ওই সময় ওরা দল বেঁধে আসে। নিরাবরণ হয়ে নেমে যায় হ্রদের স্ফটিকস্বচ্ছ পানিতে। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সাঁতরে জল ছিটাছিটি করে প্রাণভরে স্নান করে। স্নান শেষে পাথরের ওপর বসে ওরা গা শুকায়, চুল শুকায়। অনেকে রোদের দিকে পিঠ দিয়ে সঙ্গে আনা ফুল লতাপাতা দিয়ে মালা বানায় মাথায় পরার জন্যে। সঙ্গে চলে গল্প প্রাণখুলে। এই গল্পের প্রায় পুরোটা জুড়ে থাকে তাহিতির কথা, সেখানকার অবারিত পাহাড়, হ্রদ, ল্যাগুনের কথা; আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের কথা। মোট কথা বর্তমানকে বিস্মৃত হয় ওরা এই সময়।

এক বিকেলে এই হ্রদের পাশের এক পাথরের ওপর বসে আছে কয়েকটা মেয়ে। গোসল শেষ। এখন চুল শুকাচ্ছে এবং আঁচড়াচ্ছে কাঠের চিরুনি দিয়ে। কয়েকজন মিষ্টি ফার্নের পাতা দিয়ে মালা বানাচ্ছে মাথায় পরার জন্যে। তাহিতির সাদা সুগন্ধী ফুল টায়ারে মাওহির কথা বলে আক্ষেপ করছিল মোয়েটুয়া।

'আর বোলো না!' ছল ছল চোখে বলল সারাহ। 'সে জিনিস আর কোনদিন আমরা দেখতে পাব না। আহা! চোখ বুজলে এখনও তার সুগন্ধ পাই।'

'আচ্ছা, মোয়েটুয়া, ধরো আমরা ফিরে গেছি তাহিতিতে, তারপর আবার বলা হচ্ছে এখানে আসতে; তুমি আসবে?' জিজ্ঞেস করল সুজানাহ।

'হ্যাঁ। ইচ্ছে না হলেও আমাকে আসতে হবে, যদি মিনারী এখানে থেকে যায়। আমি ওর বউ না? তাহিতির মত অতখানি না হলেও এ জায়গাটাও ভাল। মিনারীর

পছন্দ হয়েছে–অন্তত অপছন্দ হয়নি; সুতরাং আমাকে খুশি থাকতে হবে। তাহিতির কথা প্রথম প্রথম যতটা মনে পড়ত এখন আর ততটা পড়ে না আমার। তোমাদেরও তাই না?'

'আমার না!' তিক্ত কণ্ঠে বলল সুজানাহ। 'আমি আর কখনও ফিরব না। কক্ষনো না। কক্ষনো না।'

'কেন? আমাদের তো আগেই বলা হয়েছিল জাহাজটা আর কোনদিন ফিরবে না' শান্ত কণ্ঠে মন্তব্য করল বলহাদি। 'ক্রিশ্চিয়ান নিজে সবাইকে জানিয়েছিল।'

'কে বিশ্বাস করেছিল?' সারাহ বলল। 'মিলস এবং অন্যরাও বলেছিল এটা সত্যি না, একদিন না একদিন আমরা নিশ্চয়ই ফিরব।' মনে নেই তোমাদের, মাতাভাই থেকে রওনা হওয়ার পরদিন সকালের কথা, বাতাস দিক বদলানোয় জাহাজের মুখ যখন পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হলো?'

'এইমিওর প্রবাল প্রাচীরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা তখন,' বলল সুজানাহ, 'মনে থাকবে না আবার! মার্টিন শক্ত করে আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল রেলিংয়ের পাশে। ও জানত সুযোগ পেলে আমি লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে চলে যাব তীরে।'

'কুইনটাল তো দুই হাতে ধরে ছিল আমাকে,' মন্তব্য করল সারাহ, 'নইলে আমিও তা-ই করতাম।'

'অত তাড়াহুড়ো করে রওনা হয়ে এল কেন জাহাজ?' জিজ্ঞেস করল নানাই। 'মাতাভাইয়ের কেউ জানত না সেরাতেই ওটা রওনা হবে।'

'ওরা ভয় পেয়েছিল, আমরা যদি শেষ মুহূর্তে মত বদলে ফেলি, জবাব দিল মোয়েটুয়া।

'তা-ই হবে,' বলল প্রুডেন্স। 'নইলে ওই কাজ করবে কেন মিলস? বিকেলে পকেটভর্তি পেরেক নিয়ে গিয়ে চাচাকে দেখিয়ে কী সব বলল। অমনি চাচার চোখ লোভে চকচক করে উঠল। আমাকে ডেকে বলল, "এই সাদা লোকটার সাথে গিয়ে জাহাজে থাকবি রাতে।" আমি যখন মিলস-এর সাথে আসতে রাজি হলাম তখন ও পেরেকগুলো দিল চাচাকে। রাতে শুলাম মিলস-এর সাথে। ঘুম ভেঙে দেখি জাহাজ গভীর সাগরে।'

'এখনও আগের মত পছন্দ করো লোকটাকে?' হুটিয়া জিজ্ঞেস করল।

কাঁধ ঝাঁকাল প্রুডেন্স 'ওই আর কী।'

'ও কিন্তু তোমার জন্যে পাগল,' বলল সুজানাহ।

'ও একই সাথে বাপ আর প্রেমিকের মত,' জবাব দিল প্রুডেন্স। 'আমি যেমন খুশি তেমন চলতে পারি ওর সাথে।'

'আমি বাবা তোমাদের কারও সাথে বদল করব না আমার স্বামীকে,' বলল মোয়েটুয়া। 'আমার নিজের জাতের স্বামীই আমার পছন্দ। এই সাদা মানুষগুলো বড় অদ্ভুত আমাদের সঙ্গে মেলে না ওদের ভাবনা। কোনদিনই ওদের আমরা বুঝতে পারব না।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না,' বলল বলহাদি। 'আমার পুরুষ স্মিথ প্রায় আমাদের একজনেরই মত। ওর কথা যখন বুঝতে পারি না তখনও ওর ভাবনা আমি বুঝতে পারি। সাদা মানুষরা আমাদের জাতের চেয়ে খুব আলাদা আসলে না।'

'হয়তো,' জবাব দিল মোয়েটুয়া। 'মাইমিতিও একথা বলে। ও মনে হয় সুখেই আছে ক্রিশ্চিয়ানকে নিয়ে।'

'মাইমিতির কথা আলাদা,' সারাহ যোগ করল। 'ক্রিশ্চিয়ান আমাদের মতই আমাদের ভাষা বলে। অন্যরা খুব আস্তে শিখছে।'

প্রুডেন্সের চুল আঁচড়ানো শেষ। অভ্যস্ত হাতে খোপা বাঁধতে বাঁধতে সারাহর দিকে তাকাল সে। জিজ্ঞেস করল:

'কুইনটালের সাথে কেমন চলছে তোমার?'

'মানে প্রেমিক হিসেবে কেমন?'

'হ্যাঁ সেটাই না হয় বলো।'

সবার দিকে তাকিয়ে করুণ একটু হাসল সারাহ। 'রাত আসে। বিরাট হাতগুলোর উপর থুতনি রেখে বসে ও। কী তার চিন্তা আমি জানি না। হয়তো কিছুই না। ও চুপচাপ বসে থাকে। তাছাড়া আর কী করবে, যখন মোটে শিখতে শুরু করেছে আমাদের ভাষা? আমার দিকে তাকায়ও না। আমি বসে থাকি; কী ঘটবে জেনেও বসে থাকি। অবশেষে ঘটে। বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে ও শোয়। একটু পরেই শোনা যায় নাক ডাকার শব্দ। আটিরা! আর কিছু নেই বলার।'

প্রুডেন্স মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে হেসে উঠল খিল খিল করে। অন্যরাও যোগ দিল তার সঙ্গে। সারাহ-র মৃদু হাসি বিস্তৃত হলো। এক মুহূর্ত পরে ও-ও হাসতে লাগল অন্যদের মতই প্রাণ খুলে।

'কী অদ্ভুত লোক!' চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল নানাই।

মাথা ঝাঁকাল সারাহ। 'ও কেবল নিজের কথাই ভাবে। কোনদিন ওকে বুঝতে পারব বলে মনে হয় না।'

'বউ ছাড়া পুরুষগুলোর অবস্থা কী?' একটু পরে জিজ্ঞেস করল মোয়েটুয়া।

'করুণ,' মুচকি হেসে বলল হুটিয়া। 'কে ওদের মনের জ্বালা জুড়াবে?'

'আমি না,' বলল বলহাদি। 'আমার মানুষকে নিয়ে আমি খুশি; তাছাড়া এমন কিছু করব না যাতে ও আঘাত পায় বা রাগ করে।'

'এত সামান্য একটা ব্যাপারে রাগ করবে কেন?' জিজ্ঞেস করল নানাই।

'সাদা মানুষদের সম্পর্কে কিছু জানো না বলেই বলছ একথা,' বলল প্রুডেন্স। 'এক পুরুষের মেয়েমানুষের অন্য পুরুষের কাছে যাওয়াকে ওরা খুবই লজ্জার ব্যাপার মনে করে। তবু দরকার হলে আমি বউ ছাড়া লোকগুলোকে একটু শান্তি দেয়ার চেষ্টা করব।'

'আমিও!' বলল সুজানাহ। 'মার্টিনকে আমি যতটা ভয় পাই তারচেয়ে বেশি ঘৃণা করি। ওকে বোকা বানানোর সাহস আমি সঞ্চয় করতে পারব আশা করি।'

'এই ব্যাপারটা শুধু আমাদের ভেতরই রাখতে হবে,' বলল মোয়েটুয়া। 'সাদা মানুষদের জানতে দেয়া যাবে না।'

'ক্রিশ্চিয়ান জানতে পারলে রাগ করবে,' মন্তব্য করল বলহাদি। 'প্রুডেন্স ঠিকই বলেছে। সাদা মানুষরা একান্ত নিজের করে রাখতে চায় তাদের মেয়েমানুষদের।'

'তাহলে আরও মেয়েমানুষ আনা উচিত ছিল ক্রিশ্চিয়ানের,' জবাব দিল মোয়েটুয়া। 'ও জানে না কোন পুরুষকেই আজীবন নারীসঙ্গ বঞ্চিত রাখা যেতে

পারে না?'

'ক্রিশ্চিয়ান জানে,' বলল সুজানাহ্। 'মিনারীর মত ও-ও একজন সর্দার। দরকার যদি পড়ে ও বাঁচাবে আমাকে মার্টিনের হাত থেকে।'

'দরকার পড়বে,' বলল ফ্রেডেস্স।

'হ্যাঁ,' যোগ করল মানাই। 'তোমার এখনই ক্রিশ্চিয়ানের কাছে যাওয়া উচিত; ওকে জানানো উচিত কেমন ব্যবহার পাচ্ছ। মার্টিন একটা নোংরা।'

'তারচেয়ে খারাপ,' সুজানাহ্ বলল। 'এখানে আসার পর এ পর্যন্ত গোসল করেনি একদিনও। ওর নিষ্ঠুরতা তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু নোংরামি···। বাদ দাও, ভাল কিছু নিয়ে আলাপ করি আমরা এসো।'

ব্রাউনের বাগানটার এখন বাড়বাড়ন্ত চেহারা। অসম্ভব উর্বর এখানকার মাটি। ইয়াম, মিষ্টিআলু, আর শুকনো জমির টারো–ইন্ডিয়ানরা যাকে বলে টারুয়ার গাছগুলো দেখে মনে হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ফসল তোলা যাবে। ফলনও যে আশাতীত হবে তাতে সন্দেহ নেই। আখের কচি সবুজ ডগা বেরোতে শুরু করেছে, কলা গাছগুলোয় মোচা দেখা দিয়েছে। মূল উপত্যকায় প্রচুর বড় বড় রুটিফলের গাছ দেখা গেছে, সেগুলো থেকে ফল সংগ্রহও শুরু হয়েছে। তা সত্ত্বেও তাহিতি থেকে আনা চারাগুলো যত্ন করে লাগিয়েছে ব্রাউন। বেশ বেড়ে উঠেছে সেগুলো।

গাছগাছালির মত গবাদি পশুর বৃদ্ধিও দারুণ। বুনো ইয়ামের শিকড় খেয়ে খেয়ে শুয়োরগুলো হোঁৎকা হয়েছে; আর মোরগ-মুরগিদের জন্যে তো রীতিমত স্বর্গ দ্বীপটা। কোন জীব জন্তু এমন কি শিকারী পাখি পর্যন্ত নেই ওদের বিরক্ত করার জন্যে। তার ওপর খাবার সর্বত্র, কেবল খুঁটে মুখে দেয়ার অপেক্ষা। দ্বীপের একমাত্র বন্য প্রাণী ছোট এক ধরনের বাদামী ইঁদুর তাদের ডিম বা বাচ্চাদের কোন ক্ষতি করে না। ফলে খুব দ্রুত বাড়ছে মোরগ-মুরগির সংখ্যা। পশ্চিম দিকের উঁচু চূড়াটার ওপাশে একটা খোঁয়াড় তৈরি করে দেয়া হয়েছে ছাগলগুলোর জন্যে। ওখানে প্রতিদিন নিয়ম করে ওদের খাবার এবং পানি দেয়া হয়।

দ্বীপের মূল পাহাড় আর দক্ষিণের পাহাড়ের মাঝখানে যে উপত্যকা তার নাম দেয়া হয়েছে আউতে উপত্যকা। কারণ তাহিতি থেকে আনা আউতে বা কাপড়-গাছের প্রথম বাগানটা করা হয়েছে ওখানে।

এই উপত্যকারই এক অংশে ছোট এক কুটির তৈরি করেছে ব্রাউন আর জেনি তাদের থাকার জন্যে। জায়গাটা সুন্দর। চারদিকে গাছপালা, মাঝখানে ফাঁকা স্থানটুকু। রোদের কমতি নেই। কাছেই আছে সরু একটা প্রস্রবণ। ওদের যা পানির চাহিদা তা মিটে যায় ওটা থেকে।

ব্রাউনের নারী জেনি ছোটখাট ছিমছাম চেহারার মেয়ে হলেও, আগেই বলেছি, খুব কর্মঠ। তাছাড়াও তার ভেতর আছে এমন কিছু গুণ যার অভাব আছে ব্রাউনের। এইসব গুণের একটা হচ্ছে সংকল্পের দৃঢ়তা। একবার যা সে ভাবে তা করে ছাড়ে যেকোন মূল্যে। আরেকটা গুণ ওর, ব্রাউনকে ও ভালবাসে সত্যিকারভাবে। মা তার সন্তানকে যতটা ভালবাসে ততটাই ভালবাসে ও এই বিদেশী লোকটাকে। আর ব্রাউন ওর ওপর করে নির্ভর। এমনিতে একটু সরল, অগোছাল প্রকৃতির মানুষ

ব্রাউন। গাছ আর মাটি ছাড়া কিছু বোঝে না। এই দুটো ছাড়া আর সব ব্যাপারে জেনি ছাড়া ওর চলে না। এজন্যেই সম্ভবত জেনি এত বেশি ভালবাসে ওকে। ভাষার ব্যবধান এখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি মোটেই। ব্রাউন, যে নিজের ভাষায়ই কথা বলে অতি সামান্য অন্য কোন ভাষা আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য তার পক্ষে। এটা বুঝতে পেরেই জেনি কাজ চালানোর মত ইংরেজি শিখে নিয়েছে খুব তাড়াতাড়ি।

ব্রাউনের মত মিনারীরও আছে প্রকৃতি বা বাড়ন্ত জিনিসের প্রতি অদ্ভুত এক আকর্ষণ–যাকে প্রেম বলা যেতে পারে। তাই প্রায় প্রতিদিনই কাজের শেষে সে চলে আসে স্বল্পভাষী ব্রাউনের কাছে। খোঁজ খবর নেয় বাগানের, কোন গাছ কেমন বাড়ছে, বা কোনগুলো কবে নাগাদ ফল দেবে ইত্যাদি। জেনি পালন করে দোভাষীর দায়িত্ব। নিজের কথা শেষ হলে ব্রাউন মিনারীর কাছ থেকে শোনে তাহিতির প্রাচীন যুগের গল্প, যার একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে যুদ্ধের কাহিনী।

শেষ ফেব্রুয়ারির এক সন্ধ্যায় মিনারী স্ত্রী মোয়েটুয়াকে নিয়ে এল ব্রাউনের বাসায়। ভারী একটা ঝুড়ি নামিয়ে রেখে মিনারী করমর্দন করল ব্রাউনের সাথে।

'দক্ষিণের ওই চূড়া পেরিয়ে নিচে গেছিলাম আমরা,' জেনিকে বলল মোয়েটুয়া। 'পাখিরা ডিম পাড়তে শুরু করেছে। কাভেকা আর ওইও-র ডিম পেয়েছি আজ। অনেক। মিনারী চূড়ায় একটা দড়ি বেঁধে দিয়েছে শক্ত করে, ওটা বেয়ে আমরা নিচে নেমে গিয়েছিলাম। ফাসটোও গেছিল আমাদের সাথে।'

'শাবাশ দাও ওদের!' জেনিকে বলল ব্রাউন। 'পুরুষমানুষ ওখান দিয়ে নামছে কল্পনা করে আমি শিউরে উঠছি, সেখানে মেয়েমানুষ!'

মিনারী তার স্ত্রীর দিকে ফিরল। 'যাও, তোমরা দু'জন খেয়ে নাও, এই ফাঁকে আমি রেঁধে ফেলি আমাদেরটা।'

ব্রাউন একটা ঝুড়ি নিয়ে বনের দিকে গেল, দু'চারটা বুনো ইয়াম পাওয়া যায় যদি। আর মিনারী বসে বসে একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে অনেকগুলো পাথর সাজিয়ে দিল তার ওপর। পাথরগুলো উত্তপ্ত হওয়ার পর দুটো কাঠির সাহায্যে তুলে একটা একটা করে ছাড়তে লাগল পানি ভর্তি একটা ক্যালাবাশের ভেতর। কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি ফুটতে শুরু করল। এবার ক্যালাবাশে ডিম ছাড়তে লাগল মিনারী, যতক্ষণ না সেটা ভরে গেল ডিমে। ডিম সেদ্ধ হতে হতে ব্রাউন ফিরল ইয়াম নিয়ে। দ্রুত খোসা ছাড়িয়ে সেগুলো চাপিয়ে দেয়া হলো আগুনের ওপর। সেদ্ধ ডিম আর পোড়ানো ইয়াম দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া সারল দু'জন।

একটু পরেই চাঁদ উঠল। বিদায় নিল অতিথিরা। ওরা চলে যাওয়ার পর দরজার মুখে মাদুর বিছিয়ে বসল জেনি চাঁদনী রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে। নিজের পাশে মাদুরের ওপর হাত দিয়ে চাপড় মারল ও। ব্রাউন শুয়ে পড়ল ওর কোলে মাথা রেখে। ব্রাউনের চুলে নিঃশব্দে বিলি কেটে দিতে লাগল জেনি। কিছুক্ষণ এমনি কেটে গেল। তারপর নীরবতা ভাঙল ও।

'মোয়েটুয়ার সঙ্গে আলাপ হলো। ও বলছিল গণ্ডগোল বাধতে যাচ্ছে শিগগিরই। উইলিয়ামস তার কারণ। আজ সে ওদের সাথে ফাসটোকে পাঠিয়েছিল, জানো?'

'ডিমের দরকার পড়েছিল বোধহয়,' ঘুমজড়িত স্বরে বলল ব্রাউন।

'হয়তো, কিন্তু আমার মনে হয় আরও বেশি দরকার পড়েছিল হুটিয়াকে। ফাসটোকে লম্বা সময়ের জন্যে কোথাও পাঠাতে পারলেই ও জঙ্গলে গিয়ে হুটিয়ার সাথে দেখা করে। ওর স্বামী টারারু বোকা হলেও ভীষণ ঈর্ষাপরায়ণ, অনেকটা তোমাদের সাদামানুষদের মত। ঈর্ষাপরায়ণ! আবার ওদিকে মিলস-এর মেয়েটার প্রেমিক হওয়ার সাধ আছে!'

'মানে প্রুডেন্স? ওই বাচ্চা মেয়েটা!'

'বাচ্চা!' সবিস্ময়ে জেনি তাকাল তার পুরুষের মুখের দিকে। 'তুমিই হচ্ছ একটা বাচ্চা,' বলল সে। 'তোমার গাছ আর চারা ছাড়া আর কিছু বোঝো না তুমি।'

জন উইলিয়ামস একা তাদের বাড়ির ওপর কাজ করছে; মিলস আর মার্টিন বাউন্টি বে থেকে বয়ে আনছে কাঠ, তক্তা। দোতলা বাড়িটার কাঠামো তৈরি হয়ে গেছে। এখন উইলিয়ামস ছেঁটে ফেলছে বাড়তি কাঠগুলো। ওদের তিন মেয়েমানুষ মোটামুটি জোগাড় করে ফেলেছে চালের জন্যে প্রয়োজনীয় পাতা। তাই উইলিয়ামস ঠিক করেছে আগে চালটা ছেয়ে ফেলবে। তাতে আর কিছু না হোক মাথার ওপর একটা আচ্ছাদন হবে। দেয়াল এবং মেঝে পরে আস্তে আস্তে করলেই হবে।

এখন ভর দুপুর। সূর্যের তেজ বেশ। কোমর পর্যন্ত উন্মুক্ত উইলিয়ামস-এর। দরদর করে ঘাম ঝরছে বুক বেয়ে। চালের ওপর থেকে নেমে করাতটা রাখতে রাখতে সে ডাকল:

'ফাসটো!'

মূল বাড়িটা যেখানে তৈরি হচ্ছে তার এক পাশে নিচু একটা চালা ঘর। ওখানে ওদের রান্নাবান্না হয়। ছোটখাট কিন্তু পরিশ্রমী চেহারার এক মেয়ে বেরিয়ে এল চালাঘরটা থেকে। অন্যদের তুলনায় বয়স একটু বেশি মেয়েটার। নীচু ঘরে জন্ম। বোধহয় সে কারণেই একটু নম্র, একটু চুপচাপ সে। উইলিয়ামস-এর প্রতি পুরোপুরি নিবেদিত। ওর এই নিবেদিতপ্রাণতার প্রশংসা খোদ উইলিয়ামস-ও না করে পারে না।

'খাবার তৈরি?' জিজ্ঞেস করল উইলিয়ামস। 'এক বালতি পানি এনে দাও আমাকে।'

চালার ভেতর ঢুকে গেল আবার মেয়েটা। বালতি ভর্তি পানি এনে ঢেলে দিল উইলিয়ামস-এর মাথায়, কাঁধে, শরীরে। উইলিয়ামস-এর গা মাথা মোছা শেষ হওয়ার আগেই খাবার নিয়ে এল ফাসটো। পোড়ানো রুটিফল, ইয়াম আর গণ্ডাজন টার্ন-এর ডিম। মাটিতে বড় একটা সবুজ পাতা বিছিয়ে পরিবেশন করল খাতে বসল উইলিয়ামস। পাশে বসে ফাসটো যখন খাবার এগিয়ে দিচ্ছে, উইলিয়ামস ওকে হাত ধরে কাছে টানল।

'বসো, আমার সাথে খাও,' বলল সে।

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'যত্তসব ধর্মহীন কথাবার্তা।...আরও ডিম দেব? না?...রাতের জন্যে আরও ডিম আনব?'

'হ্যাঁ, লক্ষ্মী মেয়ে। প্রাণ দিয়ে খাটো, মন ভরে খাও, এটুকুই বোঝে জ্যাক

উইলিয়ামস।'

খাওয়া শেষ করে ওঠার সময় ফাসটোকে চুমু খেলো ও। সস্নেহ ভঙ্গিতে পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিল। হাসিমুখে ওর উচ্ছিষ্টগুলো নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল ফাসটো। উইলিয়ামস আবার কাজে লাগল।

মাঝ বিকেল নাগাদ ফাসটো ঝুড়ি হাতে রওনা হয়ে গেল দক্ষিণের পাহাড়ের দিকে। আরও আধঘণ্টা কাজ করল উইলিয়ামস। একটু পরেই মার্টিন আর মিলস শেষবারের মত কাঠ আনতে গেল খাঁড়িতে। ওরা চোখের আড়াল হওয়া মাত্র ঘরের ওপর থেকে নেমে এল উইলিয়ামস। নিজেই রান্নাঘর থেকে পানি এনে হাতমুখ ধুয়ে নিল। তারপর টাপা কাপড়ের একটা চাদরের মত গায়ে জড়িয়ে বাড়ির পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পথটার ওপর দাঁড়াল। সতর্ক চোখে চাইল এদিক ওদিক। ম্যাককয়-এর বাড়ির দিক থেকে হাতুড়ি পেটার শব্দ আসছে, কিন্তু কোন মানুষ দেখা যাচ্ছে না। রাস্তা পেরিয়ে ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল উইলিয়ামস।

বসতির সিকি মাইল মত দক্ষিণে বনের ভেতর এক বুড়ো প্যানডানাস গাছ দাঁড়িয়ে আছে কাঁটাওয়ালা পাতাগুলোকে রোদে মেলে দিয়ে। গাছটার কাণ্ড বায়ব মূলের এক পিরামিডের ওপর ভর করে টানা বিশ ফুট উঠে গেছে কোনরকম শাখা প্রশাখা ছাড়া। বায়ব মূলগুলোর একটা বেয়ে নেমে আসছে হুটিয়া। গাছটার তলা ভরে আছে পাতায়। হুটিয়া-ই ওগুলো সব খসিয়েছে গাছে উঠে। নিচে নেমে পাতাগুলো কুড়িয়ে এক জায়গায় করতে লাগল সে। একটু পরপরই কান খাড়া করে কিছু শোনার চেষ্টা করছে আর সতর্ক চোখে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। হঠাৎ হাতের কাজ ফেলে কাছের এক পুরাউ গাছের ঝোপের ভেতর ঢুকে গেল ও।

হালকা পায়ে বন পেরিয়ে এসে প্যানডানাস গাছটার কাছে দাঁড়াল উইলিয়ামস। ওপর দিকে তাকাল ঘাড় পেছনে হেলিয়ে, তারপর নিচে জড় করা পাতাগুলোর দিকে, তারপর অনিশ্চিত ভঙ্গিতে চারপাশে। মৃদু একটা হাসির শব্দ পৌঁছুল উইলিয়ামসের কানে। পর মুহূর্তে ওর বাহুর বাঁধনে ধরা পড়ল মেয়েটা।

'ফাসটো কই?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল হুটিয়া।

'সে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। সন্ধ্যার আগে ও ফিরবে না।'

উইলিয়ামস যখন ঝোপের ভেতর হুটিয়ার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শুয়ে আছে আর ওর সঙ্গীরা খাঁড়ি থেকে কাঠ আনতে গলদঘর্ম হচ্ছে ঠিক সেই সময় ওদের বাড়ির পাশে বসে আছে প্রুডেন্স। সামনে এক বোঝা প্যানডানাস পাতা। পাতা থেকে কাঁটা খসাচ্ছে সে। খুব বেশি হলে ষোলো হবে ওর বয়েস। ছোটখাট গড়ন, কিন্তু দারুণ দেহসৌষ্ঠব। শরীরের কোন অংশে মাংসের একটু কমতি বা বাড়তি নেই। ফিকে সোনালী ত্বক, মাথায় তাম্র-লাল চুল।

পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে পথের দিকে। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, টারারু আসছে। কিছুই দেখেনি এমন ভঙ্গিতে কাজ করতে লাগল প্রুডেন্স। টারারু কাছে এসে যখন কথা বলল চমকে ওঠার ভান করল সে।

'আর সবাই কই?' জিজ্ঞেস করল টারারু।

'আউয়ে! একেবারে চমকে দিয়েছ আমাকে!'

হাসতে হাসতে ওর পাশে বসল টারারু। 'আমাকে ভয়! দাঁড়াও, তোমার মজা বোঝাব আমি মিলস যখন কাছাকাছি থাকবে না।...আর মেয়েরা কোথায়?'

'পাতা আনতে গেছে।'

'ভালই কাজ করছ তোমরা। কত পাতা লাগছে তোমাদের?'

'দু'হাজার,' বলল প্রুডেন্স। 'এক হাজার আটশো সত্তরটা তৈরি হয়ে গেছে।

আর কিছু বলল না প্রুডেন্স। মুখ নিচু করে কাজ করতে করতে গান ধরল মৃদু কণ্ঠে। গানের কথাগুলো এরকম:

'একটা পাখি চূড়ায় উঠেছে,
তছনছ করছে অন্য পাখিদের নীড়,
সঙ্গিনীকে খাওয়ানোর জন্যে খুঁজছে ডিম,
কিন্তু সঙ্গিনী তার বাসা বাঁধছে না। না!
সে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে আছে অন্য এক পাখির সাথে।'

এই গান শেষে আরেকটা গান ধরল প্রুডেন্স। এক মেয়ে সুরে গেয়ে চলল। শ্রোতার কথা ভুলে গেছে যেন তবে পাখিদের কীর্তি নিয়ে আর গাইছে না ও। টারারু কিছুক্ষণ ওর মনোযোগ আকর্ষণের ব্যর্থ চেষ্টা করে উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দ্বীপের ভেতর দিকে। প্রুডেন্সের প্রথম গানটা আনমনা করে দিয়েছে ওকে। এ মুহূর্তে বেশিরভাগ বহুপ্রেমী পুরুষের মত নিজের স্ত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও।

পিঠে ভারী এক বোঝা নিয়ে বনপথ ধরে চলেছে হুটিয়া। ঝোপ ঝাড়ের পাশ কাটিয়ে নীরবে এগোচ্ছে বসতির দিকে। সতর্ক চোখ, কান খাড়া। স্বামীকে দেখার অন্তত দশ সেকেন্ড আগে ও টের পেল সে আসছে। অমনি ভাব ভঙ্গি বদলে গেল হুটিয়ার। মুখে, দেহে ফুটে উঠল পরিশ্রম আর ক্লান্তির ছাপ।

'বোঝা নামাও!' কাছে এসে কঠিন কণ্ঠে আদেশ করল টারারু।

ক্লান্তির এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাতার আঁটিটা নামিয়ে রাখল হুটিয়া। 'বাঁচলাম! তুমি এসে পড়েছ।'

মুখের কাঠিন্য একটুও শিথিল হলো না টারারুর। ভুরু কুঁচকে তাকাল হুটিয়ার চোখে চোখে। এমন শান্ত, নিরীহ ভঙ্গিতে চাউনিটা ফিরিয়ে দিল হুটিয়া যে মুহূর্তে সন্দেহ দূর হয়ে গেল টারারুর মন থেকে। অন্য মেয়ের সাথে ফষ্টিনষ্টি করতে সব সময় তৈরি থাকলেও স্ত্রীকে সে সত্যিই ভালবাসে। সে নিরপরাধ এই বিশ্বাসটা অদ্ভুত এক প্রশান্তি দেয় ওকে।

'কোন অসতী স্ত্রী,' ও ভাবল, 'এমন সহজভাবে স্বামীর মুখোমুখি হতে পারে না।'

অবশেষে হাসি ফুটল টারারুর মুখে। পাতার আঁটিটা তুলে নিল নিজের পিঠে। সস্ত্রীক রওনা হলো বসতির দিকে।

*

মার্চ-এর প্রথম দিকে এক বিকেলে স্নানের জলাশয়টায় গেছে হুটিয়া। মেজাজ খারাপ ওর। টারারুর সাথে কিছুক্ষণ আগে এক দফা ঝগড়া হয়ে গেছে। শুধু তা-ই না, টারারুও দু'জন মাওরির সামনে পিটুনি লাগিয়েছে ওকে।

অন্য মেয়েরা যতক্ষণ না গোসল শেষ করে বসতির দিকে চলে গেল ততক্ষণ হুটিয়া বসে রইল একটা পাথরের ওপর। তারপর উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে।

সব মেয়ে চলে গেলেও প্রুডেন্স এখনও যায়নি। হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে ও একটা ছোট ক্যালাবাশ ভরছে। হুটিয়ার দিকে পেছন। এলো চুলে ঢাকা পড়ে গেছে কোমর পর্যন্ত।

'তাড়াতাড়ি করো!' রুক্ষ কণ্ঠে তাড়া লাগাল হুটিয়া 'আমি একা একা গোসল করব।'

ঘাড় ফিরিয়ে নিরুত্তাপ চোখে ওর দিকে তাকাল প্রুডেন্স। 'কে তুমি? এই দ্বীপের রানী? আমি তোমার চাকর নাকি? জানো না আমার স্বামী সাদা মানুষদের একজন?'

'স্বামী!' রাগে চিড়বিড়িয়ে উঠল হুটিয়া। 'তা কয়টা স্বামী দরকার তোর? সাবধান! আমারটার দিকে তোর চোখ পড়েছে আমি খেয়াল করেছি!'

'রাখিস তোর স্বামীকে!' মুখ বেঁকিয়ে বলল প্রুডেন্স। 'কেমন পারিস দেখব!'

একেবারে আঁতে গিয়ে লাগল কথাটা হুটিয়ার 'লাল কুত্তী!' চেঁচাল ও।

'মাদী শুয়োর!'

লাফ দিয়ে পানিতে নামল হুটিয়া। ঝপ ঝপ করে গিয়ে মুঠো করে ধরল প্রুডেন্সের লাল চুল। সামান্য ধস্তাধস্তির পর সে ওকে বসিয়ে ফেলল পানিতে। তারপর এক হাতে চুল অন্য হাতে কাঁধ ধরে চুবাতে লাগল প্রুডেন্সকে। প্রুডেন্স মরিয়া হয়ে ছোটার চেষ্টা করতে লাগল হুটিয়ার হাত থেকে। কিন্তু পারল না। চুলের গোছা ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে মনের সাধ মিটিয়ে ওকে চুবাল হুটিয়া। অবশেষে প্রুডেন্সের যখন আধমরা অবস্থা, সন্তুষ্ট হয়ে ওকে ছেড়ে দিল সে। গভীর পানিতে গিয়ে গোসল করতে শুরু করল নিজে।

প্রুডেন্স টলতে টলতে উঠে এল হ্রদ থেকে। কম্পিত হাতে কাপড় পরল। ক্যালাবাশটা কোনমতে তুলে নিয়ে হারিয়ে গেল বনের ভেতর। বসতির একটু আগে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করে নিল, মনটাকেও একটু বশে আনল। তারপর সোজা গেল নিজেদের রান্নাঘরে। যা ভেবেছিল তা-ই, ফাসটো রান্নাঘরে আছে। তিনপেয়ে একটা টুলে বসে নারকেল কোরাচ্ছে মুরগিদের জন্যে। ওর সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকাল ফাসটো।

'একটা কথা বলা দরকার মনে করছি তোমাকে,' প্রুডেন্স বলল। 'তুমি সব সময় খুব ভাল ব্যবহার করো আমার সঙ্গে। আমি ছোট, তুমি আমার মায়ের মত, তাই লোকজন কানাকানি শুরু করার আগেই তোমাকে জানানো উচিত মনে করছি।'

'হয়েছে কী, ভণিতা না করে বলো তো?' বলল ফাসটো।

সরল সোজা, পরিশ্রমী এই মহিলার মনটা বড় নরম। সত্যিই ও মেয়ের মত দেখে প্রুডেন্সকে। ওর হাত ধরল সে

'কী হয়েছে রে, মেয়ে?' আবার জিজ্ঞেস করল সে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল প্রুডেন্স। তারপর শুরু করল:

'কথাটা এমন বিশ্রী, বলতে সংকোচ হচ্ছে; তোমার ভাল চাই বলে না বলেও পারছি না। তুমি চোখ খোলা রাখছ না কেন? উইলিয়ামস ভাল মানুষ সন্দেহ নেই, তোমাকে ভালবাসে; তবু প্রত্যেক পুরুষই মেয়েমানুষের সামনে দুর্বল, মেয়েমানুষটা সুন্দরী হলে তো কথাই নেই। হুটিয়া অনেক দিন ধরে ওকে চাইছিল। এত দিনে ওর মনোস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। তুমি আর টারারু যখন অন্ধ হয়ে বসে আছ তখন ওরা দু'জন রোজ গোপনে দেখা করছে ঝোপের ভেতর। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে যাও নিজের চোখে দেখে এসোগে। উইলিয়ামস যখন গোসল করতে যায়, বনের ভেতর বড় প্যানডানাস গাছটার আশপাশে লুকিয়ে থেকো, দেখতে পাবে কেমন গোসল ও করে।'

ফাসটো নিঃশব্দে বসে রইল কিছুক্ষণ। দুচোখ জলে ভরে উঠেছে। পরপর কয়েকবার মেয়েটার হাতে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল সে।

'আমি—আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, একদম বিশ্বাস করতে পারছি না। তবু তুমি যা বললে সেই মত করব আমি। ওই মেয়েমানুষের সাথে আমার স্বামীকে যদি···। ওহ্, আজ রাতে আর ঘুম হবে না আমার।'

পরদিন সন্ধ্যায় যখন চাঁদ উঠল ম্যাককয়-এর বাড়ির পথে রওনা হলো উইলিয়ামস। পৌঁছে দেখল সবাই শুয়ে পড়েছে, মেরি কেবল মোম-বাদামের একটা সলতে জ্বেলে প্যানডানাস পাতা দিয়ে মাদুর বুনছে। বছর পঁচিশেক বয়েস মেয়েটার। সবচেয়ে বেশি যাদের তাহিতির জন্যে প্রাণ পুড়ছে তাদের একজন। আস্তে ওর নাম ধরে ডাকল উইলিয়ামস।

'মেরি! এই, মেরি! উইল ঘুমিয়ে পড়েছে?'

টাপাকাপড়ের বিছানা থেকে উঠে এল ম্যাককয়। 'কে? জ্যাক? এই একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। সারাদিন আজ ভয়ানক খাটুনি গেছে।'

'বাইরে এসো।···ফাস্‌টোকে দেখেছ?'

'না। কী হয়েছে?'

'দুপুরের পর আমি যখন গোসল করতে যাই তখন ও ডিম আনতে বেরিয়েছিল, তারপর আর ফেরেনি। আমার তো দুশ্চিন্তা হচ্ছে, উইল।'

'আমি দেখিনি,' জবাব দিল ম্যাককয়। 'দাঁড়াও, মেরিকে জিজ্ঞেস করে দেখি।'

ঘরের ভেতর চলে গেল ও। মেরির সঙ্গে ফিস ফিস করে আলাপ করল কিছুক্ষণ। একটু পরেই ফিরে এল ম্যাককয়। 'হ্যাঁ, মেরি দেখেছে ওকে। বিকেলে এই পথে যাচ্ছিল। মেরি ডেকেছিল, ফাসটো ঘাড়ও ফেরায়নি। ডিম আনার ঝুড়ি ছিল ওর হাতে। সন্দেহ নেই দড়ির দিকে যাচ্ছিল।'

হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কামার। তারপর বলল, 'ধন্যবাদ, উইল। বাড়ি যাই। সকালের মধ্যে ও না ফিরলে খুঁজতে বেরোব।'

সারারাত ঘুমাতে পারল না উইলিয়ামস। ফাসটোর পাট করা বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করল। ভোরে উঠে রওনা হলো মার্টিন আর ইন্ডিয়ানদের একজনকে

নিয়ে। ছোট ক্যানোটা জলে নামিয়ে এগোল ঢেউয়ের ওপর দিয়ে। দ্বীপের একেবারে পুব প্রান্তের অন্তরীপ ঘুরে বেয়ে চলল দক্ষিণ পাশ ধরে। অবশেষে পৌঁছাল দড়ির গোড়ার ছোট অর্ধচন্দ্রাকৃতির উপসাগরটায়। একটু বড় এক ঢেউয়ের মাথায় উঠে উঁচু হলো ক্যানো। অমনি ইন্ডিয়ানটা বিস্ময়সূচক একটা শব্দ করল তীরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে। পাহাড়টার পাদদেশে ছোট্ট এক প্যানডানাস গাছের পাশে দলামোচা পাকিয়ে পড়ে আছে কিছু একটা।

'ডাঙায় চলো।' কর্কশ কণ্ঠে নির্দেশ দিল কামার।

প্যানডানাস গাছটার সামনে বিরাট দুটো পাথরের চাঙড়ের মাঝখানে ক্যানো ভিড়াল ওরা। লাফ দিয়ে নামল উইলিয়ামস। নেমেই ছুটে গেল প্যানডানাস গাছটার দিকে। বাকি দু'জন ক্যানো যাতে ভেসে না যায় তার ব্যবস্থা করল আগে তারপর নামল।

ওদের মাথার ওপরে চক্কর কাটছে অসংখ্য সামুদ্রিক পাখি। বেশ খানিকটা ওপরে পাহাড়ের গায়ে খাঁজে কন্দরে বসে আছে আরও পাখি। একটু পরপরই তাদের অনেকে উড়ে যাচ্ছে আবার এসে বসছে। উইলিয়ামস ফিরে এল ক্যানোয় টাপা কাপড়ের একটা চাদর নিয়ে আবার গেল প্যানডানাস গাছটার কাছে। চাদরটা ধীরে ধীরে বিছিয়ে দিল ফাসটোর রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহের ওপর। হাঁটু গেড়ে বসল ওর পাশে। পেছনে মার্টিনের পায়ের আওয়াজ পেয়ে হাত নেড়ে এগোতে বারণ করল ওকে।

ক্যানোর কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল মার্টিন আর ইন্ডিয়ানটা। অনেক অনেকক্ষণ পর উঠল উইলিয়ামস। ফাসটোকে চাদরে মুড়ে দু'হাতে তুলে এগিয়ে এল ক্যানোর কাছে। আস্তে খোলের ভেতর নামিয়ে রাখল দেহটা। তিনজন উঠে বসল ক্যানোয়। নিঃশব্দে বেয়ে চলল বাউন্টি বে-র দিকে।

ছয়

বাউন্টি পুড়িয়ে ফেলার কয়েক দিন পরেই মিনারী একটা জায়গা পছন্দ করেছিল যেখানে ও ওর পলিনেশীয় সঙ্গীদের সহায়তায় একটা মন্দির গড়ে তুলছে। গৃহহীন বা ভবঘুরে যারা তারা সকল পবিত্রতার আধার সাগরের তীরে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করতে পারে, কিন্তু গৃহী মানুষদের মন্দির খাড়া করতেই হবে। ছ'জন স্থানীয় পুরুষ একই দেবতা, টা' আরোয়ার উপাসক। তাদের মারাও তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবে।

বেশ কিছুদিন ধরে কখনও একা, কখনও তেতাহিতিকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছে মিনারী এমন একটা জায়গার খোঁজে যার ওপর সাদা মানুষের চোখ সহজে পড়বে না। অবশেষে মনমত জায়গাটা ও পেয়ে যায় পশ্চিমের দুই চূড়ার সংযোগকারী পাহাড়ের এক বনছাওয়া ঢালে। সেদিন ও একা ছিল, এবং সেই সময় থেকে একাই ও শুরু করে জায়গাটা পরিষ্কার করার কাজ। মাত্র কয়েকবার কুঠার চালানোর পরই

বুঝতে পারে অন্য উপাসনাকারীরা অতীতে কোন এক সময় জড় হয়েছিল ওখানে। ঘন ঝোপঝাড় কিছুটা কেটে সাফ করার পর ও আবিষ্কার করে শ্যাওলা পড়া পাথরের এক চাতাল। খাড়া কতকগুলো পাথর বসানো তার ওপর। এই পাথরগুলোর সামনেই হাঁটু গেড়ে বসত প্রার্থনাকারীরা। কাছেই উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দুটো বিমূর্ত মানব মূর্তি, মানুষের চেয়ে লম্বা। একটা মূর্তির সামনে পাথরের চাতাল। চাতালটা তোলার চেষ্টা করল মিনারী। গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করার পর সাফল্যের মুখ দেখল ও। চাতালটার নিচে সরু এক মানুষ সমান লম্বা একটা গর্ত। তাতে শুয়ে আছে পাঁজরের ওপর দু'হাত ভাঁজ করা এক কঙ্কাল। খুলিটার নিচে বালিশের মত করে রাখা বিরাট এক মুক্তো-ঝিনুকের খোল।

'আহি!' রুদ্ধশ্বাসে উচ্চারণ করল তাহিতীয় গোত্রপতি। 'আমার নিজের জাতের মানুষ! মুক্তো-ঝিনুক জন্যায় যে দেশে সেখান থেকে এসেছিল!'

স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। তারপর সাবধানে আগের জায়গায় নামিয়ে রাখল চাতালটা এবং নেমে পড়ল মারাএ থেকে। পলিনেশীয়দের জীবনধারার প্রতিটি পর্যায়ে ধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একমাত্র যুদ্ধের সময় ছাড়া মৃতদেহ এবং সব ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তারা। মৃতের অস্থিকে শান্তিতে থাকতে দিতে হবে, তাছাড়া পুরনো মন্দিরের কোন পাথর নতুনটা গড়ার সময় ব্যবহার করা যাবে না।

সামান্য দূরে আরেকটা জায়গা পছন্দ করল মিনারী। প্রতিদিকে ছ'ফ্যাদম করে লম্বা একটা বর্গক্ষেত্র মেপে নিয়ে আবার শুরু করল কাজ। ধীরে ধীরে, কোন তাড়াহুড়ো নেই। সংসার অর্থাৎ উপনিবেশের কাজ শেষে যেদিন এক বা দু'ঘণ্টা অবসর পায় সেদিনই স্বজাতীয় সঙ্গীদের নিয়ে চলে আসে ও। সব সঙ্গীকে না পাওয়া গেলে যাকে যাকে পাওয়া যায় তাদেরকে নিয়ে আসে। সাজিয়ে চলে পাথরের পর পাথর। পাথরের কোন অভাব নেই। নিচে এক গিরিখাতে আছে অজস্র। সেখান থেকে নিয়ে এলেই হলো। একটু একটু করে রূপ পেতে লাগল টা' আরোয়া-র মন্দির–পাথরের একটা বেদী, তার ওপর খাড়া পাথর সারি দিয়ে সাজানো, মাঝখানে গজ তিনেক উঁচু একটি পিরামিড, সেটাকে পবিত্র করা হলো তাহিতির পূর্বপুরুষীয় মন্দির থেকে আনা পাথর দুটো দিয়ে। সবশেষে পুরো মন্দিরটার চারদিকে তুলে দেয়া হলো পাথরের প্রাচীর। প্রাচীরের গোড়ায় লাগানো হলো বাছাই করা কিছু লতাগুল্মের গাছ।

এপ্রিলের প্রথম দিকের এক ভোর। মিনারী সাথীদের নিয়ে মন্দিরের বেদী আর প্রাঙ্গণ ঝাড় দিচ্ছে। আজ উদ্বোধন হবে মন্দিরের, দেবতাকে জাগানো হবে নিদ্রা থেকে। প্রত্যেকের কাঁধ তথা উর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত দেবতার সম্মানে। ঝাড় দেয়া শেষ করে বেদীর সামনে দাঁড়াল সবাই মাথা নিচু করে নীরবে। মিনারী প্রাঙ্গণের এক পাশে সরে ছোট্ট একটা কুটিরে গিয়ে ঢুকল পুরোহিতের পবিত্র পোশাক পরার জন্যে। গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলে পড়া কালো রঙ করা টাপার আলখাল্লা পরে ও যখন বেদীর সামনে ফিরে এল তখন সূর্য উঠছে পুব দিগন্তে। পাহাড়ের জন্যে দেখা না পেলেও তার আভায় লাল হয়ে উঠেছে পুবের আকাশ। অদৃশ্য সূর্যের দিকে ফিরে দু'হাত উঁচু করে সুর করে আবৃত্তি করতে লাগল মিনারী:

'মেঘ ছেয়েছে আকাশকে;
জেগেছে মেঘের দল!
সকালে যে মেঘ ওঠে সে উঠে আসছে,
সাগরের মহাপ্রভু যাকে পূর্ণতা দিয়েছে
সে বাতাসে ভেসে উঠে আসছে,
উঠে আসছে সূর্যের জন্যে অনিন্দ্য এক খিলান গড়তে।
মেঘ উঠেছে, ভাঙছে, ছুটছে আবার জুড়ছে
সূর্যের জন্যে এক সোনালি খিলান গড়তে।'

মাথা নিচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল মিনারী যতক্ষণ না সূর্যের সোনালি রশ্মি ওদের ওপরে পাহাড়ের চূড়া স্পর্শ করল। অবশেষে তেতাহিতির দিকে তাকিয়ে একটা ইশারা করল সে। পিরামিডটার পেছনে চলে গেল তেতাহিতি। ফিরল ছোট্ট একটা কারুকাজ করা বাক্স নিয়ে। অদ্ভুত দেখতে বাক্সটা। দু'পাশে দুটো হাতল লাগানো পালকির মত ওদের বিশ্বাস ঈশ্বরের আবাসস্থল ওই বাক্স। বাক্সটার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর উদাত্ত স্বরে উচ্চারণ করতে লাগল মিনারী:

'আমাদের নিবেদন শোনো, ও টা' আরোয়া!
আমাদের আবেদন মঞ্জুর করো।
প্রতিপালন করো এদেশের মানুষকে।
রক্ষা করো আমাদের, এবং আমাদের বাঁচতে দাও
তোমাকে নির্ভর করে।
রক্ষা করো আমাদের! আমরা মানুষ। তুমি
আমাদের প্রভু!'

থামল পুরোহিত মিনারী। এক মুহূর্তের গভীর গম্ভীর নৈঃশব্দ। তারপর: 'ও টা' আরোয়া, আমাদের প্রয়োজনে তোমাকে জাগিয়েছিলাম। এখন ঘুমাও আবার।' প্রার্থনা শেষ করল সে। পূজা অনুষ্ঠানও শেষ। পিরামিডের পেছনে গিয়ে কারুকাজ করা বাক্সটা যথাস্থানে রেখে এল তেতাহিতি। মিনারী আবার ঢুকল পাশের কুটিরে পুরোহিতের পোশাক খুলে রাখার জন্যে। এই সময় ঝোপের ওপাশ থেকে শোনা গেল মানুষের গলা। মিলস আর ম্যাককয় পৌঁছাল মন্দিরের সামনে। ইন্ডিয়ানদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। দেয়াল ঘেরা প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে এল। প্রশংসার চোখে তাকিয়ে আছে ম্যাককয়।

'দারুণ!' ও মন্তব্য করল। 'তোমরা মোটে ছ'জনে বানিয়েছ এটা, তেতাহিতি?'

মাথা ঝাঁকাল তেতাহিতি। 'এটা আমাদের মারাএ,' বলল সে। 'এখানে আমাদের দেবতার পূজা করব আমরা।'

'কী বলছে ও?' তাচ্ছিল্যের সাথে জিজ্ঞেস করল মিলস। এবং জবাবের অপেক্ষা না করেই ঢুকে পড়ল দরজা পেরিয়ে। বেদীর সামনে গিয়ে পিরামিডটা দেখল কিছুক্ষণ তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গেল বেদীর ওপর। ওর কাঁধে হাত রাখল মিনারী। ইতিমধ্যে ও ফিরে এসেছে কুটির থেকে।

'তোমার কাঁধ!' বলল ও। 'এটার ওপর ওঠার আগে কাঁধের কাপড় সরাও।'

মিলস সাকুল্যে এক ডজন স্থানীয় শব্দ জানে কিনা সন্দেহ। মিনারীর বক্তব্য ও

বুঝতে পারল না। বোঝার চেষ্টাও করল না। ঝটকা মেরে মিনারীর হাতটা সরিয়ে দিয়ে ও আবার উঠতে গেল। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল ম্যাককয়:

'পাগল হয়েছ, জন? কাঁধের কাপড় সরাও! ও বলছে এটা ওদের কার্ক (গির্জা বা চার্চ-এর স্কচ প্রতিশব্দ)! কার্কে মাথা ঢেকে ঢুকতে পারবে তুমি?'

রুক্ষভাবে একটু হাসল মিলস। 'কার্ক বলছ এটাকে! বিধর্মী নচ্ছারদের সামান্য একটা মন্দির আর তুমি বলছ কার্ক! দেখব আমি এবং জামা না নামিয়েই!'

উঠতে শুরু করল মিলস। তিনটে ধাপ সবে উঠেছে কি ওঠেনি, অমনি বাঘের মত লাফ দিল মিনারী। ঘাড়ে ধরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে দিল মিলসকে। হাত পা ছড়িয়ে ধপাস করে পড়ল মিলস বেদীর সিঁড়ির নিচে।

'গাধা!' বলল ম্যাককয়। 'এখন হলো তো!'

দ্বিতীয় আরেক লাফে ভূপাতিত মিলস-এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মিনারী। চোখ দুটো ওর জ্বলছে ক্রোধে। অন্য ইন্ডিয়ানগুলোর চোখে মুখে আতঙ্ক। একটা গণ্ডগোল লাগতে যাচ্ছে ভেবে নয়, মন্দিরের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করার পরিণাম ভেবে। ভাগ্য ভাল মিলস-এর, ম্যাককয় বেশ ভাল বলতে পারে স্থানীয় ভাষা। পরিস্থিতি শান্ত করল সে মিনারীর সাথে কথা বলে।

'শান্ত হও, মিনারী,' বলল সে। 'তোমার দিক থেকে তুমি ঠিকই করেছ, কিন্তু মিলস আসলে খারাপ কিছু করতে চায়নি। ও ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারেনি, ব্যস আর কিছু না।'

'ওকে নিয়ে যাও এখান থেকে!' গর্জন করল মিনারী। 'আর বলে দিও আর কোন সময় যেন না আসে এখানে। এটা আমাদের পবিত্র স্থান।'

কষ্টে সৃষ্টে উঠে দাঁড়াল মিলস। রাগে জ্বলছে ওর চোখ দুটো, মুঠো পাকিয়ে আছে দু'হাত।

'চলো, জন!' ওর হাত ধরে বলল ম্যাককয়, 'একটা কথাও বলবে না। রক্তারক্তি না চাও তো চলো চলে যাই। ওদের দিক থেকে ওরা ঠিকই আছে। তাছাড়া ওর সঙ্গে লেগে পারবে?'

মিলস আর মিনারী সমবয়সী হলেও মিনারীর শরীর মিলস-এর চেয়ে অনেক বড় এবং পেটা লোহার মত। ম্যাককয়-এর পরামর্শ মেনে নেয়াই সঙ্গত মনে করল মিলস। বসতির দিকে রওনা হয়ে গেল দু'জন।

'তোমরাও চলে যাও,' তেতাহিতি ছাড়া বাকি ইন্ডিয়ান ক'জনের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিল মিনারী। 'এনিয়ে ভেবে মন খারাপ কোরো না। ম্যাককয়-এর কথা তো শুনলে ও ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারেনি।'

চলে গেল লোকগুলো। মিনারী আর তেতাহিতি কেবল রইল মন্দির প্রাঙ্গণে। দুজনই চুপ। কিছুক্ষণ পর মিনারী জিজ্ঞেস করল:

'তুমি, তেতাহিতি, আমার চেয়ে ভাল জানো এই সাদা মানুষগুলোকে; ওদের কোন দেবতা নেই?'

'এসব ব্যাপারে আমাকে কোন দিন কিছু বলেনি ক্রিশ্চিয়ান, আমিও জিজ্ঞেস করিনি। তবে আমার মনে হয় ওরা কারও পূজা করে না।'

'কী করে তা হয়? ক্যাপ্টেন কুক তিনবার মাতাভাই-এ এসেছে, তিনবারই দেখেছি প্রতি সপ্তার সপ্তম দিনে ওরা আমাদের মতই উপাসনা করে–মাথা নুইয়ে হাঁটু গেড়ে বসে নীরবে শোনে এক জনের প্রার্থনা। আমাদের সাদা মানুষগুলো তো ওদেরই জাতের, কিন্তু এদের কখনও ও রকম করতে দেখি না।'

'তার মানেই তা-ই, এদের কোন দেবতা নেই,' জবাব দিল তেতাহিতি।

গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল মিনারী। 'দেবতাহীন মানুষদের কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করা যায় না। এখানে শুধু যদি আমরা আমাদের মেয়েমানুষদের নিয়ে থাকতাম ভাল হত। আমাদের আচরণ এই সাদা মানুষগুলোর কাছে যেমন অদ্ভুত মনে হয় ওদের আচরণও আমাদের তেমনই মনে হয়।'

'তা হলেও ওদের ভেতরও ভাল লোক আছে,' বলল তেতাহিতি।

'তা আছে তবে বেশি না। অনেকে তো মাওরি দাসের চেয়েও খারাপ।'

'মার্টিনের কথা বলছ? টিহে! নিশ্চয়ই দাসের ঘরে জন্ম ওর!'

'শুধু মার্টিন না,' মিনারী বলল, 'আরও আছে।...তোমার তে মোয়া আমার হু-এর মত, নিরীহরা আমাদের ওপরই নির্ভর করে আছে, ভাবছে আমরা ওদের রক্ষা করব, কিন্তু এর মধ্যেই কুইনটাল, উইলিয়ামস, মিলস ওদের সাথে এমন ব্যবহার শুরু করেছে যা কোন মাওরি তার দাসের সাথেও করে না। আমরা এখানে কোন খারাপ মানুষ চাই না। তবু সবার মঙ্গলের জন্যে যতটা সম্ভব ধৈর্য ধরব, কিন্তু এমন দিন আসতে পারে...' থেমে গেল মিনারী।

'ক্রিশ্চিয়ান এসবের কিছুই জানে না,' তেতাহিতি বলল। 'আমি ওর চোখ খুলে দেব?'

'ওকে জানালে ভালই হত, কিন্তু ব্যাপারগুলো এমন, ওর নিজে থেকেই জানা দরকার।...না, আমরা অপেক্ষা করব, তুমি কিছু বোলো না।'

ফাসটোর শেষকৃত্যের পর এক মাসেরও বেশি পেরিয়ে গেছে। এর ভেতর উইলিয়ামস একবারের জন্যেও চোখ তুলে তাকায়নি হুটিয়ার দিকে।

মেয়েটা ওকে পছন্দ করে, তবে তার মত করে। চুপচাপ সুসময়ের জন্যে অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ এটা সে জানে।

উইলিয়ামস তীব্র মর্মযাতনায় ভুগল প্রায় পক্ষকাল। ওরই প্রতারণার কারণে ফাসটো আত্মহত্যা করেছে, কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারল না কথাটা। রুক্ষ স্বভাবের মানুষ হলেও নির্দয় নয় সে। এই পক্ষকাল এক মনে নিজের কাজ করে গেল সে। হুটিয়া পাশ দিয়ে গেলেও লক্ষ করল না। কিন্তু তার পর থেকেই আস্তে আস্তে নিঃসঙ্গতার বোধ পেয়ে বসল ওকে। আগে ফাসটো ছিল এখন সে-ও নেই। এমন শূন্য জীবন নিরর্থক মনে হতে লাগল ওর কাছে। এবং কিছুদিন যেতে না যেতে আবার শুরু করল ঝোপের ভেতর হুটিয়ার সাথে গোপন দেখা সাক্ষাৎ।

কিন্তু তৃপ্ত হতে পারল না উইলিয়ামস। ফাসটো না থাকায় এখন আরও বেশি করে ওর হুটিয়াকে সম্পূর্ণ নিজের করে পেতে ইচ্ছে হচ্ছে। অবশেষে একদিন উইলিয়ামস-এর মনে হলো, হুটিয়াকে ছাড়া তার কিছুতেই চলবে না। মিলসকে নিয়ে ও কামারশালায় কাজ করছিল, হাতুড়িটা নামিয়ে রেখে ডাকল:

'জন! একটু শোনো তো।'

'কী হয়েছে?' পিঠ সোজা করে নিরুৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মিলস।

'এভাবে আর চলতে পারছি না আমি। সবারই মেয়েমানুষ আছে, আমার নেই।'

'আমারটা পাবে না,' গরগরিয়ে উঠল মিলস। 'ইন্ডিয়ানদের কারওটা নিয়ে নাও।'

'তা-ই ভাবছি। হুটিয়া হলে কেমন হয়?'

শুকনো একটু হাসল মিলস। 'তুমিই ভাল জানো। তবে সন্দেহ নেই হুটিয়া সুন্দরী, আর প্রুডেন্স বলে অনেক কলাকৌশল জানে।'

'ভাবছি ক্রিশ্চিয়ান কী বলবে; আর মিনারী···।'

'চুলোয় যাক মিনারী! সবাইকে ডেকে হাত তুলতে বলো। তোমার অধিকার আছে। জ্যাক উইলিয়ামস আর তার হাপর ছাড়া আমরা কোথায় থাকব?'

বসতির একেবারে পশ্চিম প্রান্তে ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ি। দোতলা। উপরের তলার পুরোটা জুড়ে একটা মাত্র কামরা। তার চারদিকে খোলা-বন্ধ করা যায় এমন জানালা, যাতে আলো হাওয়ার কমতি না হয় ঘরটায়। ঘরের ভেতরের একটা মই বেয়ে উঠতে হয় সেখানে। ক্রিশ্চিয়ান আর মাইমিতির শোয়ার ঘর ওটা।

নিচ তলাটা দুই কামরায় বিভক্ত। একটা ক্রিশ্চিয়ানের কাজের ঘর। তার একপাশে একটা ওকের টেবিল, একটা কোন মতে বানানো চেয়ার তার সামনে। টেবিলের ওপর রাখা একটা বাইবেল, একটা সাধারণ প্রার্থনা-পুস্তক, বাউন্টির বড় কম্পাসটা আর লন্ডনের কোডাল-এর তৈরি একটা সময় রক্ষক। শেষের এই যন্ত্রটায় প্রতিদিন নিয়ম করে চাবি দেয় ক্রিশ্চিয়ান এবং মাঝে মাঝে ইয়ং-এর সহায়তায় চাঁদের গতি অবস্থান দেখে পরীক্ষা করে, ঠিক মত চলছে কিনা।

সেদিন দুপুরের খাওয়া সেরে ও মাইমিতির সঙ্গে বসেছে দরজার পাশে রাখা বেঞ্চটায়। আলাপ করছে ওদের উপনিবেশের বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে। হঠাৎ পথের দিকে তাকাতেই ক্রিশ্চিয়ান দেখল, উইলিয়ামস আসছে।

অভিবাদন এবং সাধারণ কুশল বিনিময় পর্ব শেষে কামার বলল:

'আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই, স্যার।'

'হ্যাঁ, বলো কী বলবে।···আমার সাথে একা আলাপ করতে চাও?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

মাইমিতি উঠে চলে গেল। তারপরও কিছুক্ষণ ইতস্তত করল উইলিয়ামস। অবশেষে বলল:

'স্যার, মানুষ সবাই সমান নয়–একেক জনকে একেকভাবে গড়া হয়েছে, কেউ গরম কেউ ঠাণ্ডা, কেউ বুদ্ধিমান, কেউ বোকা। নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন আমি অলস অপদার্থ নই, আমার কাজ আমি জানি; কিন্তু আমার একটা দুর্বলতা আছে–মেয়েমানুষের জন্যে। এই দুর্বলতার কারণে···স্যার, ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি আমার মেয়ে মানুষটাকে হারিয়েছি, এখন আরেকটা আমার চাই।'

শেষের কথাটুকু এক নিশ্বাসে বলে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাতের মুঠো বন্ধ করতে

খুলতে লাগল উইলিয়ামস। এক মুহূর্ত ভাবল ক্রিশ্চিয়ান। তারপর জবাব দিল, অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে:

'ফাসটো মারা যাওয়ার পর থেকেই এ আশঙ্কা আমি করছিলাম। তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। তোমার দাবি বা আকাঙ্ক্ষা যা-ই বলো, অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কোন পুরুষই তার মেয়েমানুষ তোমার হাতে তুলে দিতে চাইবে না। আমি যে পরামর্শ দেব সেটা ইংল্যান্ডে বা সভ্য সমাজে অত্যন্ত ঘৃণ্য হলেও ব্যবস্থাটা প্রাচীনকালে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত এবং সম্মানিত ছিল। তোমার এমন কোন বন্ধু নেই যে তার মেয়েমানুষ তোমার সাথে ভাগ করে নিতে পারে?'

মাথা নাড়ল ইউলিয়ামস। 'তাতে আমার চলবে না, স্যার। আমি ওই ধাতের নই। একান্ত নিজের করে একজন দরকার আমার।'

'কাকে চাও?'

'হুটিয়াকে।'

'টারারুর বউ? তাহলে টারারুর কী হবে?'

'ও তো সাধারণ এক ইন্ডিয়ান, মেয়েমানুষ ছাড়াই থাকবে ও।'

'টারারু আমাদের মতই মানুষ। তোমার নিজের অবস্থা দিয়ে ওর অবস্থা বিচার করো।'

'জানি, স্যার,' একগুঁয়ে স্বরে বলল উইলিয়ামস, 'তবু ওকে আমার পেতেই হবে!' দু'হাত মুঠো পাকিয়ে হঠাৎ মুখ তুলল সে। 'জাহান্নামে যাক ছুঁড়ি! নিশ্চয়ই আমাকে ও ঘৃণা করেছে!'

'এ হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ,' ক্রিশ্চিয়ান বলল, যেন নিজেকে শোনানোর জন্যেই। মুখ তুলল সে। 'দেখ, উইলিয়ামস, তোমার এই অন্য একজনের স্ত্রী ছিনিয়ে নেয়াটা আমাদের সবার জন্যে একটা মারাত্মক বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। আমার পরামর্শ হচ্ছে, অমন কিছু কোরো না।'

'আপনি যা বললেন তা আমি নিজেও জানি, স্যার; কিন্তু পরামর্শ শোনার অবস্থা আমার পার হয়ে গেছে।'

'মানে আমাদের সবার বিপদ হতে পারে জেনেও তুমি আরেক জনের স্ত্রী ছিনিয়ে নেবে? শোনো, উইলিয়ামস! এতটা অমানুষ তোমাকে আমি মনে করি না!'

'আর কোন উপায় আমার নেই, স্যার; তবে আপনারা সবাই মত না দিলে আমি একাজ না করার চেষ্টা করব। ভোটাভুটি করুন, বেশির ভাগ যদি বলে আমি ওকে পাব না, আমি মেনে নেব।'

'এরকম একটা ব্যাপার ভোটে দেয়ার আব্দার করছ, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' কড়া গলায় বলল বটে ক্রিশ্চিয়ান কিন্তু তারপর ভাবল একটু 'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল সে, 'ব্যাপারটার সঙ্গে যখন আমাদের সবার ভাল মন্দ জড়িত, তোমার কথাই থাকবে। আজ রাতে খাওয়ার পর সবাইকে নিয়ে আসবে এখানে।'

শান্ত বিকেলের পর নিস্তব্ধ সন্ধ্যা এল। বিদ্রোহীরা একে একে জড় হতে লাগল ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ির সামনে। সবার শেষে এল ব্রাউন। ও পৌঁছানোর পর উঠে দাঁড়াল ক্রিশ্চিয়ান।

'উইলিয়ামস, ওদের বলেছ কেন এখানে আসতে বলেছ?'

'না স্যার; আমার মনে হয় আপনি বললেই ভাল হয়।'

মাথা ঝাঁকাল ক্রিশ্চিয়ান। 'একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যার সুষ্ঠু সমাধানের ওপর নির্ভর করছে এদ্বীপের প্রত্যেকটা নর-নারীর ভাগ্য। উইলিয়ামস ওর মেয়েটাকে হারিয়েছে। এখন ওর বক্তব্য হচ্ছে আরেকটা পেতে হবে ওকে।' থামল ক্রিশ্চিয়ান। তারার আলোয় একটা গলা বলে উঠল, 'আমাদের কারওটা নিশ্চয়ই নয়!'

'ও চায় হুটিয়াকে,' বলল ক্রিশ্চিয়ান, 'টারারুর বউ।'

'সে তো অনেকবারই পেয়েছে,' কুইনটাল বলল।

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠল উইলিয়ামস। তাড়াতাড়ি ওকে থামাল ক্রিশ্চিয়ান।

'সেটা আমাদের মাথা ব্যথা নয়,' বলল ও। 'ও নিজের ঘরে চায় হুটিয়াকে। ও চায় মেয়েটা স্বামীকে ছেড়ে এসে প্রকাশ্যে ওর সাথে থাকবে। প্রশ্নটা নিয়ে ভোটাভুটি করার আবেদন জানিয়েছে ও। মেয়েমানুষের জন্যে ওর যে আকাঙ্ক্ষা তা অত্যন্ত স্বাভাবিক; অন্য যে কোন পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা শুধুমাত্র ওরই ব্যাপার হত; কিন্তু আমাদের এখানকার অবস্থা আলাদা। নারী নিয়ে কলহ বা মতান্তর সর্বকালে সর্বদেশেই বিপজ্জনক। আমাদের এখানকার মত ছোট এক জনগোষ্ঠীতে তা আরও মারাত্মক হতে পারে। হুটিয়ার স্বামী মিনারীর ভাস্তে। আর মিনারীকে তো আমরা ভাল করেই জানি–দেহে মনে অত্যন্ত বলিষ্ঠ লোক, একটু অহঙ্কারী এবং নিজের সমাজে একজন গোত্রপতি। টারারুর স্ত্রীকে ছিনিয়ে নেয়া হলে ও নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকবে না। তাছাড়া আমার প্রশ্ন, টারারুর কী হবে? আজ উইলিয়ামস-এর যে অবস্থা কাল টারারুরও কি তা-ই হবে না? ন্যায় বিচারের মর্যাদা চিরন্তন। ইন্ডিয়ানরা অবিচারকে আমরা যতটা করি ততটাই ঘৃণা করে। আমরা এখানে দুটো ভিন্ন বর্ণের মানুষ একত্রিত হয়েছি, এখন পর্যন্ত কোন দ্বন্দ্ব বা কলহ দেখা দেয়নি। কিন্তু যদি বর্ণ বিদ্বেষ শুরু হয়ে যায় সব শেষ হয়ে যাবে।'

থামল ক্রিশ্চিয়ান। মৃদু গুঞ্জন উঠল সামনে ঘাসের ওপর বসা লোকগুলোর ভেতর। ওরা সমর্থন করছে ওকে। কিন্তু মিলস কথা বলল বন্ধুর সপক্ষে:

'আমি জ্যাকের সাথে একমত। ইন্ডিয়ানদের চেয়ে উপরে থাকব আমরা সবসময়।'

'ঠিক বলেছ!' বলল মার্টিন।

'ঠিক বলেছে?' ম্যাককয় বলল। 'আমার তা মনে হয় না! আমি মনে করি মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানই ঠিক। টারারুর কাছ থেকে হুটিয়াকে ছিনিয়ে নিলে রক্তারক্তি শুরু হয়ে যাবে। আমি স্বার্থপর নই, উইলিয়ামস চাইলে আমি আমার মেরিকে ওর সাথে ভাগ করে নিতে পারি।'

'তোমার মেরি তোমারই থাক!' গর্জে উঠল উইলিয়ামস।

'সেক্ষেত্রে ভোট ছাড়া কোন উপায় দেখছি না,' বলল ক্রিশ্চিয়ান। 'তোমরা তৈরি? মনে রাখবে এখানে ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যাবে এবং চিরদিনের জন্যে। ভোটে যে সিদ্ধান্ত হবে আমরা সবাই তা মানতে বাধ্য থাকব। এখন, উইলিয়ামস টারারুর স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিক যারা চাও হাত তোলো।'

তীক্ষ্ণ চোখে অন্ধকারের ভেতর তাকাল ক্রিশ্চিয়ান। মিলস আর মার্টিনের হাত

কেবল উঠল।

'তাহলে, উইলিয়ামস,' ক্রিশ্চিয়ান বলল, 'ব্যাপারটা দাঁড়াল, তোমরা তিনজন আর আমরা ছ'জন, আশা করি তুমি সন্তুষ্ট?'

'সন্তুষ্ট না হলেও আমি ভোটের সিদ্ধান্ত মেনে চলব,' রুক্ষকণ্ঠে জবাব দিল কামার।

সাত

এর পর থেকে উইলিয়ামস বেশির ভাগ সময় ব্যয় করতে লাগল বসতির বাইরে। দ্বীপের পশ্চিম অংশে এক বন ছাওয়া মালভূমিতে ও খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করছে একটা কেবিন তৈরি করবে বলে। জুলাই, আগস্ট আর সেপ্টেম্বরের ঠাণ্ডা মাসগুলোয় প্রতিদিন ভোরবেলা কেউ জাগার আগেই উঠে চলে গেল, ফিরল সন্ধ্যার পরে মিলস ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করল না। মার্টিনও প্রথম দিকে দু'তিনবার জিজ্ঞাসাবাদ করে মাথা ঘামানো ছেড়ে দিল ওর সম্পর্কে। অক্টোবরের শুরুতে উইলিয়ামস ঘোষণা করল, সে তার নতুন বাড়িতে উঠে যাচ্ছে। এবং সেদিনই মিলস-এর সহায়তায় তার জিনিসপত্র নিয়ে রওনা হলো কেবিনের পথে।

ছোট হলেও কেবিনটা বেশ মজবুত এবং ছিমছাম। প্যানডানাস কাঠ চিরে তৈরি করা হয়েছে দেয়াল, চাল প্যানডানাস পাতার; কেবল মেঝেটা তৈরি বাউন্টির তক্তা দিয়ে। সামান্য দু'চারটে আসবাবপত্র আছে ঘরটায়, সবগুলো অত্যন্ত দক্ষ হাতে তৈরি করেছে কামার। মিলস আগে কখনও আসেনি এখানে। সপ্রশংস দৃষ্টিতে সব দেখতে লাগল ও।

'দারুণ বানিয়েছ তো, জ্যাক!' পিঠের বোঝা নামিয়ে রাখতে রাখতে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল মিলস। 'সব একেবারে ব্রিস্টল ধাঁচের! তাহলে একাই থাকবে তুমি?'

'হ্যাঁ।'

কাঁধ ঝাঁকাল মিলস। 'তোমার ব্যাপার তুমিই ভাল বোঝো, তবু বলছি, ইচ্ছে করলেই তো তুমি হুটিয়াকে নিয়ে আসতে পারো। তারপর দরকার হলে বোঝা পড়া করা যাবে ইন্ডিয়ানগুলোর সাথে।'

'না, ঝামেলা পাকানোর কোন ইচ্ছে আমার নেই। ক্রিশ্চিয়ান সবসময় আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করছে, প্রতিদানে আমিও ভাল ব্যবহার করতে চাই। হুটিয়ার চোখের আড়ালে থাকার চেষ্টা করব আমি, কিন্তু কী ভাবে যে এর শেষ হবে আমি বলতে পারি না। ধন্যবাদ তোমাকে, জন, কষ্ট করে আমার মালপত্র পৌঁছে দিয়ে গেলে।' এক মুহূর্ত থেমে যোগ করল, 'সবাইকে বোলো, কামারশালায় যখনই আমার দরকার পড়বে আমি যাব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল মিলস। উইলিয়ামস বসল দরজার গোড়ায়। ভীষণ গরম বিকেলটা। একটু হাওয়া নেই। দরদর করে ঘামতে লাগল ও। সন্ধ্যার আঁধার

নেমে আসার পর উঠে কেবিনের পেছনে ছোট্ট রান্নাঘরটায় গেল। আগুন জ্বেলে রাতের খাবার তৈরি করল। তারপর খেয়ে শুয়ে পড়ল। রাতেও গরম রইল দিনের মত। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করল উইলিয়ামস। এত গরমে ঘুমানো যায় না। ভোর হওয়ার আগেই উঠে পড়ল সে। ভোরের ধূসর আলো যখন ফুটতে শুরু করেছে তখন ওকে দেখা গেল পথ বেয়ে চলেছে ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ির দিকে!

একই সময় ঘুম থেকে উঠেছে আলেকজান্ডার স্মিথ। উইলিয়ামস-এর মত ও-ও রাতের বেশির ভাগ সময় এপাশ ওপাশ করেছে আর অভিশাপ দিয়েছে গরমকে। দরজা খুলে চোখ ডলতে ডলতে বাইরে এল ও। লম্বা করে হাই তুলল একবার। আড়মোড়া ভাঙল।

রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল স্মিথ। নারকেল কোরানিটা এনে বসল তিন পেয়ে এক টুলে। কয়েকটা খোসা ছাড়ানো নারকেল ভেঙে কুরিয়ে খেতে দিল মুরগিদের। নিজে খানিকটা খেলো। তারপর গিয়ে ঢুকল শুয়োরদের ঘেরে। ওদেরও খেতে দিল খানিকটা কোরানো নারকেল।

ইতিমধ্যে বেশ আলো হয়ে গেছে চারদিক। বলহাদি এসে দাঁড়াল দরজায়। হাসিমুখে স্বামীর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে নাশতা তৈরি করার জন্যে। স্মিথ জামা খুলে রেখে বড় একটা ক্যালাবাশ ভরে আনল পানির পিপে থেকে। হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে বেরোল তার সব্জি বাগান দেখতে। বাড়ির পাশেই প্রায় আধ একর জমি নিয়ে বেড়া ঘেরা বাগানটা। শাক-সব্জির পাশাপাশি ফুলের গাছও লাগিয়েছে স্মিথ বাগানে। স্মিথের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকে ইয়ং। ইয়ং লোকটা জাহাজের কাজ মোটামুটি বুঝলেও ঘর গৃহস্থালী তেমন বোঝে না, তাই এই কাজগুলো স্মিথকেই করতে হয়। কিছুক্ষণ বাগানের পরিচর্যা করল ও। তারপর বলহাদির ডাক শুনে উঠে এল নাশতা করতে।

বলহাদি দেখতে ছোটখাট হলেও শক্তসমর্থ মেয়ে। বয়স অন্যান্য মেয়ের তুলনায় একটু বেশি তবু যৌবন অটুট এখনও দেহে। স্মিথ সত্যিকারের ভালবাসে ওকে। সব সময় অদ্ভুত এক আকর্ষণ বোধ করে ওর জন্যে, এবং সুযোগ পেলেই তা প্রকাশ করতেও ছাড়ে না। যেমন এখন করল। বাগান থেকে এসে আরেকবার হাত-মুখ ধুয়ে মুছে খেতে বসল ও। বলহাদি এল খাবার নিয়ে। খাবারের পাত্রগুলো নামিয়ে রাখা হতে না হতেই ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে হাত চালাল স্মিথ। খাবারের দিকে নয়। বলহাদিকে ধরে এনে বসাল নিজের কোলে। সশব্দে চুমু খেলো ঠোঁটে। সলজ্জ একটু হেসে ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে সরে বসল বলহাদি। খেতে শুরু করল স্মিথ। দশ মিনিট পর দেখা গেল কুঠার কাঁধে ফেলে রওনা হচ্ছে ও বনের দিকে।

'আলেক্স! ও আলেক্স!'

রাস্তা থেকে চিৎকার শোনা গেল তেতাহিতির। ইন্ডিয়ানদের ভেতর তেতাহিতির সঙ্গেই স্মিথের সম্পর্ক সবচেয়ে নিবিড়। সম্পর্কটা গত আট ন'মাসে বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁছেছে। তার একটা কারণ দু'জনই মাছ ধরতে খুব পছন্দ করে।

'তোমাকে নিতে এলাম,' বলল তেতাহিতি। 'দুপুর পর্যন্ত হাতের কাজ বাদ রাখতে পারবে? মাছ ধরতে যেতাম। আলবাকোর-এর ঝাঁক কোথায় ঘুমায় আমি

টের পেয়েছি।'

মাথা ঝাঁকাল স্মিথ। কুঠারটা বাগানের বেড়ার সাথে খাড়া করে রেখে রওনা হলো তেতাহিতির পেছন পেছন বাউন্টি বে-র দিকে। মিলস এবং ম্যাককয়-এর বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়ে ইন্ডিয়ানদের বাড়িটার সামনে দাঁড়াল ওরা। পুরুষদের সবাই যার যার কাজে চলে গেছে। স্মিথ আলাপ করতে লাগল মোয়েটুয়ার সঙ্গে, আর তেতাহিতি ঢুকে গেল ঘরের ভেতর ছিপ-বড়শি আনতে। হুটিয়াকে কোথাও দেখা গেল না।

'দেখ,' ঘর থেকে বেরিয়ে তেতাহিতি বলল, 'অক্টোপাসের টোপ ফেলব আমরা। কাল রাতে দুটো মেরেছি বর্শা দিয়ে।'

সাগর শান্ত খাঁড়িতে। ছোট ক্যানোটা জলে ভাসিয়ে ওরা রওনা হয়ে গেল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। উপকূল থেকে প্রায় এক মাইল এসে বৈঠা বাওয়া বন্ধ করল দু'জন।

'এই জায়গা,' বলল তেতাহিতি। 'অনেকদিন ধরে পাখিদের গতিবিধি লক্ষ করছি আমি। যা বুঝেছি, এই জায়গায় মাছের দল খাবারের খোঁজে ওপরে আসে না, গভীর পানিতে চলে যায় ঘুমানোর জন্যে।'

দুইশো ফ্যাদমের চেয়েও লম্বা দুটো সুতোর গুটি নিয়ে এসেছে তেতাহিতি। দুটোর মাথায় বড়শি বেঁধে তাতে টোপ গেঁথে ছেড়ে দিল ওরা। বড়শির খানিকটা ওপরে ভার হিসেবে বেঁধে দিয়েছে দুটো পাথর।

'প্রথমে একশো ফ্যাদমে চেষ্টা করে দেখি,' বলল তেতাহিতি। ক্যানোর দুপাশ থেকে সুতো ছাড়তে লাগল দু'জন। একশো ফ্যাদম যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দুই গুটিতেই একটা করে গিঁট দেয়া আছে। সেই পর্যন্ত ছেড়ে ওরা আস্তে আস্তে নাড়তে লাগল সুতো, ছ'শো ফুট নিচে মাছদের আকৃষ্ট করার জন্যে।

সূর্য বেশ উঠে এসেছে ইতিমধ্যে। এদিকে একফোঁটা বাতাস নেই। উত্তর দিগন্তে স্থির হয়ে আছে এক টুকরো কালো মেঘ। এই সকালেও গরমে তিষ্ঠানো দায়।

'ঝড় হবে,' বলল তেতাহিতি। 'আজ রাতে চাঁদ পুরো থাকবে।'

মাথা ঝাঁকাল স্মিথ। 'ক্রিশ্চিয়ানও তাই বলছিলো।'

'তোমার কানদুটো বেশ খোলা,' বলল তেতাহিতি, 'আমাদের মতই বলতে শুরু করেছ আমাদের ভাষা।'

'তোমার কাছ থেকেই বেশির ভাগ শিখেছি। আজ কী বার–মানে রাত?'

'মাইটু। আজকের রাত হচ্ছে হোটু। মানে একই সময়ে সূর্য ডুববে এবং চাঁদ উঠবে।'

সপ্রশংস ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল স্মিথ। 'আমার মনে থাকবে না। আমাদের সাদাদের সপ্তাহের সাতটা বারের নাম শিখলেই চলে। তোমাদের নিশ্চয়ই চাঁদের আটাশ রাতের নাম শিখতে হয়?'

'আরও বেশি। মাইটু রাতের তাৎপর্য শোনো: "এরাত টারো এবং বাঁশ লাগানোর রাত; নারী পুরুষের মিলনেরও রাত; কাঁকড়া আর চিংড়ি পুরনো খোলস ফেলে দেয় এ রাতে। এ রাতে জন্ম নেয় বড় চোখ আর লাল চুলওয়ালা

বাচ্চারা।"...মাউ!'

শেষ শব্দটা চিৎকার করে উঠেই হাতের সুতোয় ঢিলে দিল ও। সর সর করে ক্যানোর কিনারের ওপর দিয়ে নেমে যেতে লাগল সুতো। স্মিথ উৎসুক চোখে দেখতে লাগল তেতাহিতির দক্ষ হাতে বড় মাছ খেলানো। পর মুহূর্তে ও-ও চিৎকার করে উঠল সবিস্ময়ে। ওর বড়শিতেও আটকেছে একটা মাছ। পুরো আধ ঘন্টা ঘামতে ঘামতে মাছ দুটোকে খেলাল দু'জন। স্মিথেরটা ক্লান্ত হলো আগে। সুতো টানতে শুরু করল ও। এক কি দু'মিনিট পরে তেতাহিতি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাছ দুটোকে তুলে ফেলল ওরা ক্যানোয়। ছোট্ট ক্যানোটা কাঁপতে লাগল বিশাল মাছ দুটোর তড়পানিতে। তেতাহিতি তাড়াতাড়ি চেপে ধরল ওরটার লেজ। আর স্মিথ তারটার কানকো। অন্তত একশো পাউন্ড করে ওজন হবে দুটো মাছেরই। স্মিথ মাথায় বৈঠার ঘা মেরে মাছ দুটোর ভবলীলা সাঙ্গ করে বসে পড়ল বৈঠা নিয়ে। তেতাহিতিও মাছ ছেড়ে তুলে নিল বৈঠা।

বাউন্টি বে-তে যখন ওরা ফিরে এল তখন সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে মেঘের আড়ালে, সাগর উত্তাল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। মিনারী দাঁড়িয়ে ছিল সৈকতে। ওদের দেখে এগিয়ে এল। ক্যানোটা ডাঙায় তুলতে সাহায্য করল।

'সময় মত এসেছ তোমরা,' বলল সে। 'আরেকটু দেরি হলেই ঝড়ে পড়তে। দাও আমি নেই মাছ, তোমরা ক্লান্ত।'

আলবাকোর দুটোর লেজ একসাথে করে দড়ি দিয়ে বেঁধে অবলীলায় কাঁধে ঝুলিয়ে নিল মিনারী। নিজের বাড়িতে পৌঁছে নামিয়ে রাখল উঠানে। দুপুর প্রায় হয়ে গেছে। বাকি ইন্ডিয়ানরা ফিরে এসেছে কাজ থেকে। হু-কে মাছ দুটো কেটে ভাগ করার নির্দেশ দিল মিনারী। মেয়েরাও এসে দাঁড়িয়েছে দেখার জন্যে। পলিনেশীয় সমাজে কেনা বেচার কোন ব্যাপার নেই। মাছ ধরা হলে গোত্রের সবার ভেতর তা ভাগ হয় সমান ভাবে, ছোট বড় কোন ভেদাভেদ না রেখে। ইন্ডিয়ানদের এই রীতিটা শুরু থেকেই অনুসরণ করা হচ্ছে পিটকেয়ার্ন-এ।

'ব্রাউনের ভাগ আমি দিয়ে আসব,' বলল মিনারী। হু আর তে মোয়া বাকি ভাগগুলো লাঠিতে ঝুলিয়ে দু'জন লাঠির দু'প্রান্ত কাঁধে তুলে রওনা হলো বিতরণ করার জন্যে। স্মিথ চলল পেছন পেছন। ম্যাককয়-এর মেরিকে ওরা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল বাড়ির সামনে। পেটে বাচ্চা নিয়ে বিরাট হয়ে গেছে মেরি। ওদের ভাগটা যখন ওর পায়ে কাছে ঘাসের ওপর রাখা হলো বেশ কষ্ট করতে হলো তাকে ওটা তুলবার জন্যে।

'এই, উইল!' ডাকল স্মিথ। 'তোমাদের জন্যে সামান্য মাছ রেখে গেলাম।'

ম্যাককয় আর কুইনটালকে দেখা গেল দরজার সামনে। 'ধন্যবাদ, আলেক্স। কী মাছ? আলবাকোর!'

'হ্যাঁ,' বলল কুইনটাল। 'গরুর গোশের পরে এত ভাল খেতে আর কিছু হয় না।'

মিলস-এর বাড়িতে গিয়ে তাদের ভাগ দেয়ার পর নিজের বাসায় এল স্মিথ। ইন্ডিয়ান দু'জনকে বিদায় করে দিয়ে ক্রিশ্চিয়ান আর উইলিয়ামস্-এর ভাগ দুটো নিয়ে নিজে রওনা হলো ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ির দিকে। বলহাদি চলল ওর সাথে। তাজা

সবুজ পাতায় খানিকটা টারোর পায়েস নিয়েছে ও।

'মাইমিতির জন্যে,' বলল বলহাদি। 'এটা দেখে হয়তো ওর খাওয়ার ইচ্ছা হবে।'

'কখন ওর বাচ্চা হবে?'

'খুব বেশি দেরি নেই আর—আজ বা কাল, আমার মনে হয়।'

দরজার কাছেই ক্রিশ্চিয়ানের সাথে দেখা হলো ওদের। মাছ আর পায়েসটুকু রান্নাঘরে নিয়ে গেল বলহাদি।

'দারুণ মাছ, স্মিথ!'

'অন্তত এক হন্দর হবে ওজন, স্যার!' বেশ একটু গর্বের সাথে বলল স্মিথ। তেতাহিতি যেটা ধরেছে সেটাও একই রকম। সবার কয়েক দিনের খাওয়া চলে যাবে।'

'তুমি থাকো, আজ আমাদের সাথে খাবে।'

'না, স্যার, এমন সময় আপনাদের বিরক্ত করা...'

মাথা নাড়ল ক্রিশ্চিয়ান। 'বিরক্ত কিছু না। জেনি আছে, নামাই আছে; তোমার বলহাদিকে নিয়ে ওরা এক সাথে খাবে। বড় অদ্ভুত জাত এই ইন্ডিয়ানরা, জন্ম আর মৃত্যুই ওদের কাছে সবচেয়ে উত্তেজনার বিষয়। এসো, ভেতরে এসো।'

'ধন্যবাদ, স্যার। জ্যাকের জন্যে এক টুকরো মাছ এনেছি, ঝুলিয়ে রেখে আসি রান্নাঘরে।'

'দশ মিনিটও হয়নি ও গেল এখান থেকে।...ঠিক আছে মাছটা ঝুলিয়ে রেখে এসো তুমি।'

ক্রিশ্চিয়ানের ঘরে টেবিলের সামনে বসল ওরা। মাইমিতি এখন আর মই বেয়ে ওপরে উঠতে পারে না বলে খাওয়ার ঘরটাকে করা হয়েছে শোয়ার ঘর। খাওয়া দাওয়া আপাতত ক্রিশ্চিয়ানের ঘরেই সারা হয়। দু'জন নীরবে বসে রইল কিছুক্ষণ। টেবিলের ওপরকার ক্রোনোমিটারের টিক টিক শুনতে লাগল। ওটার ডায়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্রিশ্চিয়ানের মনে পড়ে যেতে লাগল কাম্বারল্যান্ডে ছেলেবেলার কথা, ম্যান দ্বীপের দিনগুলোর কথা, প্রথম যখন জাহাজে কাজ নিয়েছিল সেই সময়ের কথা।

'বুড়ো ঘড়িটার যদি গলা থাকত,' হঠাৎ বলল ও, 'অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাহিনী শোনাতে পারত আমাদের। দুই দুটো যাত্রায়, ক্যাপ্টেন কুকের সাথী ছিল ও। অজানা সাগরের ওপর দিয়ে হাজার হাজার লিগ পাড়ি দিয়েছে। জীবন শুরু করেছিল লন্ডনে, শেষ করবে এই পিটকেয়ার্ন দ্বীপে।'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল স্মিথ। 'আমার মত, স্যার!'

'তোমার জন্ম লন্ডনে নাকি? আমি তো ভেবেছিলাম আমার দেশী বুঝি।'

'হ্যাঁ, স্যার, লন্ডনেই জন্ম, মানুষ হয়েছি এতিমখানায়। আমি ছদ্ম পরিচয়ে আছি এখানে। আমার আসল নাম জেমস অ্যাডামস। সবাই আমাকে "বাউণ্ডুলে জ্যাক" বলত। এক ঝামেলায় ফেঁসে গিয়ে পালাতে হলো লন্ডন ছেড়ে। ঝামেলা পিছু ছাড়ে না দেখে নাম বদলে উঠে পড়লাম বাউন্টিতে।'

মাথা ঝাঁকাল ক্রিশ্চিয়ান। একটু পরে জিজ্ঞেস করল, 'বলো তো, স্মিথ, এখানে

থেকে তুমি খুশি?'

'পুরোপুরি, স্যার! আমার বাপ ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে লন্ডনে এসেছিল যদিও, আসলে আমরা গ্রামের মানুষ। আমার রক্তে আছে গ্রাম। খুশি কি না? আপনারা সবাই যদি চলে যান আর আমাকে সুযোগ দেন, আমি আমার মেয়ে মানুষকে নিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থেকে যাব এখানে।'

হাসল ক্রিশ্চিয়ান। 'সত্যি তোমার মত যদি হত সবার মনের অবস্থা। বিশ বছর পরে এখানকার চেহারা কেমন হবে কল্পনা করেছ কখনও? সুন্দর সুন্দর খামার, নতুন নতুন বাড়ি, আর বাচ্চা–অনেক–আশা করি।'

'তাদের প্রথমজন আসছে আপনার ঘরে!'

জেনিকে দেখা গেল দরজায়। ওর হাতে থালাভর্তি ভাজা মাছ। টেবিলের ওপর থালাটা রাখল ও। কয়েক সেকেন্ড পর বলহাদি এল আরও দুটো থালা নিয়ে। ঘণ্টাখানেক পর বিদায় নেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল স্মিথ।

'বিকেলে খাঁড়িতে আসতে বোলো উইলিয়ামসকে,' বলল ক্রিশ্চিয়ান। 'নৌকাগুলো যাতে ভেসে না যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

বাউন্টি বে থেকে বসতির পথে সবাই যখন রওনা হলো তখন প্রায় সন্ধ্যা। নৌকা দুটো আর ক্যানো দুটোকে ঢালের গোড়ায়–মানে সাধারণত ওগুলো যেখানে রাখা হয় তার চেয়ে অনেক ওপরে টেনে তুলেছে ওরা। আশা করছে কোন ঢেউ, তা যত বড়, যত ভয়ঙ্করই হোক, পৌঁছুতে পারবে না ওখানে।

কিন্তু রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড় হারিকেনের রূপ নিল। বাতাসের গভীর গর্জন আর বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশির প্রলয়োল্লাসে ভেঙে পড়ার শব্দ বেড়ে চলল রাত বাড়ার সাথে সাথে। ঢেউ আর বাতাসের দাপটে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল ছোট্ট দ্বীপটার পাথুরে ভিত্তিভূমি। সারারাত কেউ ঘুমাতে পারল না। কিছু কিছু মুহূর্তে মনে হলো একমাত্র অলৌকিক কোন ঘটনাই বাঁচাতে পারে ঘরগুলোকে উড়ে যাওয়া থেকে। ভোর হলো অবশেষে।

সাতটার দিকে স্মিথকে দেখা গেল ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ির দিকে এগোতে। বাতাসের বেগ আস্তে আস্তে কমছে তবে এখনও পথের পাশের নারকেল গাছগুলো নুয়ে পড়তে চাইছে ঝড়ের দাপটে। তীব্র বাতাসের উল্টো দিকে এগোনোর জন্যে ঝুঁকে হাঁটতে হচ্ছে স্মিথকে। অবশেষে ও পৌঁছুল ক্রিশ্চিয়ানের বাড়িতে। বাতাসের উল্টো দিকের একটা দরজা ছাড়া আর সব দরজা জানালা বন্ধ বাড়ির। খোলা দরজাটা দিয়ে ঢুকে পড়ল স্মিথ। জেনি আর টাউরুয়ার সাথে বসে আছে ক্রিশ্চিয়ান।

'বলহাদি মাইমিতির কাছে,' স্মিথকে এক পাশে টেনে নিয়ে বলল সে। 'ব্যথা শুরু হয়েছে। নৌকাগুলোর কী অবস্থা?'

'বড় কাটারটা ছাড়া আর সবগুলো গেছে,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল স্মিথ। 'ঢেউ এত বিরাট হয়ে উঠেছিল, আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না! ঘণ্টাখানেক আগ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। তারপর বিশাল এক ঢেউ এল গর্জন করতে করতে। পানি নেমে যাওয়ার পর দেখলাম ক্যানো দুটো আর ছোট কাটারটা নেই। বাউন্টির পোড়া খোলটাও ভেসে গেছে!'

বিচলিত ভঙ্গিতে কয়েক মিনিট পায়চারি করল ক্রিশ্চিয়ান। পাশের ঘরের দরজার কাছে থেমে কান খাড়া করে শুনল কয়েক সেকেন্ড। তারপর হঠাৎ টাউরুয়ার দিকে তাকিয়ে বলল:

'ওর কাছে যাও তো, তুমি আর জেনি; বলো আমি বাউন্টি বে-তে যাচ্ছি, এক্ষুণি ফিরব।' স্মিথের দিকে তাকাল ও। 'চলো, একটু ঘুরে আসি। এ সময় এখানে থেকে আমি কিছু তো করতে পারব না।'

খাঁড়ির কাছে এসে ওরা দেখল ইয়ং আর আরও কয়েকজন বিরাট একটা পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে তাকিয়ে আছে রুদ্র সাগরের দিকে। কথা বলা অসম্ভব। বললেও শোনা যাবে না ঝড় আর সাগরের গর্জনে। ইয়ং হাত তুলে ইশারা করল যেখানে বাউন্টির দগ্ধাবশেষটা ছিল সেদিকে। তার কোন চিহ্নই আর নেই।

কিছুক্ষণ উত্তাল সাগরের উন্মাদ নাচন দেখে দাঁড়াল ক্রিশ্চিয়ান। ইয়ং আর স্মিথকে নিয়ে রওনা হলো বসতির দিকে। ঝড়ের বেগ আরেক দফা কমতে শুরু করেছে তখন। ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ির দরজায় পৌঁছে বাতাস আর ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে ওদের কানে এল নতুন একটা শব্দ–নবজাত শিশুর কান্নার আওয়াজ। জেনি আর টাউরুয়া পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল হাসি মুখে। ওদের পেছন পেছন বলহাদি। ওরও মুখে হাসি। ক্রিশ্চিয়ানকে ইশারায় কাছে ডাকল সে।

'ও টামারোয়া!' বলল বলহাদি। 'ছেলে!'

ক্রিশ্চিয়ানকে নিয়ে প্রসূতির ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে। ক্রিশ্চিয়ান দেখল চৌকির ওপর অনেক ভাঁজ টাপার নিচে শুয়ে আছে মাইমিতি। তার পাশে একই নরম ইন্ডিয়ান কাপড়ে মোড়া একটা নবজাত বাচ্চা। একটু পরপরই নড়ে উঠে চিৎকার করছে সে। মাইমিতির মুখটা ফ্যাকাসে, ক্লান্ত; কিন্তু চোখে অদ্ভুত এক পরিতৃপ্তির চাউনি।

'দেখ!' গর্বিত কণ্ঠে বলহাদি বলল। 'এত সুন্দর বাচ্চা দেখেছ কখনও? আর কী শুভক্ষণে জন্ম! আমাদের প্রবাদ জানো তো?–"ঝড়ের ভেতর ভূমিষ্ট শিশু শান্তিতে জীবন কাটায়"।'

ক্রিশ্চিয়ান বেরিয়ে এল সেঘর থেকে। ইয়ং হাসল ওর দিকে তাকিয়ে। 'আমাদের প্রথম বাচ্চা এল আপনার ঘরে, এর চেয়ে সঙ্গত আর কী হতে পারত।' করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'নাম কী রাখবেন ভেবেছেন কিছু?'

'না। তবে ইংল্যান্ডের কথা মনে করিয়ে দেয় এমন কিছু রাখব না,' জবাব দিল ক্রিশ্চিয়ান। 'স্মিথ, বলহাদি আজ সত্যিকারের বন্ধুর কাজ করেছে। তুমি আমার ছেলের ধর্ম বাপ হবে। নাম দাও একটা ওর।'

দাঁত বের করে হাসল স্মিথ। মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'ইংল্যান্ডের কথা মনে করিয়ে দেয় এমন কিছু রাখবেন না? তাহলে···তাহলে···পেয়েছি, স্যার! আজকের দিনের নামে নাম রাখতে পারেন ওর।'

গম্ভীর ভাবে হাসল নবজাতকের পিতা। 'হ্যাঁ, ভাল বুদ্ধি দিয়েছ, স্মিথ। আজ হলো বৃহস্পতিবার (থার্সডে) আর মাস অক্টোবর। ওর নাম হবে থার্সডে অক্টোবর ক্রিশ্চিয়ান!' দরজার বাইরে তাকিয়ে ও যোগ করল, 'এই যে আর সবাই এসে

গেছে, বেঞ্চগুলো পেতে দাও তো!'

অন্য সব বিদ্রোহী আর তাদের নারীরা ঢুকল ঘরে। পুরুষরা একে একে করমর্দন করে অভিনন্দন জানাল ক্রিশ্চিয়ানকে। মেয়েরা ঢুকে গেল পাশের ঘরে। মাইমিতির চৌকি ঘিরে মাটিতে বসল সবাই।

সবগুলো বেঞ্চ ভরে যাওয়ার পর বাতাসের গর্জনের ওপর দিয়ে গলা চড়াল ক্রিশ্চিয়ান।

'একটা প্রশ্নে তোমাদের ভোট চাই আমি। আজ আমরা এখানে এবং এখন একপাত্র করে অতিরিক্ত মদ খেতে পারব?'

প্রত্যেকটা হাত উঁচু হলো সঙ্গে সঙ্গে। তবে ম্যাককয় উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'আর কতটুকু আছে, স্যার?'

পকেট থেকে ছোট্ট একটা খাতা বের করে পৃষ্ঠা ওল্টাল ক্রিশ্চিয়ান। তারপর জবাব দিল, 'তিপ্পান্ন গ্যালন।'

'টেনেটুনে চার মাস চলতে পারে!' হতাশ কণ্ঠে বলল ম্যাককয়।

প্রত্যেকের হাতে একটা করে ভরা গ্লাস তুলে দেয়া হলো। নবজাতকের স্বাস্থ্য কামনা করল বিদ্রোহীরা:

'দীর্ঘজীবী হোক আমাদের প্রথম সন্তান!'

আট

নভেম্বরে বসন্তের প্রথম কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর ওরা ফসল বুনতে শুরু করল পরিষ্কার করা জায়গায়। আবহাওয়া ভয়ানক উষ্ণ। সূর্য যখন মাথার ওপর উঠে আসে তখন খোলা মাঠে কাজ করা প্রায় অসম্ভব। সেজন্যে ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই সবাই জমিতে চলে যায়। দুপুরে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নেয় ছায়ায়, তারপর আবার কাজ করে সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসা পর্যন্ত।

স্মিথ, ইয়ং আর ক্রিশ্চিয়ান যৌথভাবে মোটামুটি আয়তনের একটা জমি পরিষ্কার করেছে আউতে উপত্যকায়। শুকনো ঘাস-পাতা পুড়িয়ে, ছোট ছোট গাছের গুঁড়ি তুলে ফেলে চাষ দিয়ে জমিটাকে ওরা তৈরি করে ফেলেছে ইয়ামের চারা বপনের জন্যে। অন্যরাও যার যার সুবিধা মত জায়গায় জমি তৈরি করেছে। এখন ফসল বুনবে।

মাসের মাঝামাঝি এক ভোরে, সূর্যোদয়ের আগে তিনজন রওনা হলো পাহাড়ের ওপর দিয়ে দক্ষিণের মালভূমির দিকে এগিয়ে যাওয়া পথ ধরে। ওদের একটু সামনে একদল মেয়ে। তিন রাস্তার মোড়ে পৌঁছে পুব দিকে চলে গেল তারা। একটু পরেই ক্রিশ্চিয়ানের নেতৃত্বে ইয়ং আর স্মিথ পৌঁছুল পাহাড়ের ওপর। খাবারের ভারী ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে বসল ওরা। জায়গাটা বেশ প্রশস্ত। খানিক দূর সমতলে এগিয়ে গিয়ে শুরু হয়েছে ঢাল অর্থাৎ আউতে উপত্যকা। তার ওপাশে ধূসর নীল

সাগর। আউতে উপত্যকায় যাওয়ার সময় এই মালভূমিতে বসে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে নেয়া একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে পিটকেয়ার্নবাসীদের ভেতর। আজও তার অন্যথা হলো না। তবে পুরুষরা বসলেও মেয়েরা কিন্তু এগিয়ে গেল না বসেই। ঢালের একেবারে নিচে পৌঁছে কাজে লেগে গেল তারা দেরি না করে। পুরুষরা যখন ফসল ফলানোর তোড়জোর করছে মেয়েরা তখন কাপড় বানাচ্ছে–আউতে গাছের ছাল পিটিয়ে টাপা কাপড়। বসে বসে তিনজনে ওদের ছাল পিটানো দেখল কিছুক্ষণ তারপর নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। ব্রাউনের কুটিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তাহিতি থেকে আনা বীজ ইয়ামগুলো তার কুটিরের পাশে ছোট্ট এক টুকরো জমি পরিষ্কার করে লাগিয়েছিল ব্রাউন। ও আর জেনি এতদিন সযত্নে সেগুলোর পরিচর্যা করে আরও বীজ উৎপন্ন করেছে। সেই বীজই এখন লাগানো হচ্ছে।

ওরা যখন কুটিরের কাছে পৌঁছুল তখন সরু একফালি ধোঁয়ার রেখা উঠছে জেনির রান্নাঘর থেকে। আর মালী ব্রাউন হাঁটু গেড়ে বসে বড় রুটিফলের গাছ থেকে কেটে আনা চারার পরিচর্যা করছে। ক্রিশ্চিয়ান এত হালকা পায়ে ওর পাশে পৌঁছুল যে তার গলা শুনে চমকে উঠল ব্রাউন। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাটি মাখা হাত ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াল।

'কেমন আছেন, স্যার?' ইয়ং আর স্মিথের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল সে। 'আজ কী লাগাবেন?'

'লম্বা ইয়াম–মানে টাহোটাহোর বীজ আর আছে?'

'অনেক, স্যার।'

ব্রাউনের কাছ থেকে বীজ নিয়ে আবার রওনা হলো তিনজন তাদের জমির উদ্দেশ্যে। সেখানে সকাল প্রায় দশটা পর্যন্ত একটানা কাজ করল ওরা। ইয়ং বড় বীজ ইয়ামগুলো কেটে ছোট ছোট টুকরো করে দিতে লাগল আর ক্রিশ্চিয়ান আর স্মিথ ট্যাঙ্গারি (ছোট কোদাল বিশেষ) দিয়ে মাটিতে গর্ত করে সেগুলো পুঁতে দিতে লাগল। তিনজনই কাজ শুরু করার আগে জামা খুলে ফেলেছে। ঘামের স্রোত বইছে এখন ওদের উন্মুক্ত কাঁধ, পিঠ, বুক দিয়ে। গরম যখন অসহ্য হয়ে উঠল ট্যাঙ্গারিটা রেখে দিয়ে হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল ক্রিশ্চিয়ান।

'যথেষ্ট হয়েছে,' স্মিথের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

'জি, স্যার,' জবাব দিল স্মিথ, 'এবার একটু বিশ্রাম না হলে চলে না।'

জমির প্রান্তে একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে বসল ওরা। বড় একটা ক্যালাবাশ থেকে পানি নিয়ে হাত মুখ ধুলো। স্মিথ আবার উঠে চলে গেল বনের দিকে। ফিরল একটু পরেই কয়েকটা ডাব আর চওড়া একটা কলা পাতা নিয়ে। পাতাটা মাটিতে পাতল সে খাবার পরিবেশনের জন্যে। পকেট থেকে ছুরি বের করে ডাবের মুখ কেটে এগিয়ে দিল আগে দুই সঙ্গীর দিকে। শেষে নিল নিজে। এক নিশ্বাসে একটা ডাবের ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি শেষ করে খোলটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল ক্রিশ্চিয়ান।

'দারুণ!' মন্তব্য করল সে।

'মেয়েরা আজ কী দিয়েছে?' ক্ষুধার্ত চোখে খাবারের ঝুড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল ইয়ং।

একে একে ঝুড়ির জিনিসগুলো বের করে কলাপাতার ওপর রাখতে লাগল স্মিথ। প্রথমে বিরাট একটা পোড়ানো মাছ, তারপর রোস্ট করা বাচ্চা শুয়োরের অর্ধেকটা, রান্না করা রুটিফল, শেষে ছোট একটা ক্যালাবাশ ভর্তি নারকেলের চাটনী, ইন্ডিয়ানরা যাকে বলে টাইওরো। খেতে শুরু করল তিনজন। দেখতে দেখতে সবটুকু খাবার নিঃশেষ হয়ে গেল। খাওয়ার পর আবার একটা করে ডাব খেলো ওরা।

'এবার আমি একটু ঘুমোব, স্যার,' পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলল স্মিথ। 'অন্তত তিনজনের খাওয়া একাই খেয়েছি।'

শুয়ে পড়ল ও। পাঁচ মিনিটের ভেতর শোনা যেতে লাগল ওর নাসিকাগর্জন। ক্রিশ্চিয়ান আর ইয়ং ঘুমাল না। বসে বসে আলাপ করতে লাগল মৃদু স্বরে।

গ্রীষ্মটা গ্রীষ্মের মতই কাটল। ধুম গরম, মাঝে মাঝে প্রবল বর্ষণ। ভালই বাড়ল ইয়ার্ম। ১৭৯১-এর জুনে শরৎ যখন যাই যাই আর শীত আসি আসি করছে তখন তোলার উপযোগী হলো ওগুলো।

বসতির মাঝামাঝি জায়গায়, মিলস-এর বাড়ির কাছে, তৈরি করা হয়েছে 'সামাজিক সংরক্ষণ মঞ্চ', ইন্ডিয়ান ভাষায় পাফাতা। এক মানুষ সমান উঁচু শক্ত খুঁটির ওপর চেরাই করা কাঠের ঝাঁঝরি বসিয়ে তৈরি হয়েছে মোট চারটে মঞ্চ। এই মঞ্চগুলোয় স্তূপ করে রাখা হবে অন্তত বিশটন ইয়াম, মাছ এবং ফলমূল। ইন্ডিয়ান অইন্ডিয়ান সবাই সমান ভাগ পাবে ওখান থেকে।

মঞ্চ তৈরি শেষ করে ইয়াম খোঁড়া শুরু করল ওরা। যে দল যে জমিতে চাষ করেছে সে দল সে জমি থেকে ইয়াম তুলে এনে সাজিয়ে রাখতে লাগল মঞ্চের ওপর। দিনে দিনে উঁচু হয়ে উঠতে লাগল স্তূপ। অবশেষে মাসের মাঝামাঝি সময় এক সকালে ঘোষণা করা হলো, আর একদিন কাজ করলেই ফসল সব মঞ্চে তোলা হয়ে যাবে।

সেরাতে বিরাট চারটে শুয়োর মারা হলো। চামড়া ছাড়িয়ে কেটে ঝুলিয়ে রাখা হলো অশ্বত্থ গাছটার ডালে। প্রত্যেকটা বাড়িতে উৎসবের আমেজ লেগেছে। দীর্ঘ পরিশ্রমের পর অবশেষে ফসল উঠেছে এবং তার পরিমাণ ওরা যা আশা করেছিল তার চেয়ে বেশি।

পরদিন ভোর হতে না হতেই লোকজন সব জড় হলো মঞ্চের কাছে। সন্ধ্যার ভোজের প্রস্তুতি দেখতে লাগল উৎসুক চোখে এবং যার যার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে লাগল প্রসন্ন মনে। হু আর তে-মোয়াকে বাবুর্চি নির্বাচন করা হয়েছে। দু'জন ইতিমধ্যেই লেগে গেছে মাটি খুঁড়ে দুটো চুল্লী তৈরির কাজে—একটা শুয়োর পোড়ানোর জন্যে অন্যটা টি মূল, ইয়াম, টারো এবং অন্যান্য শাক সব্জি পোড়ানো বা রান্নার জন্যে। ম্যাককয় একটা চামড়া ছাড়ানো শুয়োরের সাদা মসৃণ পেটে চাপড় মেরে বলল:

'ইহুদীরা তোমাদের খায় না, সত্যিকারের স্কটরাও না, কিন্তু, বাবা, ম্যাককয় ফিরে না আসা পর্যন্ত একটু ধৈর্য ধরো, দেখবে খাওয়া কাকে বলে!' কুইনটালের দিকে ফিরল সে। 'আজ একটু মদ ছাড়া চলবে না কিছুতেই!'

সমর্থনের ভঙ্গিতে দাঁত বের করে হাসল কুইনটাল। ক্রিশ্চিয়ানকে দেখা গেল পথের বাঁকে। আট মাসের ছেলেকে কোলে করে আসছে সে। পেছনে মাইমিতি। ম্যাককয় ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'স্যার, আজ রাতে একটু মদ খেতে পারি না আমরা? বেশি না, সবাই এক চুমুক করে?'

মাথা নাড়ল ক্রিশ্চিয়ান। 'মাত্র চার বোতল আছে। তোমরাই তো বলেছ চিকিৎসার প্রয়োজনে ওটুকু রেখে দিতে হবে।'

'তা ঠিক, তা ঠিক, স্যার,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল ম্যাককয়। 'আমার মনে ছিল না। আর বলব না, স্যার।'

একটু পরেই দুই বাবুর্চি ছাড়া আর সব পুরুষ বেরিয়ে পড়ল শেষ দিনের ফসল তুলে আনতে। ক্রিশ্চিয়ান থার্সডে অক্টোবরকে তার মায়ের কাছে দিয়ে লাঠি কাঁধে রওনা হয়ে গেল ইয়ং আর স্মিথকে নিয়ে আউতে উপত্যকার পথে। লাঠির দু'প্রান্তে দড়ি দিয়ে ঝুড়ি ঝুলিয়ে তাতে করে আনবে ইয়াম।

সারাদিন এল ফসল। দুপুরে খাওয়া বা বিশ্রামের জন্যে কোন বিরতি দেয়া হলো না। সন্ধ্যা নাগাদ দেখা গেল পাফাতা-এর ঝাঁঝরি বেঁকে আসছে ওজনে; আর পিটকেয়ার্ন দ্বীপের সবাই, মিনারী, মোয়েটুয়া আর বাবুর্চি দু'জন ছাড়া, মঞ্চে উঠে ইয়ামের স্তূপ ঢেকে রাখছে মাদুর আর রুটিফলের পাতা দিয়ে।

মিনারী আর মোয়েটুয়া ওদের শেষ বোঝাটা নিয়ে এখনও ফেরেনি। একটু পরেই এল ওরা থপথপে পায়ে ছুটতে ছুটতে। দু'জনেরই কাঁধে দুটো লাঠি। সেগুলোর দু'প্রান্তে ঝুলছে একটা করে ঝুড়ি আর প্রত্যেকটা ঝুড়িতে রয়েছে কয়েকটা করে ইয়াম। বিশাল প্রত্যেকটা। চল্লিশ, পঞ্চাশ বা ষাট পাউন্ডের কম হবে না কোনটার ওজন। মিনারী একাই এনেছে অন্তত চার হন্দর। মোয়েটুয়া ওর চেয়ে কম আনলেও যা এনেছে তা ইয়ং বা ম্যাককয়-এর মত পুরুষ তুলতেই পারবে না মাটি থেকে।

স্বামী স্ত্রীতে বোঝা নামিয়ে রাখতেই বেশ কয়েকজন ইন্ডিয়ান নারী পুরুষ ছুটে এল তাদের সাহায্য করতে। প্রুডেন্স আর নানাই সবচেয়ে কাছের পাফাতায় উঠে উবু হয়ে বসে হাততালি দিয়ে চিৎকার করতে লাগল, 'দাও আমার কাছে! দাও আমার কাছে!' নিচ থেকে দু'জন বিরাট ইয়ামগুলো এক এক করে ছুঁড়ে দিতে লাগল আর ওরা দু'জন সেগুলো ধরে সাজিয়ে রাখতে লাগল স্তূপের ওপর। টারারু শেষ ইয়ামটা ছুঁড়ে দেয়ার পর ওর কাঁধে হাত রাখল মিনারী।

'ভাল ফলন হয়েছে আমাদের,' বলল সে, 'টা'আরোয়ার অসীম কৃপা।'

নারী-পুরুষ সবাই চলে গেল এরপর। একটু পরেই ফিরল আবার স্নান করে, পরিচ্ছন্ন হয়ে। মেয়েরা মাথায় ফুলের মালা পরে এসেছে। সবাই এসে যাওয়ার পর দুই বাবুর্চির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল ক্রিশ্চিয়ান। 'চুলোর মুখ খোলো!' নির্দেশ দিল সে। শুরু হলো ভোজ। পুরুষরা এক পাশে, মেয়েরা আরেকপাশে। দু'দলের মাঝে জ্বলছে নারকেলের খোসার উজ্জ্বল আগুন।

দু'ঘণ্টা পর যখন খাবারের উচ্ছিষ্ট সব এক জায়গায় জড় করা হচ্ছে আর ইন্ডিয়ান নারী পুরুষরা একে একে উঠে দাঁড়াচ্ছে ঢাকের তালে তালে আগুন ঘিরে

নাচবার জন্যে তখন বিদায় নিল ক্রিশ্চিয়ান। মাইমিতি ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে করে চলল পেছন পেছন।

'বেশ কাটল আজ,' বাড়ির পথে চলতে চলতে বলল ক্রিশ্চিয়ান। 'শুরুটা আমাদের ভালই হলো। তোমার এবং আমার লোকেরা ভাই ভাই হিসেবে কাটিয়েছে সন্ধ্যাটা!'

মাঝ রাত পেরিয়ে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে এল উৎসবের আগুন। নতুন করে আর উস্কে দেয়া হলো না। ধীরে ধীরে অন্যরাও রওনা হলো যার যার বাড়ির পথে।

বছরের শেষ নাগাদ শুয়োরের সংখ্যা এত বেড়ে উঠল যে সব বাগান আর খেতের চারপাশে বেড়া দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। মোরগ মুরগির সংখ্যাও বেড়েছে সেরকম। বনে বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে ওরা ওদের পোষমানা স্বভাব পুরোটাই হারিয়েছে, তার ওপর ফিরে পেয়েছে ওড়ার ক্ষমতা। মেয়েরা ইচ্ছে মত ফাঁদ পেতে ধরে ওদের। টোপ হিসেবে দেয় কোরানো নারকেল। কারও শুয়োরের মাংস খাওয়ার শখ হলে মাস্কেট হাতে আধঘণ্টা বনে ঘোরাই যথেষ্ট নাদুসনুদুস একটা শুয়োর থলেতে পোরার জন্যে।

রুটিফলের মৌসুম অর্থাৎ নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত সময়ে প্রাচীন বাসিন্দাদের লাগিয়ে রেখে যাওয়া গাছে এত ফল হলো যা দিয়ে দ্বীপের সবার এক বছরের চাহিদা মিটেও প্রচুর বেঁচে যাবে। প্যানডানাস গাছ দ্বীপের সর্বত্র আছে। এর বাদাম সংগ্রহ করা একটু কষ্টকর হলেও খেতে সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। সবগুলো উপত্যকায় জন্মে বুনো ইয়াম আর ড্রাসিনা মূল–যা পোড়ানোর পর খেতে খুব মিষ্টি হয়। আছে বুনো অ্যারোরুট। নারকেল আছে অজস্র–দ্বীপের বর্তমান জনসংখ্যার দশগুণ লোকের চাহিদা মেটানোর জন্যে যথেষ্ট। এর ওপর পাখিদের বাসা বাঁধবার সময়ে চূড়াগুলোয় পাওয়া যায় প্রচুর ডিম আর বাচ্চা পাখি; পাথুরে উপকূলে পাওয়া যায় শেলফিশ। মোট কথা বাড়ি তৈরি এবং ইয়াম আর কাপড়-গাছ লাগানোর জন্যে জমি তৈরির কিছুদিনের ভেতর বিদ্রোহীরা দেখল খুব কম পরিশ্রম করেই ওরা জীবন ধারণ করতে পারছে।

খুদে ক্রিশ্চিয়ানের সংখ্যা এর মধ্যে দুয়ে দাঁড়িয়েছে–থার্সডে অক্টোবর আর নবজাত চার্লস। ম্যাককয় বাবা হয়েছে একটা ছেলে ও একটি মেয়ের। আর স্মরাহ কুইনটালকে উপহার দিয়েছে একটি পুত্র-সন্তান। ফাসটো মারা যাওয়ায় এখন দ্বীপে পূর্ণবয়স্ক মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছাব্বিশ। আরও অন্তত পাঁচশো নরনারীকে খাইয়ে পরিয়ে রাখার সামর্থ্য রাখে দ্বীপটা। গেল দু'বছর বাসিন্দাদের ভেতর গোণ্ডগোল ঝামেলা হয়নি বললেই চলে, যা হয়েছে, তা উল্লেখ করার মত নয়। এর প্রধান কারণ সবাইকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে, ফলে ঝামেলা হওয়ার মত বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দেয়ার অবকাশই পায়নি কেউ। তাছাড়া একটা বোধ সবার ভেতর কাজ করেছে, নিজেদের স্বার্থেই তারা খাটছে, এই খাটুনিটুকু না দিলে সাদা বাদামী সবাইকেই দুর্ভোগ পোহাতে হবে সমানভাবে। তাই বেশ একটা সম্প্রীতির ভাব বিরাজ করেছে দুই বিপরীতধর্মী জাতির ভেতর। এখন যখন দ্বীপে

বসতি স্থাপনের দ্বিতীয় বার্ষিকী এগিয়ে আসছে, সবাই মোটামুটি সহজভাবে নিতে শুরু করেছে জীবনটাকে। মিনারী আর তেতাহিতি বেশিরভাগ সময় কাটার নিয়ে কাটায় সাগরে মাছ ধরে। শ্বেতাঙ্গদের কয়েকজন ঠিক মতই কাজ করছে। কিন্তু কয়েকজন অলসভাবে গা ছেড়ে ঘুরে বেড়ানোই পছন্দ করছে বেশি। তাদের দায়িত্বগুলো পালন করিয়ে নিচ্ছে তাদের সহকারী ইন্ডিয়ানদের দিয়ে। সবসময় যে এই করিয়ে নেয়ার সঙ্গে ন্যায় নীতিবোধ জড়িত থাকে তা নয়। যাদের সহকারী নেই তারা খাটায় স্ত্রীদের। উইলিয়ামসকে কুচিত দেখা যায় বসতিতে। আর ম্যাককয়, এক কালের পরিশ্রমী এই লোকটিকে প্রায়ই অনুপস্থিত দেখা যায় বাড়িতে।

দিনের বেশিরভাগ সময় কোথায় সে থাকে, কী করে কেউ জানে না। কেউ বিশেষ মাথাও ঘামায় না এ নিয়ে। কেবল কুইনটাল যখন বন্ধুর সঙ্গে গল্পগুজবের আগ্রহ বোধ করে তখন কোথাও তাকে না পেয়ে গজগজ করে। মেরি সন্দেহ করছে তার স্বামী তার ওপর বিরক্ত হয়ে অন্য কোথাও শান্তি খুঁজছে। তবে ওর অনুপস্থিতি মেরির মনে ঈর্ষা না জাগিয়ে এনে দিয়েছে অনাবিল এক প্রশান্তি। কারণঃ দৈনিক মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ম্যাককয় তার কাছে হয়ে উঠেছিল এক মূর্তিমান বিভীষিকা। শুধু আর মুখে চলছিল না, কারণে অকারণে হাত ব্যবহার করতে শুরু করেছিল সে। বাচ্চাদুটোকে অবলম্বন করে এখন ভালই আছে মেরি। স্বামী যদি চিরদিনের জন্যে ওর জীবন থেকে হারিয়ে যায় ও সত্যিকথা বলতে কি খুশিই হবে।

দ্বীপের পশ্চিম দিকের ঢালে সরু এক গিরিখাতে গোপনে এক পরীক্ষা চালাচ্ছে ম্যাককয়। তরুণ বয়েসে ভাটিখানায় কাজ করেছে ও শিক্ষানবীশ হিসেবে। সে সময় চোলাইয়ের কায়দাকানুন সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানার্জনের সঙ্গে মদের প্রতি এক দৃঢ়মূল আসক্তি অর্জন করে সে। আসক্তিটা দৃঢ়মূল তবে পরিমিত। কখনও বেশি পান করে না ও। নিয়মিত একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ–কমপক্ষে এক গ্লাস, বেশি হলে দু'গ্লাস–পেলেই ও খুশি। তাই যখন বাউন্টির রামের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেল ম্যাককয়-এর উচ্ছল ফুর্তিবাজ মেজাজও হারিয়ে গেল। গম্ভীর নীরব আর বিষণ্ন হয়ে পড়ল সে।

এক বিকেলে ম্যাককয় একা গিয়েছিল উইলিয়ামস-এর কামারশালায় তখনই বিদ্যুৎচমকের মত বুদ্ধিটা আসে ওর মাথায়। বড়শি বানানোর জন্যে তার বা সরু পেরেক জাতীয় কিছু খুঁজছিল ও জিনিসপত্র ওলটপালট করে। হঠাৎ চোখে পড়ে কুণ্ডলী পাকানো কয়েক গজ তামার সরু নল। কুণ্ডলী পাকানো নল! তার ওপর ঠাণ্ডা জলের প্রবাহ! ইচ্ছে করলেই ও বানিয়ে ফেলতে পারে পাতন যন্ত্র!

নলটুকু লুকিয়ে রেখে ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরল ম্যাককয়। জাহাজের তামার কেটলিটা হলে সবচেয়ে ভাল হত। কিন্তু জিনিসটা রয়েছে ক্রিশ্চিয়ানের বাড়িতে, যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা না দিয়ে ওটা হস্তগত করা সম্ভব নয়। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে বিনিময় করার জন্যে বেশ কিছু ছোট ছোট লোহার কেটলি এনেছিল ওরা, তার একটা আছে ওর কাছে। খুব ছোট ওটা, দিনে এক পাইন্টের বেশি কিছুতেই তৈরি করা যাবে না ওটা ব্যবহার করে। দিনে এক পাইন্টই বা কম কিসে? ওর একার ভাল ভাবেই চলে যাবে। একটাই অসুবিধা, প্রতিদিনেরটা প্রতিদিন বানিয়ে নিতে হবে, আর ব্যাপারটা

গোপন রাখতে হবে পুরোপুরি। ক্রিশ্চিয়ান জানতে পারলে বিপদের গন্ধ পাবে এবং তক্ষুণি বন্ধ করে দেবে ওর চোলাইখানা। ম্যাট কুইনটালকে সঙ্গে নেয়ার কথা ভাবল একবার। পরক্ষণেই উড়িয়ে দিল চিন্তাটা। মদ হাতে পেলে উন্মাদ হয়ে ওঠে কুইনটাল। দু'দিনেই সব গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাবে। কী ব্যবহার করবে? আখ খুব বেশি নেই দ্বীপে। তা ছাড়া সবাই চিবোতে পছন্দ করে ও জিনিস। সন্দেহ না জাগিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ আখ কখনোই ও জোগাড় করতে পারবে না। টি দিয়ে নয় কেন? পোড়ালে এই মূলগুলো বেশ মিষ্টি হয় খেতে। পোড়ানো টি চটকে গাঁজিয়ে চোলাই করলেই তো হয়ে যায়। প্রচুর টি পাওয়া যায় দ্বীপে। আর দু'বছরে সবারই মোটামুটি অভক্তি হয়ে গেছে এর ওপর। দৈনিক এক পাইন্ট সুরা তৈরি করার মত টি ও জোগাড় করতে পারবে অনায়াসে এবং কারও মনে কোন রকম সন্দেহ না জাগিয়েই।

এবার প্রস্তুতি শুরু হলো ম্যাককয়-এর। প্রতিদিন শুয়োর শিকারের নামে মাস্কেট কাঁধে ও বেরোতে লাগল জায়গার খোঁজে। অবশেষে পেয়ে গেল পছন্দ মত জায়গা। উইলিয়ামস-এর কুটির থেকে অনেক দূরে পশ্চিমের ঢালে, যেখানে ছাগলের পাল চরে বেড়ায় সেখানে সরু এক গিরিখাত আছে। তিন দিক থেকে ঘেরা পাথুরে দেয়াল দিয়ে। বাকি এক দিকও ঘন ঝোপের আড়ালে লুকানো। সবচেয়ে বড় সুবিধা যেটা, গিরিখাতের এক দেয়াল বেয়ে ঝির ঝির করে ঝরে পড়ছে সরু এক জলের ধারা।

সময় নষ্ট না করে আস্তে আস্তে প্রয়োজনীয় সব জিনিস এই গিরিখাতে আনতে শুরু করল ম্যাককয়। কেউ যাতে দেখে না ফেলে সেজন্যে ও এখানে আসে ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগে বা দিনের আলো নিবে যাওয়ার পর। অবশেষে কেটলি, নলের কুণ্ডলী, বেশ কিছু টি মূল, একটা ইন্ডিয়ান পাথরের শিল নোড়া–পোড়ানো টি বাটার জন্যে, একটা বড় ক্যালাবাশ আর ছোট একটা পিপে পৌঁছুল গিরিখাতটায়। তারপর একই ভাবে কারও মনে কোন সন্দেহ না জাগিয়ে আনল কয়েক বস্তা নারকেলের শুকনো মালা। এগুলো খুবই ভাল জ্বলে এবং তাপ উৎপন্ন করে, কিন্তু ধোঁয়া হয় না একটুও।

ঢালাই লোহার কেটলিটা দু'গ্যালনি। সাবধানে তিনটে পাথরের ওপর ওটা বসাল ম্যাককয়। কুণ্ডলী পাকানো তামার নলের এক প্রান্ত ঢুকিয়ে দিল ওটার নালের ভেতর। জোড়ার জায়গাটা এঁটে দিল মাটি দিয়ে। নমনীয় নলের কুণ্ডলীটার অন্য মাথা দু'ভাগ করা ক্যালাবাশটার এক দিকে ঢুকিয়ে অন্য দিক দিয়ে বের করে নিল, ভেতরে ডজনখানেক প্যাঁচ রেখে। এর পর পাথর আর কাদার একটা বাঁধ তৈরি করে ছোট্ট একটা জলাধার সৃষ্টি করল ও, যেখান থেকে ঠাণ্ডা পানি উঠিয়ে ভরে দিতে পারবে ক্যালাবাশটা। সব তৈরি হয়ে যেতে গিরিখাতের ভেতরেই একটা গর্ত করে তার ভেতরে পোড়াল অনেকগুলো টি মূল। শিলনোড়ায় বাটল সেগুলো, তারপর ছোট পিপেটায় ভরে পানি দিয়ে কিছুক্ষণ ঝাঁকিয়ে রেখে দিল।

মাসটা জানুয়ারি। আবহাওয়া এত উষ্ণ যে চোলাই শুরু করার জন্যে খুব বেশি দেরি করতে হলো না ম্যাককয়কে। প্রথম ঝাঁকানির ছত্রিশ ঘণ্টা পর পিপের ঢাকনা তুলে ও দেখল ভেতরের তরল পদার্থের ওপর জমেছে ঘন গ্যাঁজলা। মুখ আটকে

আরেকবার ঝাঁকিয়ে ম্যাককয় রেখে দিল পিপেটা। বাড়ির পথে যেতে যেতে মেরে নিল বছর খানেক বয়সের নাদুসনুদুস এক শুয়োর।

উত্তেজনায় সারারাত এক ফোঁটা ঘুমুতে পারল না ও। ভোর হওয়ার সাথে সাথে আবার রওনা হলো গিরিখাতের দিকে। পৌঁছে আগে খুলল পিপের মুখ। চমৎকার কাজ হচ্ছে। ফেনা আরও বেড়েছে। শুধু তা-ই না, পিপের চারপাশে মাটিতেও জমেছে ফেনা। আঙুলের ডগা পিপেতে ডুবিয়ে একটু স্বাদ নিল ম্যাককয়। মুখ বিকৃত করে থুতু ফেলে একটা কাঠি দিয়ে পানি আর চটকানো টি-এর মিশ্রণটুকু আরেকবার নেড়ে তার অর্ধেকটা ঢেলে দিল কেটলিতে। তারপর কেটলির নিচে নারকেলের মালার টুকরো সাজিয়ে চকমকি ঠুকে জ্বেলে দিল আগুন।

কেটলির ঢাকনাটাও ভারি ঢালাই লোহায় তৈরি এবং শক্ত করে আঁটে মুখের সাথে। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হতে পারল না ম্যাককয়। ঢাকনিটা মুখের সাথে যেখানে এঁটেছে সেখানে কাদার প্রলেপ দিয়ে দিল পুরু করে যাতে ভেতরের ভাপ শুধুই নল দিয়ে বেরোয়। নলের শেষ প্রান্তে রাখল একটা দস্তার আধ-পাইন্ট। চোলাই করা মদ ফোঁটায় ফোঁটায় পড়বে ওতে।

কিছুক্ষণের মধ্যে টগবগ করে ফুটতে লাগল কেটলির পদার্থ। ক্যালাবাশটা ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ভরে দিল ম্যাককয়। তারপর অপেক্ষা অধীর আগ্রহে। একটু পরপর আরও ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিচ্ছে ক্যালাবাশের ভেতর নলের কুণ্ডলীর ওপর। অবশেষে তামার নলের মুখে একটা বিন্দু তৈরি হলো। আস্তে আস্তে বড় হয়ে ওটা টুপ করে পড়ল আধ-পাইন্টটায়। আরেকটা ফোঁটা তৈরি হলো এবং পড়ল। তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা। দু'চোখ ভরা উত্তেজনা নিয়ে তাকিয়ে রইল ম্যাককয়।

পাত্রটায় কোন মতে ইঞ্চিখানেক তরল পদার্থ জমার পর আর অপেক্ষা করতে পারল না সে। নলমুখের নিচে একটা নারকেলের মালা পেতে দিয়ে আধ-পাইন্টটা তুলে নিল। ক্যালাবাশটায় আরেকবার ঠাণ্ডা পানি ঢেলে এবং আগুনটা একটু উস্কে দিয়ে এসে বসল একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে। পাত্রটা নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকল। তারপর ছোট্ট করে একটা চুমুক লাগাল।

মুখ চোখ বিকৃত করে সুরাটুকু ঢক করে গিলে ফেলতে বাধ্য হলো ম্যাককয়। মুখ হাঁ করে জোরে জোরে শ্বাস নিল কিছুক্ষণ।

'ওউফ! স্কটল্যান্ডের কোন হুইস্কিও এর ধারে কাছে আসতে পারবে না তেজের দিক দিয়ে! উহ! আগুন গলায় ঢেলেছি যেন!'

আরেকবার চুমুক দিল ও। এবং কাশতে কাশতে সামনে ছিটকে দিল মুখের তরলপদার্থটুকু। উঠে দাঁড়াল ম্যাককয়। 'পানি মেশাতে হবে! এত কড়া জিনিস পানি ছাড়া খাওয়া যাবে না। ওউফ! ম্যাট এর এক গ্লাস পেলে পাগলই হয়ে যেত!'

পানি মিশিয়ে আবার চুমুক দিল ম্যাককয়। এবার অনেক ভাল মনে হলো মদটা, যদিও গিলবার সময় এবারও মুখ চোখ বিকৃত করতে হলো ওকে। সারা সকাল ও চোলাই করল। সূর্য যখন মাথার ওপর উঠতে শুরু করল তখন আগুন নিবিয়ে শুয়ে পড়ল গাছের ছায়ায়। একটু পরেই নাক ডাকতে লাগল ওর।

গোপনে এই ভাবে মদ চোলাই এবং খাওয়া চলতে লাগল ম্যাককয়-এর। কেউ

কোনরকম সন্দেহ করতে পারল না। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ওর আচরণ। তবে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে কেউ পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পেত হঠাৎ করেই টি-মূলের প্রতি এক অদম্য আগ্রহ জন্ম নিয়েছে ম্যাককয়-এর। দ্বীপের সব জায়গায় কম বেশি পাওয়া যায় এই মূল, তবে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় মিলস আর মার্টিনের বাড়ির কাছে এক ফাঁকা জায়গায়। ম্যাককয় তার প্রয়োজনীয় টি ওখান থেকেই সংগ্রহ করে। ইন্ডিয়ানদের পরামর্শে জায়গাটাকে ইয়াম চাষের আওতায় আনা হয়নি যাতে ইচ্ছে বা প্রয়োজন হলেই ওখান থেকে টি সংগ্রহ করা যায়।

এক বিকেলে তার ভাঁটিখানা থেকে ফেরার সময় ম্যাককয় দেখল মার্টিন হু-কে নিয়ে কোদাল হাতে পরিষ্কার করছে জায়গাটা। মাটির তল থেকে পুষ্ট পুষ্ট সব টি-মূল তুলে বিরক্তির সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলছে দূরে। ধক করে উঠল ম্যাককয়-এর বুক।

'কী করছ কী, আইজাক?' তেড়ে গিয়ে ও গর্জন করল।

কাজ থামিয়ে সোজা হলো মার্টিন। তার সাহায্যকারীও দাঁড়াল কোদালের হাতলে ভর দিয়ে।

'এই! তুই থামলি কেন? হাত চালা ব্যাটা কুড়ের বাদশা!' চিৎকার করল মার্টিন। 'তোকে থামতে বলেছি?' ম্যাককয়-এর দিকে ফিরল ও। 'কী আবার করব? দেখতেই পাচ্ছ জমি সাফ করছি।'

'জমি সাফ করছ, গর্দভ!' আগের মতই গর্জাল ম্যাককয়। 'নাকি টিগুলোর বারোটা বাজাচ্ছ?'

'বাজালে বাজাচ্ছি! এগুলোর ওপর তোমার যতটা অধিকার আমারও ততটা! কিন্তু সেটা বড় কথা না, টি কে খায় বলো? সে জন্যেই এগুলো উপড়ে ফেলছি, ইয়ামের খেত বানাব বলে।'

'কে খায়? আমি খাই! দ্বীপে তুমি ছাড়া আরও লোক আছে! ইয়ামের খেত? সেজন্যে তো সারা দ্বীপ পড়ে আছে!'

'হ্যাঁ, বাড়ি থেকে আধমাইল দূরে। আমার মত পায়ে একটা মাস্কেটের গুলি থাকত, তাহলে আর একথা বলতে না।'

অনেক কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করল ম্যাককয়। 'শোনো, আইজাক, মিষ্টির প্রতি আমার একটু দুর্বলতা আছে। এমন দিন নেই যেদিন একটা দুটো টি আমি পুড়িয়ে খাই না। এই জমিটা তুমি নষ্ট কোরো না, আইজাক, ভাই। দ্বীপের আর কোথাও এত ভাল টি হয় না। ইয়ামের খেত তুমি অন্য কোথাও করো।'

এভাবে আরও কিছুক্ষণ বোঝানোর পর মার্টিন রাজি হলো জায়গাটা যেমন আছে তেমন রেখে দিতে। ম্যাককয় মাস্কেট তুলে নিয়ে রওনা হলো বাড়ির পথে।

সন্ধ্যায় খাওয়া দাওয়ার পর দরজার সামনে মাদুর পেতে বসেছে ও আর কুইনটাল। ওদের স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা ঘরের ভেতর ঘুমিয়ে পড়েছে। ম্যাককয় মার্টিনের সঙ্গে ওর তর্কটা নিয়ে ভাবছে। আজ হোক কাল হোক মার্টিনের চেয়ে বুদ্ধিমান কেউ জায়গাটা নিয়ে মাথা ঘামাবে। তখন ও চোলাইখানার কথা ফাঁস না করে কী করে রক্ষা করবে জমিটা?

'ম্যাট!' অবশেষে নীরবতা ভাঙল ম্যাককয়, 'জমি ভাগাভাগির কথা কখনও ভেবেছ তুমি? এখানে আমরা ইন্ডিয়ানদের মত বাস করছি–সব জমিতে সবারই ভাগ থাকছে। আমাদের সাদা মানুষদের রীতি কিন্তু এরকম নয়।'

মাথা ঝাঁকাল কুইনটাল।

'আমি যখন এক টুকরো জমি পরিষ্কার করি,' ম্যাককয় বলে চলল, 'এবং ইয়াম বা কাঁচকলা বা যা খুশি লাগাই, আমার ভাবতে ভাল লাগে ওটা আমার–একান্তই আমার, এবং যখন আমি থাকব না তখন হবে আমার সারাহ এবং ড্যান-এর। তোমাকেও ভাবতে হবে বাচ্চা ম্যাটের কথা। তাছাড়া আরও ছেলে পুলে হবে না আমাদের, কে বলতে পারে?'

'হ্যাঁ,' বলল কুইনটাল, 'এ ব্যাপারে আমি একমত তোমার সাথে।'

'প্রত্যেকটা মানুষকে তার নিজের মত করে চলতে দেয়া ভাল না? তোমার ইয়াম,পছন্দ তোমার জমিতে তুমি তা-ই লাগাও; আমার পছন্দ টারো, আমি টারো লাগাব; আর কারও যদি অন্য কিছু পছন্দ হয়, সে তা-ই লাগাবে। শুধু স্কটরা নয়, আমার মনে হয়, ইংরেজরাও এ ভাবেই ভাবে।'

ম্যাককয়-এর মতামতকে সব সময়ই মূল্য দেয় কুইনটাল। 'হ্যাঁ, উইল,' ও বলল, 'সত্যিই ভাগ হয়ে যাওয়া দরকার জমিগুলো। আমাদের ন'জনের ভেতর ভাগ হলে একেক জনের ভাগে কম পড়বে না। পশ্চিম দিকটা আমরা এজমালি রাখতে পারি ছাগল চরার জন্যে।'

'ন'জন! ইন্ডিয়ানদের কী হবে তাহলে?'

'ওদের কথা না ভাবলেও চলবে,' ঘৃণাভরে বলল কুইনটাল। 'জমি দিলে ওরা আর আমাদের জন্যে খাটবে না।'

চকিতে একবার বন্ধুর দিকে তাকাল ম্যাককয়। 'ম্যাট! দেখে যত মনে হয় আসলে তত বোকা নও তুমি! হ্যাঁ···তোমার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু ওদের দাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়া আমাদের উচিত হবে কিনা, ভেবে দেখতে হবে।'

কুইনটালের সাথে ম্যাককয়-এর আলাপের প্রায় পক্ষকাল পর এক সকালে টারারু মাছ ধরছে সাগরতীরে বসে।

মিনারীর ভাগ্নে টারারু। তাহিতির অভিজাত সমাজে জন্ম হলেও ওর ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা মোটেই অভিজাতসুলভ নয়। শারীরিক দিক থেকে দুর্বলই বলা যায় ওকে। ছোটখাট গড়ন। চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার চেয়ে ধূর্ততাই বেশি। স্বভাব অলস। পুরুষের চেয়ে নারীর সান্নিধ্য ওর বেশি প্রিয়। বেশিরভাগ সময় একা একা মাছ ধরে কাটায়। ফলে পরিশ্রমের কাজগুলোয় অনুপস্থিত থাকার চমৎকার অজুহাত খাড়া করতে পারে। নৌকা নিয়ে উপকূল থেকে দূরে গিয়ে মাছ ধরাটাও ওর বেশ আয়াসসাধ্য মনে হয়। সবাই ঠাট্টা-মস্করা, টিটকারি-টিপ্পনি কাটলেও ও তীরে বসে বড়শি দিয়েই মাছ ধরে। এ দিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

দীর্ঘ সময় বসে থেকে মোটে কয়েকটা মাছ ধরেছে ও। অনেকক্ষণ যাবৎ আর কোন ঠোকর অনুভব করছে না টোপ-এ। শেষে বিরক্ত হয়ে কোমর থেকে ছুরি বের করে একটা পাথর তুলে নিয়ে শান দিতে লাগল ঘষে ঘষে। এই সময়:

'টারারু! ও টারারু!'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে আসছে হু।

'কী হয়েছে রে?' জিজ্ঞেস করল টারারু।

হু-ও টারারুর মত ছোটখাট গড়নের মানুষ। অতি সাধারণ ঘরে জন্ম। বংশ পরম্পরায় ওরা মিনারীদের বাড়িতে কাজ করে আসছে। টারারুর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পেটের এক পাশ চেপে ধরে একটা গোঙানির মত আওয়াজ করল সে। তারপর জলের কিনারে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে সাগর থেকে পানি তুলে ধুতে লাগল পেটের পাশটা।

'কী ব্যাপার, ব্যথা পেয়েছিস নাকি?' জিজ্ঞেস করল টারারু। 'পড়ে গেছিলি পাহাড় থেকে?'

'না,' জবাব দিল হু। 'মার্টিন আবার।'

'মেরেছে তোকে?'

'হ্যাঁ।...লাঠি দিয়ে।'

'কী করেছিলি তুই?'

'কী করে বলব? আমি যতই খাটি, ওর মন ভরে না। আজ দু'জনে গেছিলাম ইয়াম ক্ষেতে। ও ছায়ায় বসে আরাম করছিল আর আমাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছিল। যা বলছিল তা-ই করছিলাম তবু কথায় কথায় গাল দিচ্ছিল আমাকে। যে সব গর্ত করছিলাম সেগুলো নাকি বেশি গভীর হয়ে যাচ্ছিল নয়তো একদম গভীর হচ্ছিল না; বীজ ইয়ামগুলো কাটা নাকি বেশি ছোট হয়ে যাচ্ছিল। এই সব শেষে বিরক্ত হয়ে বললাম, আমি তোমার আর মিনারীর লোক, মার্টিনের দাস নই যে যা খুশি তাই বলবে। বলতেই ও আমাকে মারল।'

পেটের ওপর হাতটা ওর কাঁপতে লাগল রাগে। নিশ্বাস পড়তে লাগল ফোঁস ফোঁস করে। 'কী করব আমি? তোমরা আমাকে বাঁচাবে না—তুমি, মিনারী?'

মুখ নিচু করে একটু ভাবল টারারু। বলল, 'একটাই পথ আছে। ব্যাপারটা আমি মিনারীকে জানাতে চাই না। ও বড় একরোখা, রেগেমেগে কী করে বসবে কেউ জানে না। আর একবার যদি সাদাদের সঙ্গে গোলমাল বাধে, ওরা ওদের মাস্কেট দিয়ে আমাদের সবক'টাকে গুলি করে মেরে ফেলবে। এত ঝুট ঝামেলার ভেতর না গিয়ে মার্টিনকে মেরে ফেল তুই; এমন ভাবে যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে।

'মিয়া আউ রোয়া!' চকচকে চোখে বলল হু। 'কিন্তু কী ভাবে?'

পাশে নিজের ধরা মাছগুলোর দিকে হাত বাড়াল টারারু। ফুট খানেক লম্বা, ছোট মুখ আর চারকোনা শরীরের সাদাকালো ডোরাকাটা অদ্ভুত দর্শন একটা মাছ তুলে নিয়ে বাড়িয়ে দিল হু-এর দিকে।

'এটা দিয়ে,' বলল সে।

'হুয়ে হুয়ে!' বলল হু। 'শুনেছি এ মাছে বিষ আছে।'

'হ্যাঁ, মাছটা খুবই সুস্বাদু যদি পিত্তথলিটা বের করে নেয়া হয় সম্পূর্ণ। এর পিত্তের কোন রঙ নেই, কটু কোন স্বাদও নেই। তবু মাত্র চার ফোঁটাই যথেষ্ট একজন মানুষকে শেষ করে দেয়ার জন্যে। পিত্তটা বের করে নিয়ে একটু ইয়াম বা পায়েসের

ওপর ছড়িয়ে খেতে দে মার্টিনকে। সূর্য ডোবার আগেই ব্যাটার আর খোঁজ পাওয়া যাবে না।'

মাথা নাড়ল হু। 'না, বিষ দেয়া দেইর কাজ ওঝা আর বুড়ি মেয়েলোকদের ওপরই থাক। অন্য কোন উপায় থাকলে বলো।'

কাঁধ ঝাঁকাল টারারু। হু বলে চলল, 'দক্ষিণের চূড়ায় করা যেতে পারে কাজটা। বিকেলে মার্টিন ওর সাথে যেতে বলেছে আমাকে দড়ির কাছে। পাখিরা ডিম পাড়তে শুরু করেছে।'

হ্যাঁ না কিছু বলল না টারারু।

মাঝ বিকেলের দিকে মার্টিন আর স্মিথ রওনা হলো দক্ষিণের চূড়ার দিকে। দু'জনেরই হাতে ডিম আনার ঝুড়ি আর এক কুণ্ডলী করে রশি। ইন্ডিয়ানদের বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখল হু দাঁড়িয়ে আছে ওদের সাথে যাওয়ার জন্যে স্মিথের নেতৃত্বে উঠে চলল ওরা পাহাড়ের গা বেয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেল চূড়ায়। সামনে কয়েকশো ফুট নিচে পড়ে আছে দক্ষিণের অর্ধচন্দ্রাকার ছোট্ট উপসাগরটার পাথুরে উপকূল।

আগে থাকতে ঝুলানো আছে যে রশিটা সেটার ওপর নির্ভর করল না স্মিথ। দু'বছর ধরে আছে ওটা ওখানে, এতদিনে পচে যাওয়ারই কথা। নিজের কাঁধ থেকে রশির কুণ্ডলীটা নামিয়ে এক প্রান্ত শক্ত করে বাঁধল একটা বড় প্যানডানাস গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। তারপর কুণ্ডলীটা ছেড়ে দিল নিচে। দড়ি ধরে পাহাড়ের খাড়া গায়ে পা ঠেকিয়ে নামতে শুরু করল । ডিমের ঝুড়িটা বেঁধে নিয়েছে কোমরে। গজ ত্রিশেক দূরে আরেকটা গাছের সাথে মার্টিন বাঁধছে তার রশিটা। ও নিজে নামবে না, নামাবে হু-কে। নিজে নামার মত বুকের পাটা ওর নয়।

শক্ত করে রশি ধরে একটু একটু করে নেমে চলেছে স্মিথ। প্রায় পঞ্চাশ ফুট নামার পর বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা এক চিলতে একটা পাথরের ওপর দাঁড়াল ও। এক মুহূর্ত বিশ্রাম নিয়ে এপাশে ওপাশে তাকিয়ে দেখল নাগালের মধ্যে দুটো পাখির বাসা রয়েছে। বেশ কয়েকটা করে ডিম দুটো বাসাতেই। এক হাতে দড়ি ধরে থেকে অন্য হাতে ডিমগুলো ঝুড়িতে তুলে নিল ও। আবার নামতে শুরু করবে এই সময় ওপর থেকে ভেসে এল মার্টিনের ক্রুদ্ধ গর্জন। কয়েক সেকেন্ড কান খাড়া করে শুনল স্মিথ। তারপর প্রাণপণে যত দ্রুত সম্ভব উঠতে শুরু করল রশি ধরে। চূড়ায় পৌঁছে আগে ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে ও উঠে এল ওপরে। তারপর ছুটল মার্টিনের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে।

'খুন করতে চেয়েছিলি আমাকে?' সর্বশক্তিতে একটা লাথি হাঁকাল মার্টিন। কুঁকড়ে পড়ে থাকা হু-এর পাঁজর লক্ষ্য করে 'ব্যাটা বেজন্মা ইন্ডিয়ানের বাচ্চা!' আরেকটা লাথি চালাল মার্টিন। 'তোকেই আজ খুন করে ফেলব!' আরেকটা লাথি।

শেষ লাথিটা হু-এর দেহ স্পর্শ করতে পারল না। তার আগেই স্মিথ মার্টিনকে বয়ে এনেছে কাঁধ ধরে।

'বেজন্মার বাচ্চা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছিল আমাকে!' নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে চেঁচাল মার্টিন। কিন্তু স্মিথের শক্ত হাতের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল না

ক্রোধ।

'থামো, আইজাক!' নির্দেশ দিল স্মিথ। তারপর তাকাল মাটিতে পড়ে থাকা রক্তাক্ত লোকটার দিকে। 'সত্যি বলছে ও?'

'হ্যাঁ,' গোঙানির মত বেরোল হু-র গলা দিয়ে, 'সত্যি।'

এই সময় মার্টিন ছাড়িয়ে নিতে পারল নিজেকে। লাফ দিয়ে গিয়ে আরেকটা লাথি তুলল হু-র দিকে। কিন্তু ও যত জোরে লাফ দিয়েছে তার চেয়ে জোরে লাফ দিয়েছে স্মিথ। লাথিটা হু-র গায়ে লাগার আগেই আবার মার্টিন ধরা পড়ল স্মিথের হাতে।

'না, না, আইজাক, আর চলবে না এসব!' বলল স্মিথ।

'ছেড়ে দাও, আলেক্স!' চেঁচাল মার্টিন। 'ছেড়ে দাও আমাকে! বদমাশের বাচ্চার কত বড় সাহস আজ আমি দেখে নেব! আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চায়!'

'তুমি কি ভাবো আমি অন্ধ, আইজাক? একাজ করতে তুমিই ওকে উস্কানি দিয়েছ!'

মার্টিনকে ছেড়ে দিয়ে হু আর তার মাঝখানে দাঁড়াল স্মিথ। রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারাল মার্টিন। দু'হাত মুঠো পাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল:

'সরে দাঁড়াও! সরে দাঁড়াও, আলেক্স! নয়তো তোমারই চেহারা আমি পাল্টে দেব আজ!'

'চেষ্টা করে দেখতে পারো,' বলল স্মিথ। ওর মুখ থেকে কথাটা পড়তেও পারেনি, লাফ দিল মার্টিন। ভয়ঙ্কর এক ঘুসি চালাল স্মিথের বুক লক্ষ্য করে। ঘুসিটা খেয়ে একটু টললও না স্মিথের শরীর। দু'হাত উঁচু করে মাথা নুইয়ে ও ধরল মার্টিনকে। দু'মিনিট পরে যখন লড়াই শেষ হলো, দেখা গেল রক্তাক্ত একটা চোয়াল আর প্রায় অবশ কাঁধ নিয়ে পড়ে আছে মার্টিন। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে মুখ হাঁ করে। বেশ কয়েক মিনিট পর ও যখন কোন মতে উঠে বসল স্মিথ বলল:

'ব্যাপারটা আমরা কারও কাছে প্রকাশ করব না···সেটাই ভাল হবে। একটা কথা মনে রেখো, আইজাক; আর কখনও যদি দেখি এই লোকটাকে তুমি মারপিট বা গালমন্দ করছ, তোমার কপালে দুঃখ আছে। আর, হু,–যদিও তোমাকে খুব বেশি দোষ আমি দিতে পারছি না তবু–মনে রেখো, তোমার এই খুনোখুনি বুদ্ধি যেন আর না দেখি! আর এখানে যা ঘটল সে ব্যাপারে মুখ বুজে থাকলেই আমি খুশি হব!

নয়

১৭৯২-এর এক শান্ত ফেব্রুয়ারি রাত আকাশ মেঘশূন্য। একটু আগে ওঠা চাঁদ এখনও সাগর ছেড়ে বেশিদূর ওঠেনি। খাওয়া দাওয়ার পর বাড়ির সামনে ঘাসে ঢাওয়া ছোট্ট উঠানটায় বসেছে ইন্ডিয়ানরা। ফিসফিস করে আলাপ করছে ওরা মাঝে মাঝে মেয়েদের কারও মৃদু হাসি শোনা যাচ্ছে। মিনারী নীরবে শুয়ে আছে মাথার নিচে হাত দিয়ে। টারারু একাই কেবল দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে, কিছুক্ষণ

পর পর মুখ তুলে তাকাচ্ছে পথের দিকে। নানা বিষয়ে আলাপ করলেও প্রত্যেকের মনে কাজ করছে একটা চিন্তা—হুটিয়া এখনও ফেরেনি।

আর সবার মত টারারুও অনেক দিন ধরেই জানে দিনের অতটা সময় কোথায় কাটায় মেয়েটা। তবে এ পর্যন্ত সে যা করার সাবধানে স্বামীর আত্মসম্মানে কোন রকম ঘা না দিয়েই করেছে। কিন্তু আজ উইলিয়ামস-এর প্রতি উদগ্র আকর্ষণ ওর সব ভয় সব শালীনতাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। মাথাটা সামান্য কাত করে মিনারী দেখল, টারারু চলে গেছে। উঠে বসল সে। একমুহূর্ত ভাবল কী যেন। তারপর আবার শুয়ে পড়ল। ঠোঁট দুটো চেপে বসেছে একটার সাথে আরেকটা।

চাঁদ বেশ খানিকটা উঠে এসেছে। উইলিয়ামস-এর নিঃসঙ্গ কুটিরটা চকচক করছে জ্যোৎস্নায়। কুটিরের পাশে একটা ঝোপ নড়ে উঠল একটু। মুহূর্ত পরে ঝোপটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল টারারু। পা টিপে টিপে খোলা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কান খাড়া করে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর উঁকি দিল ভেতরে। টারারু দেখল, দরজার ঠিক ওপাশে মাদুরের ওপর ঘুমিয়ে আছে তার স্ত্রী। উইলিয়ামস-এর পেশল একটা বাহু তার মাথার নিচে। উইলিয়ামসকে ভয় পায় টারারু। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে সে ভয় চাপা পড়ে গেল ক্রোধের নিচে। তারপর আবার ফিরে এল ভয়। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না টারারু। মুহ্যমানের মত বসে রইল কয়েক সেকেন্ড। হুটিয়ার ছোট অনাবৃত পা দুটো দরজার খুব কাছেই। কাঁপা কাঁপা একটা হাত বাড়িয়ে টারারু স্পর্শ করল একটা পা। মৃদু নাড়া দিল। ঘুমের ঘোরে অস্ফুট স্বরে একটু বিড় বিড় করে উঠল হুটিয়া। এরপর আর মৃদু নাড়া নয় শক্ত হাতে পা-টা ধরে টানল টারারু। চোখ মেলল হুটিয়া।

'বাইরে আয়!' হিংস্র ভঙ্গিতে ফিসফিস করল টারারু।

উইলিয়ামস উঠে বসল। 'তুমি কী চাও?' গর্জে উঠল সে।

'আমার মেয়েমানুষ!' ক্রোধকম্পিত স্বরে উচ্চারণ করল টারারু। 'আমার মেয়েমানুষ! বদমাশ সাদা কুত্তা!'

তড়াক করে উঠে বসল কামার। দু'হাতের মুঠি পাকানো। টারারুর মুখের এক ইঞ্চির ভেতর নিয়ে গেল সে তার দাড়িওয়ালা থুতনিটা। 'ও এখন আমার মেয়েমানুষ! যাও ভাগো!'

উইলিমাস-এর মুখটা এমন কঠোর, এমন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে যে চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো টারারু। কিন্তু তার আভিজাত্য তাকে বাধা দিতে লাগল মার্টিনের নির্দেশ মেনে নিতে। গোঁজ হয়ে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে ধীরে ধীরে উঠে ঘুরে দাঁড়াল সে। ঠিক সেই সময় কামারের বলিষ্ঠ পায়ের লাথি লাগল তার পাছায়। হুমড়ি খেয়ে চার হাত পা ছড়িয়ে পড়ে গেল টারারু। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল আবার।

'এবার যাবি তুই?' চিবিয়ে চিবিয়ে প্রশ্ন করল উইলিয়ামস।

দাঁতে দাঁত চেপে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চন্দ্রালোকিত উপত্যকার দিকে রওনা হয়ে গেল টারারু।

সবাই ঘুমানোর জন্যে ঘরের ভেতর চলে গেলেও মিনারী শুয়ে আছে তেমনি। টারারুর সাড়া পেয়ে উঠে বসল। নির্বিকার মুখে শুনে গেল এক রাশ রুদ্ধশ্বাস ফিসফিসানি। টারারু যখন চুপ করল ঘৃণাসূচক একটা মৃদু গর্জন ছাড়া আর কিছু বেরোল না মিনারীর গলা দিয়ে।

'নিজেকে তুই পুরুষ বলিস!' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মিনারী বলল। 'আমার কাছে এসেছিস তোর মেয়েমানুষের কেচ্ছা শোনাতে! আটিরা! মেয়েটাকে যদি চাস, কেন জাগিয়ে বাড়িতে নিয়ে এলি না?'

ইতস্তত করল একটু টারারু। 'জাগিয়েছিলাম। কিন্তু উইলিয়ামসও জেগে গেল–লাথি মেরে ফেলে দিল···।'

মিনারীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর থামিয়ে দিল ওকে। 'তুই যদি আমার বোনের ছেলে না হতিস···।' উঠে দাঁড়াল মিনারী, মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ। 'টিহে! এমন নোংরা ব্যাপারে হাত দিতে হবে আমাকে!···দাঁড়া এখানে; নরম কথায় কাজ হলেও হতে পারে। যদি না হয়···।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে দ্রুত পায়ে।

রাতটা উষ্ণ। আলেকজান্ডার স্মিথ কাজ করছে বাড়ির সামনের ছোট্ট বাগানটায়। ইয়ং আর টাউরুয়া সন্ধ্যা লাগতেই শুয়ে পড়েছে। বলহাদি স্বামীকে সাহায্য করছে আগের দিন লাগানো কয়েকটা ফার্ন গাছে পানি দেয়ায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম ঘুম ভাব পেয়ে বসল ওকে। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল বলহাদি। স্মিথ কাজ করতে লাগল। আগের দিন সকালে ও মাছ ধরতে গেছিল তেতাহিতির সাথে, বিকেলে লম্বা ঘুম লাগিয়েছে; সেজন্য এখন আর ঘুম আসছে না ওর।

চাঁদ প্রায় মাথার ওপর চলে এসেছে। কাজ শেষ করে উঠল স্মিথ। এখনও ঘুমের লেশ মাত্র নেই ওর চোখে। পথের পাশের বেঞ্চটায় গিয়ে বসল। হঠাৎ পায়ের আওয়াজ পেয়ে চোখ তুলল সে। মিনারী এগিয়ে আসছে দুপদাপ পা ফেলে। পেছন পেছন আসছে হুটিয়া। মাথা নিচু। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। স্মিথকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল মিনারী।

'ভাল হলো, তুমি জেগে আছ, আলেক্স,' বলল সে। 'ঝামেলা হয়েছে একটা–এই ঝামেলাই গুরুতর ঘটনার দিকে মোড় নিতে পারে।'

'কী হয়েছে, মিনারী?' স্মিথ জিজ্ঞেস করল

বলে গেল মিনারী। সব শুনে স্মিথ আবার জিজ্ঞেস করল, 'উইলিয়ামস কোথায় এখন?'

'ওর ঘরের মেঝেতে,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল মিনারী। 'মরদের মত লড়েছে।··· দেখ!' নিজের চোয়ালে বড়সড় একটা কালো দাগ দেখাল ও।

কথা বলার আগে এক মুহূর্ত ভাবল স্মিথ। 'এক্ষুণি মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানকে জানাতে হবে ব্যাপারটা। একমাত্র উনিই এখন সামাল দিতে পারবেন এটা। তুমি দাঁড়াও এখানে, আমি উঠিয়ে আনছি ওঁকে।'

একটা হিবিসকাস গাছের গোড়ায় পিঠ ঠেকিয়ে বসল মিনারী। হুটিয়া মাথা নিচু করে জড়সড় হয়ে বসে রইল পাশে। একটু পরে হঠাৎ খপ করে মেয়েটার বাহু

আঁকড়ে ধরল মিনারী। গাছের ছায়ায় লুকিয়ে ওরা দেখল মিলস-এর বাড়ির দিকে যাচ্ছে কামার।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেশ কষ্ট করে হাঁটছে উইলিয়ামস। একটু পরপরই থামছে মুখ ভর্তি রক্ত থু করে ফেলার জন্যে। মিলসকে জাগিয়ে দু'জনে ম্যাককয়-এর বাড়ির দিকে চলল।

'ব্যাটার গায়ে এত জোর আমার ধারণা ছিল না,' বলল উইলিয়ামস। 'তুমি আর ম্যাট থাকলে বদমাশটাকে আমরা শেষ করে দিতে পারতাম।'

সহানুভূতিসূচক একটা শব্দ করল মিলস। 'এসে গেছি,' বলল সে। 'তুমি দাঁড়াও, আমি ডেকে আনছি ওদের।'

'কোথায় ওরা এখন?' বাইরে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল কুইনটাল।

'ইন্ডিয়ান বাড়িতে, আমার মনে হয়।'

'তোমরা যা করছ এর শেষ হবে লড়াইয়ে।' বলল ম্যাককয়। 'তুমি একটা চীজ বটে, জ্যাক! সপ্তার সাতটা দিন তুমি মেয়েটাকে পাচ্ছ, শুধু রাতে পাশে নিয়ে ঘুমাতে পারছ না বলে সারা দ্বীপের শান্তি ভঙ্গ করবে?'

'তোমার তাহলে আসার দরকার নেই,' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল উইলিয়ামস। 'এসো, মিলস, কুইনটাল, মাস্কেট নিয়ে আসি আমরা।'

'অত চটছ কেন, জ্যাক?' বলল ম্যাককয়। 'আমরা সবাই তোমাকে সাহায্য করব; তবে কাজটা ভাল হচ্ছে না তাতে সন্দেহ নেই।'

'এস্পার ওস্পার যা করার আজই করে ফেলতে হবে,' বলল মিলস। 'হারামী ইন্ডিয়ানগুলোকে বুঝিয়ে দিতে হবে কোনটা তাদের জায়গা।...কারা আসছে?'

জ্যোৎস্না ধোয়া পথ ধরে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে ক্রিশ্চিয়ান। পেছনে স্মিথ আর মিনারী। ওদের পেছনে হুটিয়া। পুরুষদের সঙ্গে তাল রাখার জন্যে প্রায় দৌড়াতে হচ্ছে ওকে। ইচ্ছে করলেই পথের পাশের কোন ঝোপে ঢুকে পালাতে পারে ও, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না।

উইলিয়ামস মিলস-এর প্রশ্ন 'কারা আসছে?' শুনে হিংস্র ভঙ্গিতে এগোল এক পা। পর মুহূর্তে থেমে দাঁড়াল ক্রিশ্চিয়ানকে দেখে।

'কী হচ্ছে এসব?' কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করল ক্রিশ্চিয়ান।

'কাল রাতে আমি মন ঠিক করে ফেলেছি, স্যার,' আনুগত্য আর অবাধ্যতা মিশেল দেয়া এক অদ্ভুত কণ্ঠে জবাব দিল উইলিয়ামস। 'হুটিয়াকে আমি বলেছি ওর ইন্ডিয়ান স্বামীকে ছেড়ে চিরদিনের জন্যে আমার কাছে চলে আসতে। ও তা-ই এসেছিল। আজ সন্ধ্যায় আমরা যখন ঘুমিয়েছিলাম টারারু এসে ওকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আমি জেগে উঠে ওকে লাথি মেরে বের করে দিয়েছি। একটু পরে আসে মিনারী।' থু করে এক মুখ রক্ত ফেলল সে। 'আমার চেয়ে ওর শক্তি বেশি। আমাকে পিটিয়ে রেখে হুটিয়াকে নিয়ে চলে আসে ও। এখন বলুন, বন্ধুদের সাহায্য চাওয়া ছাড়া আর কী করার আছে আমার?'

মাথা উঁচিয়ে উন্মুক্ত বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে মিনারী।

ক্রিশ্চিয়ান ফিরল ওর দিকে। 'উইলিয়ামস যা বলল···'

'ও মিথ্যে বলেনি,' ক্রিশ্চিয়ান শেষ করার আগেই জবাব দিল মিনারী।

হুটিয়া আবার মাথা নিচু করে জড়সড় হয়ে বসেছে। বিতৃষ্ণার সঙ্গে তার দিকে তাকাল ক্রিশ্চিয়ান।

'নষ্ট একটা মেয়েমানুষ আর পৌরুষহীন দুটো পুরুষের জন্যে দ্বীপের শান্তি নষ্ট হবে?'

'ভাল বলেছ!' বলল মিনারী। 'তোমার সঙ্গে আমি একমত। তাই বলে আমার বোনের ছেলে সবার সামনে অপমানিত হবে, সাধারণ একজনের কাছে–হোক না সে সাদা–গালাগালি, লাথি খাবে, আর আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকব, এ হতে পারে না।'

'তাহলে যাও, টারারুকে নিয়ে এসো এক্ষুণি।'

মিনারী চলে গেল তার বাড়ির দিকে। চার বিদ্রোহীর দিকে ফিরল ক্রিশ্চিয়ান।

'এখন এবং এখানে আমি ব্যাপারটার ফয়সালা করতে যাচ্ছি। যার সাথে থাকতে চায় তাকে বেছে নেবে মেয়েটা। এবং এ নিয়ে পরে আর কোন ঝামেলা কেউ করতে পারবে না। আশা করি আমার পরিষ্কার কথা বুঝতে অসুবিধা হয়নি তোমাদের।'

'আমি আছি আপনার সঙ্গে, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান!' বলল ম্যাককয়।

'হ্যাঁ,' বিড় বিড় করল কুইনটাল। 'এছাড়া সমাধানের আর কোন উপায় নেই।'

ভাগ্নেকে নিয়ে মিনারী ফেরার পর আবার কথা বলল ক্রিশ্চিয়ান।

'টারারু,' বলল সে, 'সামনে এসো! তোমাদের দু'জনের ভেতর থেকে পছন্দমত পুরুষ বেছে নেবে মেয়েটা। যাকে ও প্রত্যাখ্যান করবে সে আর কোনদিন দ্বীপের শান্তি ভঙ্গ করতে পারবে না।'

'সামনে এসো, উইলিয়ামস,' বলে চলল ক্রিশ্চিয়ান। 'মিনারী, মেয়েটাকে বলো, ও বেছে নেবে তার পছন্দ মত পুরুষকে এবং বাকি জীবন তাকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে।'

মেয়েটা এখনও আগের ভঙ্গিতে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। মিনারী ওর সামনে গিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে কিছুক্ষণ কথা বলল স্থানীয় ভাষায়। তারপর হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিল তাকে। মুখ নিচু করে, তবে কোন রকম দ্বিধা ছাড়াই, সে হেঁটে গেল উইলিয়ামস-এর কাছে, আঁকড়ে ধরল তার বাহু।

শরৎ এল কড়া পশ্চিমা বাতাস সেই সাথে প্রবল বর্ষণ নিয়ে। এপ্রিলের শুরুতে হঠাৎ করে আবহাওয়া এত শীতল হয়ে উঠল যে পিটকেয়ার্নবাসীরা ঘরেই কাটাতে লাগল বেশিরভাগ সময়।

এই এপ্রিলেরই এক ভোরে তার সদ্য ঘুম থেকে ওঠা বাচ্চা কোলে নিয়ে ঘরের বাইরে এসেছে প্রুডেন্স। দেরিতে হলেও প্রৌঢ় মিলস একটা বাচ্চা উপহার দিতে পেরেছে ওকে। সামান্য ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ছাড়া আকাশ পরিষ্কার। লম্বা একটা শ্বাস টেনে মাথা পেছনে ছুঁড়ে কাঁধের ওপর থেকে চুলের বোঝা সরাল প্রুডেন্স। কেঁদে উঠল ছোট্ট এলিজা। ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল প্রুডেন্স। রান্নাঘরের সামনে

ঝোলানো রয়েছে মিলস-এর বানানো একটা খটখটে দোলনা। সাবধানে সেটায় মেয়েকে নামিয়ে রাখতে রাখতে ও বলল:

'চুপ করে শুয়ে থাকো একটু! এক্ষুণি তোমার খাবার পাবে।'

যেন মায়ের কথা বুঝতে পেরেই কান্না বন্ধ করে হাত পা নাড়তে লাগল বাচ্চাটা। রান্নাঘরে ঢুকে আগুন জ্বালল প্রুডেন্স। পানির পিপে থেকে একটা কেটলি ভরে নিয়ে বসিয়ে দিল আগুনের ওপর। তারপর বাইরে এসে তুলে নিল মেয়েকে। নারকেল কোরানোর টুলটায় বসে স্তন উন্মুক্ত করে বাচ্চাকে লোভ দেখাল তার মুখ কয়েকবার স্তনের কাছে এনে আবার দূরে নিয়ে। অবশেষে সত্যিই যখন স্তন দিল তখন বাচ্চা লোভীর মত চুষতে লাগল সেটা। কেটলির পানি ফুটতে শুরু করার আগেই চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে এল তার। একটু পরে প্রুডেন্স আবার যখন তাকে দোলনায় নামিয়ে রাখল তখন সে তলিয়ে গেছে গভীর ঘুমে।

কয়েকটা ডিম আর চালে ঝোলানো একটা ঝুড়ি থেকে আধ ডজন কাঁচকলা নিয়ে ফুটন্ত পানিতে ছেড়ে দিল প্রুডেন্স। আরেকটা ঝুড়ি থেকে পাড়ল আগের দিন রান্না করে রাখা একটা রুটিফল। এই সময় বাইরে জলের পিপের কাছে মিলস-এর সাড়া পেল ও। হাত মুখ ধুয়ে রান্না ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল মিলস। দোলনার ওপর ঝুঁকে ঘুমন্ত মেয়ের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিল।

'কী আরামের জীবন তোমার, বাচ্চা,' ফিসফিস করে বলল সে। 'খাওয়া আর ঘুমানো, আর কোন কাজ নেই।'

একটু পরেই খাওয়া শেষ করে মাস্কেট কাঁধে বেরিয়ে গেল মিলস। আজ ও একটা শুয়োর মারতে চায়। মিলস বেরিয়ে যাওয়ার পর খাওয়া সারল প্রুডেন্স। তারপর মেয়ে কোলে মাদুর পেতে বসল কামারশালার কাছে অশ্বত্থ গাছটার নিচে। মিলস-এর জন্যে একটা হ্যাট বুনছে ও। সেটা বুনতে লাগল।

পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলে প্রুডেন্স দেখল, টারারু আসছে। কাঁধে কুঠার। উইলিয়ামস-এর সঙ্গে গণ্ডগোলটার পর ওর দিকে কৃচিৎ তাকিয়েছে প্রুডেন্স। টারারুও মেয়েদের সঙ্গে চলাচলি, ফিসফিসানি একদম বন্ধ করে দিয়েছে। দিনের বেশির ভাগ সময় ও বনে কাটায়। প্রুডেন্সের সাথে চোখাচোখি হতেই চেষ্টা করে একটু হাসল টারারু। দেখা হলে কিছু না কিছু কথা বলা পলিনেশীয় সমাজের সাধারণ ভদ্রতা। তাই সে জিজ্ঞেস করল, 'মিলস কোথায়?'

'শুয়োর মারতে গেছে,' জবাব দিল প্রুডেন্স।

বাউন্টির শান দেয়ার পাথরটা রাখা হয়েছে কামারশালার সামনে, যাতে প্রয়োজন মত সবাই সেটা ব্যবহার করতে পারে। পাথরটার সামনে বসে টারারু শান দিতে লাগল কুঠারের ফলায়। প্রুডেন্স মন দিল তার কাজে। একটু পরপরই চোখের কোণ দিয়ে দেখছে টারারুকে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে মন দিয়ে কুঠারের ফলা শান-পাথরের সাথে ঘষল টারারু। মাঝে মাঝে বুড়ো আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করল ধার। অবশেষে সন্তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল।

ওর আচরণ রীতিমত অস্বাভাবিক মনে হলো প্রুডেন্সের কাছে। এত মন দিয়ে এত সময় নিয়ে কুঠার ধার করার লোক টারারু নয়। ওর মত অলস লোক সারা দ্বীপে আর নেই।

'এত ধারাল কুঠার আমি আর দেখিনি,' মন্তব্য করল প্রুডেন্স। 'কী করবে ওটা দিয়ে?'

একটু ইতস্তত করে জবাব দিল টারারু। 'কাল একটা পুরাউ গাছ দেখেছি; লম্বা, সোজা আর মোটা। ভাবছি ওটা কেটে একটা ক্যানো বানাব।'

চলে গেল টারারু কুঠার কাঁধে ফেলে। এদিকে প্রুডেন্সের মাথায় চিন্তা চলছে। একশ্রেণীর ছুতোর মিস্ত্রীই কেবল ক্যানো তৈরি করে তাহিতিতে। তাদের বলা হয় তাহুআ। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ–এমন কি গোত্রপতি পর্যন্ত যোগ দিতে পারে এ কাজে। মিনারী দক্ষ এ ব্যাপারে। কিন্তু টারারু ক্যানো বানানোর কৌশল একটা দশ বছরের বাচ্চা যতটুকু জানে ততটুকুও জানে কিনা সন্দেহ। তাহলে ও মিথ্যে বলল কেন?

লোকটা চোখের আড়াল হতেই উঠে দাঁড়াল প্রুডেন্স। ঘরে ঢুকে টাপার একটা চাদর মত কাঁধের ওপর ফেলে বাচ্চাকে ভাল মত কাপড় দিয়ে মুড়ে রওনা হলো স্মিথের বাড়ি, ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ি ছাড়িয়ে গোট-হাউস পাহাড়ের দিকে। আধ ঘণ্টা পর ওকে দেখা গেল উইলিয়ামস-এর কুটিরের কাছে।

দরজা থেকে খানিকটা দূরে থাকতেই দাঁড়িয়ে পড়ল প্রুডেন্স। সুর করে মৃদু একটা চিৎকার করল। পলিনেশীয়রা কারও বাড়িতে গেলে এমনি করেই জানান দেয় তাদের আসার কথা।

দরজায় এসে দাঁড়াল হুটিয়া। দায়সারা গোছের একটা অভ্যর্থনা জানাল প্রুডেন্সকে। মুখে কোন হাসি ফুটল না।

'তোমার পুরুষ কই?' জিজ্ঞেস করল প্রুডেন্স।

'বনে, কাজ করতে গেছে।'

'হুটিয়া,' পুরনো শত্রুর কাছাকাছি হয়ে আন্তরিক কণ্ঠে বলল প্রুডেন্স, 'তুমি আর আমি কখনো বন্ধু ছিলাম না ঠিক, কিন্তু উইলিয়ামস-এর যদি কিছু হয় আমার পুরুষটা একদম ভেঙে পড়বে। ওরা দু'জন ভাইয়ের মত।'

'ঘরে এসো,' মুখে হাসি না ফুটলেও কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতা ফুটল হুটিয়ার। 'বাইরে ঠাণ্ডা বড়। তোমার বাচ্চার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

প্রুডেন্সের কাছ থেকে এলিজাকে নিয়ে তার ছোট্ট মুখটা চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করল হুটিয়া। তারপর তাকাল প্রুডেন্সের দিকে। 'এবার বলো কী বলবে।'

টারারুর কুঠার শান দেয়া, এবং ওর প্রশ্নের জবাবে সে কী বলেছে, এবং ওর কী সন্দেহ হয়েছে সবিস্তারে বলল প্রুডেন্স। শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে গেল মধ্যজনের মুখ।

'হ্যাঁ,' অবশেষে বলল হুটিয়া, 'তোমার সন্দেহ ঠিক মনে হচ্ছে। ওর মত পুরুষ আর নেই। যদি আসে রাতেই আসবে।'

'আমারও তাই ধারণা,' জবাব দিল প্রুডেন্স। 'কে জানে? আমি হয়তো ভুল ভেবেছি, তবু তুমি তোমার পুরুষকে সাবধান কোরো।'

'না, পাহারা দেব। ওকে কিছু বলব না। ও আমার কথা হেসেই উড়িয়ে দেবে। আর যদি বিশ্বাস করাতে পারি সামনে সত্যিই বিপদ, ও হয়তো তক্ষুণি বেরিয়ে যাবে

টারারুর খোঁজে। তাতে আবার গণ্ডগোল বাধবে মিনারীর সাথে। তার চেয়ে ওকে কিছু না জানিয়ে পাহারা দেব আমি। আমাদের এখানে দুটো মাস্কেট আছে। আমি পুরুষের মত গুলি ছুঁড়তে পারি!'

মেয়েকে হুটিয়ার কাছ থেকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল প্রুডেন্স।

'যাই, গিয়ে চুলো জ্বালতে হবে,' বলল সে। 'মিলস আজ শুয়োর মেরে আনবে।'

'আজ থেকে আমরা বন্ধু হলাম,' বলল হুটিয়া। 'খারাপ লোকদের জায়গা হবে না এই ছোট্ট দেশে।'

সন্ধ্যায় খাওয়াদাওয়ার পর শুয়ে পড়ল কর্মক্লান্ত উইলিয়ামস। যতক্ষণ না ও গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল ততক্ষণ অপেক্ষা করল হুটিয়া। তারপর উঠে মাস্কেট দুটোয় গুলি বারুদ ভরে মোম-বাদামের পিদিমটা নিবিয়ে এসে দাঁড়াল ঘরের বাইরে। দরজাটা সাবধানে বন্ধ করে গিয়ে বসল এক ঝোপের ভেতর। একটা মাস্কেট রাখল হাঁটুর ওপর, আরেকটা রইল পাশে খাড়া করা অবস্থায়। ঝোপটা এমন জায়গায়, ঘরে ঢুকতে হলে এটার সামনে দিয়ে যেতেই হবে।

চোখ কান খোলা রেখে বসে আছে হুটিয়া। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। দু'ঘণ্টা পর চাঁদ বেরিয়ে এল পাহাড়ের আড়াল থেকে। শীতল রূপালি জ্যোৎস্নায় হেসে উঠল প্রকৃতি। সময় বয়ে যাচ্ছে। অবশেষে মাথার ওপর উঠে এল চাঁদ। হঠাৎ কিছু শুনে বা বুঝে বা স্রেফ আন্দাজ করে ঘাড় ফেরাল হুটিয়া। উইলিয়ামস-এর সাফ করা জমিটার ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে আবছা এক ছায়ামূর্তি। মাস্কেটটা কক করে উঠে দাঁড়াল হুটিয়া। নিঃশব্দে, পা টিপে টিপে কুটিরের দিকে এগোচ্ছে টারারু। ও যখন ঝোপটার দশ বারো পায়ের ভেতর চলে এল হুটিয়া বেরিয়ে এল জ্যোৎস্নার নিচে।

'ফাআএয়া!' নিচু অথচ কঠিন কণ্ঠে নির্দেশ দিল সে।

ভয়ানক চমকে উঠল টারারু। হাতের কুঠারটা লুকানোর চেষ্টা করল শরীরের পেছনে।

'আর এক পা-ও এগোবে না।' বলে চলল হুটিয়া। 'আর, কোন শব্দ করবে না। উইলিয়ামস জেগে গেলে তোমাকে খুন করবে। আমি জানি তুমি কেন এসেছ।'

প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কিছু বলার চেষ্টা করল টারারু। কিন্তু ওকে থামিয়ে দিল হুটিয়া। 'কোন কথা শুনতে চাই না! ভাগো এক্ষুণি। নইলে গুলি করব।'

উত্তেজনায় অল্প অল্প কাঁপছে হুটিয়ার হাত। খেপে গেলে ও কেমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ওঠে জানে ওর সাবেক স্বামী। তাই সে আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল ফাঁকা জায়গাটার ওপর দিয়ে। মাস্কেট তুলে ওর দুই কাঁধের মাঝ বরাবর তাক কবল হুটিয়া। পাঁচ সেকেন্ড বা তারও বেশি অমনি রইল। ট্রিগার টানবে টানবে করেও শেষ পর্যন্ত টানল না। মাস্কেটটা নামিয়ে নিতে নিতে ও দেখল টারারু বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘুরে কুটিরের দিকে এগোল হুটিয়া।

পরদিন সকালে উইলিয়ামস ঘুম থেকে জেগে দেখল রোজকার মত ও

আগেই উঠে পড়েছে হুটিয়া এবং ওর সকালের খাবার তৈরি।'

'কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে,' বলল সে, 'রাতে ঘুম ভাল হয়নি?'

'না–আজেবাজে স্বপ্ন দেখেছি,' হাতের কাজ থামিয়ে জবাব দিল হুটিয়া। 'সাগর শান্ত হয়ে আসছে। আজ আমি মাছ ধরতে যাব।'

মাথা ঝাঁকাল কামার। 'ঠিক আছে। দুপুরে তাহলে মাছ খেতে পাব!'

সেদিনই দুপুরে আউতে উপত্যকার ছোট্ট একটুকরো জমিতে কাজ করছে টারারু। মার্টিন ছাড়া পুরুষদের ভেতর আর কারও কাজের প্রতি এতটা অনীহা নেই যতটা আছে টারারুর। তবু সে কাজ করছে কারণ সে একা থাকতে চায়। ইন্ডিয়ানদের বাড়িটাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে টারারু। যথাসম্ভব কম থাকে ও বাড়িতে। সাধারণ ভব্যতাবোধের কারণে কেউ ওর প্রতি খোলাখুলি অসম্মানজনক আচরণ করে না বটে, তবে মিনারী খুবই শীতল ব্যবহার দেখায়, তেতাহিতির চোখেও দেখা যায় তাচ্ছিল্যের চাউনি।

পরিষ্কার করা জমিটার এক প্রান্তে একটা পুরাউ গাছের নিচু ডালে ঝুলছে টারারুর খাবারের ঝুড়ি। অন্য প্রান্তে কাজ করছে সে। পুরাউ গাছটার কাছেই এক ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিল হুটিয়া টারারুর পেছন দিকটায় দেখতে পাচ্ছে সে। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে পুরাউ গাছটার দিকে এগোল হুটিয়া। খাবারের ঝুড়িতে হাত চালিয়ে বের করে আনল পাতায় মোড়া একটা মাছ। পুরাউ গাছটার গোড়ায় গুঁড়ি মেরে বসল। এখন এদিকে তাকালেও ওকে দেখতে পাবে না টারারু। কোমরের কাছ থেকে কী একটা বের করে পাতার আবরণ সরিয়ে চিপে ছড়িয়ে দিল টারারুর মাছের ওপর। পানির মত দেখতে কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ পড়ল। হাতের জিনিসটা আবার কোমরে গুঁজে মাছটা আবার পাতায় মুড়ে ঝুড়িতে রেখে দিল হুটিয়া। গাছের আড়াল থেকে সাবধানে উঁকি মেরে দেখল, টারারু এখনও এদিকে পেছন ফিরে আছে। যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে গেল হুটিয়া।

দশ মিনিট পর মুখ তুলে সূর্যের দিকে তাকাল টারারু। কুঠারটা নামিয়ে রেখে এগোল ওর খাবারের ঝুড়ির দিকে। উৎফুল্ল একটা চিৎকার শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল হু আসছে।

'এখনও খাওনি?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ভালই হয়েছে, আমি কয়েকটা পোড়ানো কাঁচকলা নিয়ে এসেছি তোমার জন্যে।'

'ভাল করেছিস। আয়, তুইও আমার সঙ্গে খাবি।'

এই ভৃত্যটাই একমাত্র ইন্ডিয়ান টারারুর প্রতি যার আচরণ এখনও অপরিবর্তিত আছে। সেজন্যে প্রকাশ্যে না হলেও মনে মনে টারারু কৃতজ্ঞতা বোধ করে ওর প্রতি। গল্প করতে করতে দু'জন খাওয়া শেষ করল তারপর দু'জনই শুয়ে পড়ল গাছের নিচে দিবানিদ্রা দেয়ার জন্যে।

দশ

এক বিকেলে গোট-হাউস পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যাওয়া পথ ধরে হেঁটে চলেছে ক্রিশ্চিয়ান। চূড়ায় পৌঁছে পথ ছেড়ে উত্তর দিকে এগোল ও পাহাড়ের ওপর দিয়ে। একটু পরেই নামতে শুরু করল সাগরের দিকের প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে। খুবই দুর্গম পাহাড়ের এ পাশটা। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে নামতে হয়। পিছলে পড়লে মৃত্যু অবধারিত। চূড়া থেকে খানিকটা নিচে ডাল পালা ছড়িয়েছে শতাব্দীর পুরনো দুটো বিশাল লোহাকাঠ গাছ। ক্রিশ্চিয়ান যে পথে নামছে সেটা ছাড়া অন্য যে কোন পথে ও দুটোর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলে গিরিচর পাহাড়ী ছাগলও বোধহয় হতবুদ্ধি হয়ে যাবে।

গাছগুলোর কাছে পৌঁছে কয়েকটা মোটা শিকড়ের নিচ দিয়ে ঝুঁকে প্রশস্ত এক শৈল তাকে নেমে পড়ল ক্রিশ্চিয়ান। পেছন ফিরতেই একটা গুহামুখ। ক্যাসুয়ারিনার ঝাড় ওপর থেকে নেমে প্রায় অদৃশ্য করে রেখেছে মুখটা। ঢুকে পড়ল ক্রিশ্চিয়ান গুহাটায়। চমৎকার গুহা। ভেতর দিকে দশ পনেরো ফুট বিস্তৃত। উচ্চতা কোনমতে এক মানুষ সমান। আধ ডজন মাস্কেট; পরিষ্কার, তেল দেয়া, খাড়া করে রাখা ভেতর দিকের দেয়ালে। ছোট একটা বারুদের পিপে, এক থলে গুলি আর দুটো বড় পানি ভর্তি ক্যালাবাশ ওগুলোর পাশে।

ছোটখাট একটা দুর্গ বলা যায় গুহাটাকে। যথেষ্ট গুলি বারুদ থাকলে একজন মাত্র মানুষ সামনের উপসাগরটায় পুরো একটা বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে নিঃসঙ্গতার প্রয়োজন অনুভব করলে এখানে চলে আসে ক্রিশ্চিয়ান। এক বা আধ ঘণ্টা একা একা কাটিয়ে ফিরে যায় লোকালয়ে। মুখে যতই বলুক এদ্বীপে ওরা নিরাপদ, রাজার জাহাজ কোন দিন এখানে আসবে না; মন থেকে কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করে না ও। ভাল করেই জানে অ্যাডমিরালটির দীর্ঘ বাহু এতটাই দীর্ঘ যে তা একদিন এই সুদূর দ্বীপেও পৌঁছে যেতে পারে। সে-জন্যেই ওর এই প্রস্তুতি, মাস্কেট, গুলি-বারুদ এখানে এনে রাখা। যতক্ষণ প্রাণ থাকবে লড়বে ও, ধরা দেবে না।

কিছুক্ষণ গুহায় বসে থেকে উঠল ক্রিশ্চিয়ান। একটা একটা করে সবগুলো মাস্কেট, বারুদের পিপে, গুলির থলে সব লুকিয়ে রাখল ওপাশের লোহাকাঠ গাছটার শিকড়ের ফাঁকে ফাঁকে। ক্যালাবাশ দুটো শুধু রইল গুহায়। বাড়ির পথে রওনা হলো ক্রিশ্চিয়ান।

বাড়ি ফিরে দেখল ছোট ছেলে চার্লসকে নিয়ে বুনো এক হিবিসকাস গাছের ছায়ায় মাদুর পেতে বসে আছে মাইমিতি। ততোহিতির স্ত্রী নানাই ওর পাশে। দু'বছরের থার্সডে অক্টোবর ক্রিশ্চিয়ান খেলা করছে ইয়ং আর স্মিথের বাড়ির আঙিনায়। ছেলেটা বেশির ভাগ সময় বলহাদি আর টাউরুয়ার কাছেই থাকে, নিঃসন্তান দুই মহিলা খুবই আদর করে ওকে।

'চলো আমার সাথে,' স্ত্রীকে বলল ক্রিশ্চিয়ান, 'একটা জিনিস দেখাব তোমাকে। নানাই, বাচ্চাটাকে একটু রাখতে পারবে?'

'অনেক দেরি হবে নাকি ফিরতে?' জিজ্ঞেস করল মাইমিতি।

'এই সন্ধ্যা, ধরো।'

মাইমিতিকে নিয়ে আবার গোট-হাউস পাহাড়ের পথ ধরল ক্রিশ্চিয়ান। একটু পরেই পৌঁছুল পাহাড়টার সাগরমুখী পাশের লোহাকাঠ গাছ দুটোর গোড়ায়। শিকড়ের ভেতর দিয়ে নিচের শৈল তাকে নামল আগে নিজে তার পর হাত ধরে নামাল মাইমিতিকে।

'আহ্! কেউ জানে না এ জায়গার কথা?'

'না, জানবেও না, শুধু তুমি জানলে। এখানে আর কেউ আসুক, আমি চাই না।'

বিস্মিত চোখে দেখতে লাগল মাইমিতি গুহাটা, নিচের সাগর, লোহাকাঠ গাছ দুটো। কিছুক্ষণ পর ক্রিশ্চিয়ান বলল:

'তোমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছি জানো?—দরকারের সময় আমাকে যাতে খুঁজে বের করতে পারো। জায়গাটা ভীষণ পছন্দ আমার। এখানকার নির্জন শান্ত পরিবেশে বসে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যেন আমার ইংল্যান্ডের শান্ত সাগরতীরে চলে গেছি।'

'ইংল্যান্ড কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মাইমিতি।

হাত তুলে উত্তরপুব দিকে ইশারা করল ক্রিশ্চিয়ান। 'ওই দিকে! দুটো বিরাট মহাসাগর আর একটা বিরাট দ্বীপের ওপাশে। জংলীদের রাজত্ব দ্বীপটায়। ওটা কত বড় তা তোমরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না। প্রত্যেক দিন যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁটতে থাকো তাহলে তিন চাঁদ লাগবে ওটার এপাশ থেকে ওপাশে যেতে।'

'মেয়া আতেয়া রোয়া!' সবিস্ময়ে উচ্চারণ করল মাইমিতি। 'আর তাহিতি—আমার দ্বীপ, কোথায়?'

'ওই দিকে,' উত্তর পশ্চিমে ইশারা করল ক্রিশ্চিয়ান। 'বাড়ির জন্যে এখনও তোমার মন কেমন করে, না? এখানে থাকতে ভাল লাগছে না?'

'লাগবে না কেন? ভাল জায়গা এটা। তুমি যেখানে থাকবে সেটাই আমার বাড়ি।'

'সত্যিই ভাল জায়গা এটা।' সস্নেহে স্ত্রীর দিকে তাকাল ক্রিশ্চিয়ান। 'কী সুন্দর আবহাওয়া! তোমার গালগুলো গোলাপী হয়ে গেছে ইংরেজ মেয়েদের মত।'

'আমাদের ছেলেদুটো দেখেছ কেমন বাড়ছে, আর কেমন সুস্থ আছে?'

'অন্যদের বাচ্চারাও ভাল আছে। আর খেয়াল করেছ এখন পর্যন্ত একজনও, পুরুষ বা মেয়ে, অসুখে পড়েনি। শুধু ওই বিষাক্ত মাছগুলো যদি না থাকত, আমাদের এই দ্বীপ স্বর্গ—মানে তোমাদের রোহুটু নোয়ানোয়া হয়ে উঠত।'

'তুমি কি মনে করো হু আর টারারু মাছ খেয়ে মরেছে?'

সচকিত হয়ে ঘাড় ফেরাল ক্রিশ্চিয়ান। 'কী বলছ তুমি? নিশ্চয়ই বিষাক্ত মাছ খেয়ে মরেছে। ওই মাছ যে বিষাক্ত তা কে না জানে!'

'ফাআরোয়া মাছ বিষাক্ত, তবে এখানকারগুলো নয়। আমি নিজে খেয়েছি অনেকবার।'

'কী বলছ তুমি?' হতবুদ্ধির মত বলল আবার ক্রিশ্চিয়ান।

একটু ইতস্তত করল মাইমিতি। তারপর বলল, 'সব জানে এমন একজন বলেছে আমাকে। আর কেউ জানে না। কিছু সন্দেহও করেনি। যদি এমন হয় আমরা যা ভাবতাম টারারু তারচেয়ে বেশি ঘৃণা করত উইলিয়ামসকে? যদি এমন হয় ও একটা কুঠার শান দিয়েছিল রাতের অন্ধকারে গিয়ে উইলিয়ামসকে খুন করবে বলে, এবং গিয়ে দেখে গুলিভরা মাস্কেট হাতে হুটিয়া অপেক্ষা করছে দরজার বাইরে? যদি এমন হয় টারারু আবার উইলিয়ামসকে মারার চেষ্টা করতে পারে ভেবে হুটিয়া ওর খাবারে বিষ মাখিয়ে দিয়েছিল?...আমার ধারণা হুটিয়া টারারুকেই শুধু মারতে চেয়েছিল, হু-র কপাল খারাপ, সেদিন ও টারারুর খাবারে ভাগ বসিয়েছিল।'

বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কথা বেরোল না ক্রিশ্চিয়ানের মুখ দিয়ে। অবশেষে ও প্রশ্ন করল, 'তোমাদের লোকরা এমন মারাত্মক বিষের খোঁজ জানে!?'

'হ্যাঁ, অনেকেই জানে, তবে সবাই তাদের চেনে না। হুটিয়ার বাবা ছিল ওঝা। ভীষণ বদলোক। প্রায়ই গোত্রপতিরা ওকে নিয়োগ করত শত্রু বিনাশের কাজে। সাধারণ মানুষ জানে ওঝারা একাজ করে গুণ বা তুকতাকের সাহায্যে; আমরা জানি, তুকতাক শুধু নয়, বিষেরও সাহায্য নেয় ওরা।'

ক্রিশ্চিয়ান চুপ করে রইল। একটু থেমে মাইমিতি আবার বলল, 'অন্যরা কেউ কিছু সন্দেহ করেনি।'

'বাদ দাও, এ নিয়ে আর কিছু বলব না আমরা,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ক্রিশ্চিয়ান।

বাউন্টি পিটকেয়ার্ন দ্বীপে আসার পর তিন বছর পেরিয়ে গেছে। ছোট্ট উপনিবেশটা ইতিমধ্যে সুশৃংখল এবং স্থায়ী বসতির চেহারা নিয়েছে। বাড়িঘরগুলো তাদের আনকোরা চেহারা হারিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেছে, যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে। প্রতিটি বাড়ি এখন পরিপাটি বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়ার ভেতরে ছোট্ট একটা ফার্ন এবং লতা-গুল্মের বাগান, একধারে রান্নাঘর, একটু দূরে শুয়োরের খোঁয়াড় আর মোরগ মুরগির ঘের পাশাপাশি। তাহিতির মত এখানেও বাগান এবং আঙিনা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব মেয়েদের।

বিদ্রোহীদের জীবনযাত্রা এখন অনেক সহজ হয়ে এসেছে–এত সহজ যে অনেকের পক্ষেই আর ভাল থাকা সম্ভব হচ্ছে না। হাতে প্রচুর অবসর থাকলে যা হয়–নানা কু দিকে নজর চলে যেতে চায়। কুইনটাল, মার্টিন আর মিলস মোটামুটি বাড়িতেই থাকে, অলসভাবে শুয়ে বসে সময় কাটায়। ওদের তিনজনের যত পরিশ্রমের কাজ সব করিয়ে নেয় তে মোয়া আর নিহাউকে দিয়ে। উইলিয়ামস তার মেয়েমানুষকে নিয়ে সুখেই আছে; কৃচিৎ দেখা করে বন্ধুদের সাথে। স্মিথ আর ইয়ং এখনও কর্মঠ। প্রতিদিন কাজ করে ওরা; জমি পরিষ্কার, ফসল বোনা, মাছ ধরা–মোট কথা কিছু না কিছু নিয়ে থাকে ওরা; কখনও অলস সময় কাটায় না।

ম্যাককয়-এর ভাঁটিখানা চলছে। এখনও ওটা সে গোপন রেখেছে সবার কাছে–সম্ভবত স্কট বলেই পেরেছে। একটু একটু করে টিমূলের মূল উৎসগুলো নিঃশেষ করে ফেলেছে সে এবং কয়েক মাস ধরে ভাঁটিখানাটা সপ্তাহে মাত্র দু'তিনবারের বেশি চালাতে পারছে না। শুরুতে রোজ এক পাইন্ট পান করত; পরিমাণটা এখন কমতে কমতে আধ পাঁইন্টে এসে ঠেকেছে। শিগ্‌গিরই আরও টি-এর উৎস আবিষ্কার করতে না পারলে এটুকুও বজায় রাখতে পারবে কিনা সন্দেহ। এমনিতে, এখনও যেহেতু দিনে এক গ্লাস করে পান করতে পারছে, ওর চেয়ে হাসি খুশি, দিলদরিয়া মানুষ আর নেই। মেরি ওর পরিবর্তন দেখে হতবাক। প্রতি সন্ধ্যায় এক দু'ঘণ্টা আলাপ করে তার সাথে; মাঝে মাঝে হাসি ঠাট্টাও করে পলিনেশীয়রা যেমন পছন্দ করে। দু'বছরের মেয়ে সারাহ আর ছেলে ড্যানের সঙ্গেও প্রতিদিন কিছুটা সময় কাটায় ম্যাককয়। সব কিছুর মাঝে একটাই দুশ্চিন্তা কুরে কুরে খায় ওর মন, কিছুদিন পরে যখন ভাঁটিখানাটা সপ্তাহে তিনদিন চালানোর মত টি-ও জোগাড় করতে পারবে না তখন কী হবে?'

একবার ভেবেছিল নিজে একটা টি-এর খেত করবে। কিন্তু বেশ ভেবে চিন্তে বুদ্ধিটা বাদ দিয়েছে ও। কারণ তাতে ঝুঁকি অনেক। ও মিষ্টি পছন্দ করে এ যুক্তিতে মার্টিনকে বোকা বানানো গেলেও সবাইকে যাবে না। ফলে ক্রমে আরও বেশি সময় দিতে হচ্ছে ওকে টি খোঁজার কাজে। তাতে প্রথম দিকে অন্যান্য কাজে গাফিলতি হচ্ছিল। কিন্তু শিগ্‌গিরই ও চালাক হয়ে গেল। কুইনটাল আগে থেকেই তার সব চাষবাসের কাজ তে মোয়াকে দিয়ে করাচ্ছিল। এবার ম্যাককয়-ও যোগ দিল তার সঙ্গে। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল বেচারা তে মোয়া ক্রীতদাসের পর্যায়ে নেমে আসছে।

হু-র মৃত্যুর পর মার্টিনও একইভাবে নিহাউকে দাস বানিয়ে ফেলেছে। এবং মিলস, আগে যে নিজের সব কাজ নিজেই করত, বন্ধুদের আরামে থাকতে দেখে ভাবল, কেন সে একা একা এত খেটে মরবে? মার্টিনের সাথে ভাগাভাগি করে নিল ও নিহাউকে। ইন্ডিয়ান দু'জন ওদের এই পদাবনতিতে গভীর ভাবে বিক্ষুব্ধ, তবে এখন পর্যন্ত তা প্রকাশ্য বিদ্রোহের চেহারা নেয়নি।

•

গ্রীষ্মের শেষাশেষি এক সকালে ম্যাককয় বেরিয়েছে টি-এর সন্ধানে। কেউ যাতে কিছু সন্দেহ করতে না পারে সেজন্যে যথারীতি বন্দুকটা রয়েছে কাঁধে। মূল উপত্যকার একেবারে পশ্চিম অংশের ঝোপঝাড়ের ভেতর খুঁজল ও সকাল প্রায় আটটা পর্যন্ত। কিন্তু কয়েকটা ছোট অপুষ্ট মূলের বেশি আর কিছু পেল না। একটু পরেই হঠাৎ ওর কানে এল কুঠার দিয়ে কাঠ কাটার শব্দ, ও যেখানে আছে সেখান থেকে খুব বেশি দূরে না। হাতের টি-এর থলেটা এক ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রেখে এগোল সে শব্দ লক্ষ্য করে। কিছুদূর যেতেই দেখল ব্রডসড় একটি মোম-বাদাম গাছের গোড়ায় কুঠার চালাচ্ছে তেতাহিতি।

'কী করছ এখানে?' বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ম্যাককয়। ওর বিরক্তিটা তেতাহিতি গাছ কাটছে বলে নয়, এসময় এ জায়গায় গাছ কাটছে বলে। মানুষের সামনে, সে ইন্ডিয়ান হোক বা শ্বেতাঙ্গই হোক, টি খুঁজতে চায় না ম্যাককয়। কারণ

টিসহ মানুষের সামনে পড়ার অর্থই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া–যে জিনিসের প্রতি দ্বীপের সবার অভক্তি তা ওর এত প্রিয় কেন?

'জায়গা পরিষ্কার করছি,' একটু হেসে ওর প্রশ্নের জবাব দিল তেতাহিতি। 'শুনেছ হয়তো তাহিতির ওরা আমাকে বলে "টুপুয়াই-এর টারো-খোর"। ওরা যেমন রুটিফল পছন্দ করে আমি তেমন–তেমন কী, তার চেয়ে বেশি টারো পছন্দ করি। কিন্তু কপাল খারাপ, ভাল টারো এখন পর্যন্ত পাইনি, তাই ভাবছি এখানে একটা টারো খেত করব। এখানকার মাটি খুব উর্বরা আর ভেজা ভেজা। এই মাটিতে টারো খুব ভাল হবে।'

'হ্যাঁ,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল ম্যাককয়। একটা ঝোপের পাশে পড়ে থাকা অনেকগুলো দারুণ চেহারার টি-এর দিকে ওর চোখ। 'হ্যাঁ, মাটি ভাল এখানকার।'

টি-মূলগুলোর দিকে ইশারা করল তেতাহিতি। 'যে জায়গায় টি ভাল হয় টারোও সেখানে ভাল হয়। তাই এ জায়গাটা বেছেছি।' ঝুঁকে একটা টি তুলে নিল সে। 'এগুলো হলো সবচেয়ে ভাল জাতের, যাকে বলে টি-ভাই-রাআউ, এত বড় টি আর হয় না, আর মাতেনি, এত মিষ্টিও আর কোন টি হয় ।'

'তুমি পছন্দ করো নাকি টি?'

'না, আমার বমি পায় টি মুখে দিলে। ক্রিশ্চিয়ানের বাচ্চাদের জন্যে দু'একটা নিয়ে যাব ভেবে রেখে দিয়েছি।'

'বাকিগুলো তাহলে আমাকে দিয়ে দাও।'

খুশি মনেই রাজি হলো তেতাহিতি। কয়েক মিনিট পার হওয়ার আগেই দেখা গেল স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক ভারী একটা বোঝা নিয়ে তার ভাঁটিখানার দিকে চলেছে ম্যাককয়।

ও যখন বাড়ি ফিরল তখন সন্ধ্যা হতে বেশি বাকি নেই। কুইনটাল একা বসে আছে দোরগোড়ায় গালে হাত দিয়ে। মুখটা বিষণ্ন, যেন গভীর কোন দুশ্চিন্তা পীড়িত করছে ওকে।

'কী হয়েছে, ম্যাট?' জিজ্ঞেস করল ম্যাককয়।

'এই ইন্ডিয়ানগুলো!' ফেটে পড়ল কুইনটাল। 'একেবারে জ্বালিয়ে খেলো!'

'কেন? কী করেছে?'

'কী করেনি?...তে মোয়াকে নিয়ে গেছিলাম আমার উপত্যকায়–জায়গাটা চেনো নিশ্চয়ই? কাপড়গাছ খুব ভাল হবে ওখানে, আমার ধারণা। গিয়ে দেখি মিনারী গাছ কাটছে। আমি বললাম, "যত খুশি গাছ কাটো আপত্তি নেই, কিন্তু মনে রেখো, এই উপত্যকাটা আমার!" শুনে ও কেমন করে তাকাল আমার দিকে যদি দেখতে–যেন নৌ সেনাদের সার্জেন্ট। বলল, "তোমার? মোটেই না, এ জায়গা সবার"।'

'তুমি আর কিছু বলোনি?'

'না। আর কী বলার ছিল, বলো? উচিত ছিল ঘাড় ধরে ওখান থেকে ওকে সরিয়ে দেয়া। কিন্তু তাতে রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে যেত না?'

'তা ঠিক, ওর মত গোঁয়ার আর নেই। গায়ে শক্তিও রাখে!'

'তবু আমি লড়তাম, শুধু ক্রিশ্চিয়ানের কথা ভেবে থেমে গেছি। সত্যিকারের ঝামেলা যেদিন বাধবে সেদিন ক্রিশ্চিয়ানকে আমি পক্ষে চাই।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল ম্যাককয়। 'ভাল করেছ। গুণ্ডাটার সঙ্গে লাগলে পারবে না। আমি যা বুঝতে পারছি জমি ভাগাভাগি করে নেয়া ছাড়া উপায় নেই আমাদের।'

'কিন্তু কী ভাবে তা সম্ভব? ক্রিশ্চিয়ান নিশ্চয়ই রাজি হবে না।'

'হাত দেখানোর অধিকার আছে না আমাদের? আমি, জ্যাক, উইলিয়ামস, আইজাক আর মিলস-এর সাথে কথা বলব। ওরা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে থাকবে। তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? আমাদের পাঁচজনের বিরুদ্ধে ওরা চারজন। তারপর আমরা যাব ক্রিশ্চিয়ানের কাছে।'

'ঠিক বলেছ,' হাঁটুর ওপর একটা চাপড় মেরে বলল কুইনটাল। 'আমাদের সাদাদের সবাইকে যার যার খামার গড়ে তুলতে দাও, বাকিদের কথা আমরা ভাবতে চাই না!'

পরদিন বিকেল। সাগরে মাছ ধরে ফিরেছে তেতাহিতি। বিশাল আলবাকোরটা সৈকতে নামিয়ে রেখে ক্যানো ডাঙায় ঠেলে তুলল ও। প্রায় দুইশো পাউন্ড ওজনের মাছটার লেজ বেঁধে একাই কাঁধে করে উঠতে লাগল চড়াই বেয়ে বসতির দিকে। চড়াইয়ের মাঝামাঝি পৌঁছে কাঁধের বোঝা নামিয়ে রেখে বসল একটা পাথরের ওপর বিশ্রাম নেয়ার জন্যে। পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে দেখল দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছে তে মোয়া।

'তোমাকে সাহায্য করার জন্যেই আসছিলাম,' দোষ স্বীকারের ভঙ্গিতে বলল সে। 'এত তাড়াতাড়ি নৌকা তুলে ফেলতে পারবে জানলে দৌড়ে আসতাম।'

'ঠিক আছে,' বলল তেতাহিতি, 'তুই এসেছিস এতেই আমি খুশি। আরও তো অনেকটা পথ যেতে হবে, তুই আমি দু'জনে মিলে নিতে পারব মাছটা।'

'একটা কথা বলব,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল তে মোয়া। 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না!'

'সাদারা দুর্ব্যবহার করছে?'

'কুত্তার সঙ্গেও মানুষ এত খারাপ ব্যবহার করে না! কুইনটাল সারাদিন বাড়ি বসে থাকে মহাগোত্রপতির মত। আর ম্যাককয় সারাদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়–আমার মনে হয় কোন মেয়েমানুষের সাথে গোপনে দেখা করে। প্রথম প্রথম আমি লোকগুলোকে পছন্দই করতাম, ওদের খাবার ভাগ করে খেতাম, ম্যাককয় হাসি মুখে কথা বলত সব সময়। কিন্তু এখন বদলে গেছে সবাই। আস্তে আস্তে আমি ওদের দাস হয়ে যাচ্ছি। কুইনটালের চোখগুলো খেয়াল করেছ আজকাল? ওকে ভয় লাগে আমার–মনে হয় পাগল হয়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, একদিন দেখেছি, দরজার গোড়ায় বসে নিজে নিজে কথা বলছিল।'

'এখন আমি কী করব বলো? ওর কথা না শুনলে মারে। ও ম্যাককয় দু'জনেই।'

এবার মুখচোখ লাল হয়ে উঠল তেতাহিতির। 'কুত্তা ওরা! একজন গোত্রপতির সাথেও যোগ্য না! ওদের বাড়িতে আর যাবি না তুই। নিজেদের কাজ নিজেরাই করে নিক।'

'কুইনটালকেই আমার ভয়। এসে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

'চেষ্টা করে দেখুক!' গম্ভীর স্বরে বলল তেতাহিতি। 'আমি ওর দফা রফা করে ছাড়ব। এতদিন আমরা ধৈর্য ধরেছি গণ্ডগোল ঝামেলা এড়ানোর আশায়, আর না।'

উঠে দাঁড়িয়ে ও বিরাট মাছটা কাঁধে তুলে নিতে সাহায্য করল তে মোয়াকে।

সেদিনই সন্ধ্যায় ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ির সামনে জড় হয়েছে বিদ্রোহীরা। ঘাসের ওপর বসে ফিসফিস করে নিজেদের ভেতর আলাপ করছে। ক্রিশ্চিয়ান আর ইয়ং বসেছে ওদের মুখোমুখি, একটা বেঞ্চে। উইলিয়ামস এল সবার শেষে। ম্যাককয় উঠে দাঁড়াতেই ফিসফিসানি স্তব্ধ হয়ে গেল।

'মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান,' বলল ম্যাককয়, 'এমন একটা প্রশ্ন নিয়ে আমরা আজ এসেছি যেটাকে হালকা ভাবে উড়িয়ে দেয়ার উপায় নেই। আগে হয়তো যেত, এখন আর স ব নয় বলেই আমার ধারণা। কারণ আমরা এখন একা নই, আমাদের ছেলে মেয়ে য়েছে। তাদের ভাল মন্দ ভাবতে হবে আমাদেরকেই। আমার ধারণা, স্যার, নিজে জমিতে মানুষ যতটা প্রাণ দিয়ে খাটতে পারে আর কারও জমিতে ততটা নয়। তাই আমি মনে করি, আমাদের জমিজমা সব ভাগ করে নেয়ার সময় হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল ক্রিশ্চিয়ান। 'ঠিক বলেছ, ম্যাককয়!' বলল সে। 'আমি আর মিস্টার ইয়ং এই গত সপ্তায় এ নিয়ে আলাপ করছিলাম। আমরা দু'জনই একমত হয়েছি তুমি যেমন বললে, নিজের জমি হলে সবাই আরও বেশি পরিশ্রম করবে। তাছাড়া জমি ভাগাভাগি হয়ে গেলে আমাদের মৃত্যুর পর কোন গণ্ডগোল ঝামেলা দেখা দেয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না। সবাই যাতে ন্যায্য ভাগ পায় সেটা দেখতে হবে আমাদের। এ নিয়ে আমি নিজে কিছুটা ভাবনা চিন্তা করেছি। হাত দেখানোর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করে এমন কেউ আছে?'

'না, স্যার!' বলল আলেকজান্ডার স্মিথ।

তারপর বাকিরা সমস্বরে: 'না! না!'

'তাহলে তো খুবই সহজ হয়ে গেল। শুধু পুরো দ্বীপটা ভাল মত জরিপ করতে হবে, আর দেখতে হবে সবাইকে ন্যায্য ভাগ দেয়া হচ্ছে কিনা। আমি আর মিস্টার ইয়ং নিচ্ছি দায়িত্বটা। সীমানাগুলো নির্দিষ্ট করার পর তোমাদের মতামত চাইব। দিন পনেরো পর সবাই আবার এসো এখানে।'

'বেশি ঝামেলা পোহাতে হবে না আপনাদের, স্যার,' মন্তব্য করল ম্যাককয়। 'জন মিলস আর আমি ঘণ্টাখানেক আগে আলাপ করছিলাম এ নিয়ে। মোটে ন'টা ভাগ হবে।'

'ন'টা!' সবিস্ময়ে বলল ক্রিশ্চিয়ান। 'তেরোটা বলো।'

'নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ানদের গোনায় ধরছেন না, স্যার?'

'নিশ্চয়ই ধরছি। ওদের বাদ দিয়ে ভাগাভাগি করতে চাও?'

'ওদের ভাগ দেয়ার কোন দরকার আছে বলে তো মনে হয় না।'

অনেক কষ্টে ক্রোধ দমন করল ক্রিশ্চিয়ান। 'এই তোমার ন্যায় নীতি, ম্যাককয়?' শান্ত কণ্ঠে বলল সে।

'মিনারীর কথা ভাবো, উইল!' বলল আলেকজান্ডার স্মিথ। 'তেতাহিতির

ভাবো! তোমার প্রস্তাব মত যদি ভাগ করা হয় কেমন হবে ওদের মনের অবস্থা? আমরা যে ক'জন আছি এর পাঁচগুণ লোকের ভেতরও যদি ভাগ করা হয় একেক জনের ভাগে যথেষ্ট জমি পড়বে! তাহলে কেন খামোকা গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলার চেষ্টা করব?'

'আমরা শুধু আমাদের কথাই ভাবতে চাই, আলেক্স,' জবাব দিল ম্যাককয়। 'আমাদের আর আমাদের ছেলে মেয়েদের কথা। ইন্ডিয়ানরা আমাদের জমিতে কাজ করে ফসলের ভাগ নিতে পারে।'

'আমারও এই মত!' বলল মার্টিন।

'আমিও আছি তোমাদের সঙ্গে,' জুড়ে দিল কুইনটাল।

'ঠিক! ঠিক!' বলল মিলস।

'শোনো!' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল ক্রিশ্চিয়ান। 'যে কাজ তোমরা করতে চাইছ তার পরিণতি ভেবেছ? তোমরা সবাই ইন্ডিয়ান ভাষা অল্প স্বল্প জানো। ওদের একটা শব্দ আছে, ওয়েরে। এই ওয়েরে-র চেয়ে ঘৃণ্য আর কিছু নেই ওদের কাছে। এর মানে হচ্ছে ভূমিহীন মানুষ। আমাদের চারজন ইন্ডিয়ানের দু'জনই তাদের নিজের দেশে বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিল। এখানে তাদেরকেই তোমরা ওয়েরের পর্যায়ে নামিয়ে দিতে চাও? কূপার দাস বানিয়ে ফেলতে চাও? স্মিথ ঠিকই বলেছে, প্রচুর জমি আমাদের, তেরো কেন আরও বেশি ভাগ করলেও একেক জনের ভাগে যথেষ্ট থাকবে। ইন্ডিয়ানদের বঞ্চিত করার চেষ্টা পাগলামি হবে! ওদের ন্যায় বোধ আমাদের মতই প্রখর। ওদের তোমরা শত্রু করে তুলতে চাও, যারা এত দিন আমাদের বন্ধু ছিল? ভাল করে ভেবে দেখ। এই লোকগুলোর সাথে যা তোমরা করতে চাইছ তা যদি তোমাদের কারও সাথে করা হয় কেমন লাগবে তোমাদের?'

মাথা নাড়ল ম্যাককয়। 'আপনি যেভাবে দেখছেন আমি মোটেই ব্যাপারটাকে সেভাবে দেখছি না, স্যার। নিজের ভাল ভাবতে হবে আমাদের। তাছাড়া আমাদের হাত দেখানোর অধিকার আছে—আপনি নিজের মুখে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।'

'মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান যেভাবে দেখছেন সেটাই ঠিক দেখা,' বলল ইয়ং। 'তোমরা যা করতে চাইছ তা এক কথায় পাগলামি। এটা করলে রক্তপাত হবেই—আমার কোন সন্দেহ নেই।'

'ঠিক বলেছেন, মিস্টার ইয়ং,' বলল ব্রাউন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ও কুঁকড়ে গেল মার্টিনের ক্রূর দৃষ্টি দেখে।

'আমরা হাত দেখাতে চাই, স্যার,' গরগরিয়ে উঠল মিলস, 'এবং এখনই। দেখতে চাই কোন পক্ষে বেশি!'

'ঠিক আছে,' কঠোর স্বরে বলল ক্রিশ্চিয়ান। 'তবে, আশা করি, বুঝে শুনে দেখাবে! ম্যাককয়-এর প্রস্তাব অত্যন্ত ভয়ানক! তাহলে দেখাও···দ্বীপটা আমরা ন'ভাগে ভাগ করব, ইন্ডিয়ানদের বাদ দিয়ে?'

ম্যাককয় হাত তুলল প্রথমে। তারপর একে একে কুইনটাল, মিলস, উইলিয়ামস এবং মার্টিন। ওরা পাঁচজন বাকি চারজনের বিরুদ্ধে।

'বেশ, দেখা যাচ্ছে তোমরাই দলে ভারি,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল ক্রিশ্চিয়ান, 'তবু আরেকবার সময় নিয়ে ভাল করে ভেবে দেখতে বলব তোমাদের।

যে সিদ্ধান্তের ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তা এত তাড়াতাড়ি নিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। অক্টোবরের এক তারিখে আবার আমরা মিলিত হব। আশা করি সে সময় নাগাদ তোমাদের এক বা দু'জন মত বদলাবে। তোমরা যা বলছ তা করলে ধ্বংস হয়ে যাবে আমাদের বসতি।-হ্যাঁ, ধ্বংস! তাই বলছি, ভাল করে ভেবে দেখ আবার। আরেকটা কথা, যাওয়ার আগে তোমরা প্রত্যেকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাবে, আজ যা যা আলাপ হলো তার কিছু প্রকাশ করবে না ইন্ডিয়ানদের কাছে।'

সবাই চলে যাওয়ার পরও ক্রিশ্চিয়ান আর ইয়ং পাশাপাশি বসে রইল বেঞ্চে। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না।

'এখন বলছে বটে ইন্ডিয়ানরা ওদের জমিতে কাজ করতে পারে,' অবশেষে নীরবতা ভাঙল ইয়ং, 'কিন্তু আমার মনে হয় ক'দিন পরেই ওরা দাস বানিয়ে ফেলবে ওদের।'

গম্ভীর একটু হাসি হাসল ক্রিশ্চিয়ান। 'দাস বানাবে মিনারীকে! বা তেতাহিতিকে? নিজেদের স্বার্থেই ওরা তেমন কিছু করবে না বলে আমার ধারণা।'

'সাধারণ ইংরেজ নাবিকরা যেমন হয়। তেমনিই ওরা, ভালও না খারাপও না। কিন্তু এখানকার পরিবেশ ওদের চরিত্রের কেবল খারাপটা বের করে আনছে। আজ আবার মনে হচ্ছে, হাত দেখানোর অধিকারটা ওদের না দিলেই ভাল করতেন। ওরা বোঝে কড়া শাসন।'

'এই পাগলামি যদি মাথা থেকে না নামায়, টের পাবে কড়া শাসন কাকে বলে। ম্যাককয়ই খেপিয়েছে সবকটাকে! ও যদি মত না বদলায় ওর এবং আমাদের সবার স্বার্থে আমাকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'আমারও তাই মনে হয়, আরেকবার আপনাকে ক্যাপ্টেন হতে হবে। দরকার হলে ব্লাইয়ের চেয়ে কড়া।'

ইয়ং উঠে বিদায় চাইল। ও চলে যাওয়ার পর ক্রিশ্চিয়ান ঘরে ঢুকে মই বেয়ে ওপর তলায় উঠল। জানালাগুলো সব খোলা। তারার আলো এসে আবছাভাবে আলোকিত করেছে ঘরটা। পা টিপে টিপে বিছানার কাছে গেল ক্রিশ্চিয়ান। মাইমিতি দু'ছেলেকে নিয়ে টাপার কম্বলের নিচে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। ওর মেঘের মত চুলগুলো এলো হয়ে আছে বালিশের ওপর। ছোট ছেলেটা বাচ্চারা যেমন ঘুমায় তেমনি দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ঘুমাচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকে নিচে নেমে এল ক্রিশ্চিয়ান। মোম-বাদামের একটা সলতে জ্বালল। টেবিলের ওপর অনেক জিনিসের সাথে পড়ে আছে বাউন্টির রুপোয় বাঁধানো বাইবেলটা। তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল ক্রিশ্চিয়ান। একটানা নয়। পাতা ওল্টাচ্ছে আর এখান থেকে ওখান থেকে পড়ছে। আসলে সময় কাটাতে চাইছে, এখন শুলেই দুশ্চিন্তা ছেঁকে ধরবে, ঘুমাতে পারবে না ও আজ রাতে। কিন্তু পৃথিবীর এত লোকের মনে যে বাইবেল প্রশান্তি এনে দিয়েছে তা সে রাতে ক্রিশ্চিয়ানের মনে বিন্দুমাত্র স্বস্তি দিতে পারল না।

এক জায়গায় ও পড়ল, 'যতটুকু পাপ করবে তার সাতগুণ শাস্তি আমি দেব তোমাদের···বিধর্মীদের মাঝে নিয়ে ফেলব তোমাদের, এবং পেছনে লেলিয়ে দেব তরবারি···অবশেষে তোমাদের ভেতর যারা বেঁচে থাকবে তাদের মনে তাদের

শত্রুদেশ সম্পর্কে এক আতঙ্ক এনে দেব; পাতার মর্মরধ্বনি ওদের তাড়া করবে; ওরা পালাতে চাইবে, তরোয়ালের হাত থেকে মানুষ যেমন পালাতে চায়, এবং যখন কেউ পিছু নেবে না তখন তারা মুখ থুবড়ে পড়বে।'

বইটা বন্ধ করে আস্তে সরিয়ে রাখল ক্রিশ্চিয়ান। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল কনুই হাঁটুতে ঠেকিয়ে। মোম-বাদামের পলতে পুড়তে পুড়তে নিঃশেষ হয়ে গেল এক সময়। অন্ধকার হয়ে গেল ঘর।

তিন সপ্তা পেরিয়ে গেছে। এর ভেতর পাঁচ হাঙ্গামাকারীর আচরণ আরও কর্কশ, আরও রূঢ় হয়েছে ইন্ডিয়ানদের প্রতি। ওরা মোটামুটি ধরে নিয়েছে শিগ্‌গিরই পুরো দ্বীপের মালিক হবে তারা, মাওরি পুরুষগুলো হবে তাদের প্রজা। আচার আচরণে ব্যাপারটা প্রকাশ পেলেও মুখে অবশ্য কেউ তা এখনও প্রকাশ করেনি।

কুইনটাল যে ছোট্ট উপত্যকাটাকে নিজের বলে গণ্য করে সেখানে একটা বাড়ি তুলছে মিনারী আর মোয়েটুয়া। কুইনটাল প্রথম দিনই গিয়ে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল এই বলে যে, তার জায়গায় বাড়ি বানানো চলবে না, অন্য যে কোন জায়গা বেছে নিতে পারে মিনারী। কিন্তু মিনারী আগের মতই অবজ্ঞার সাথে বলেছিল: এ জায়গায় সবার সমান অধিকার; সে বাড়ি বানাবে, পারলে কুইনটাল বাধা দিক। সে সময় ওখানে ম্যাককয় ছিল বলে ভয়ঙ্কর এক গণ্ডগোল লাগতে গিয়েও লাগেনি। কুইনটালকে ও এক দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলেছিল: 'বানাচ্ছে বানাক না। একটু ধৈর্য ধরো। সময় হলেই তোমার পছন্দের জায়গা তুমি পেয়ে যাবে আইনসম্মতভাবে।'

'জাহান্নামে যাক বদমাশের বাচ্চা!' জবাবে খেঁকিয়ে উঠেছিল কুইনটাল। 'বাড়িটা শেষ করুক আগে, তারপর দেখাব জমিটা কার!'

অবশেষে শেষ হলো মিনারীর বাড়ি। সে আর তার স্ত্রী কেবল থাকবে, সুতরাং বেশি বড় করে তৈরি করেনি। তবে সুন্দর আর মজবুত হয়েছে ওটা। উজ্জ্বল হলুদ রঙের প্যানডানাস পাতার ছাউনি আর পাতলা সমতল পাথরের মেঝে। পাথরের মাঝের ফাঁকগুলো ভরে দিয়েছে বালি দিয়ে। তেতাহিতি মাঝে মাঝে এসে সাহায্য করেছে মিনারী আর মোয়েটুয়াকে।

কাজ যেদিন শেষ হলো তার পরদিন সকালে আবার এল সে। দূর থেকে বাড়িটা দেখেই প্রশংসার চাউনি ফুটে উঠল ওর চোখে। মিনারী তখন পানি ঢেলে মেঝের ফাঁকের আলগা বালি বসিয়ে দিচ্ছে। পায়ের শব্দ পেয়ে সোজা হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

'এসো, তেতাহিতি,' ডাকল সে।

'শেষ হ্যাঁ?' ঘরের ভেতর চারপাশে দৃষ্টি বুলাতে বুলাতে বলল তেতাহিতি। 'দারুণ কাজ করেছ তোমরা দু'জন। সুন্দর হয়েছে বাড়িটা। তাহিতির তোমরা আমাদের টুপুয়াইয়ের লোকদের চেয়ে অনেক ভাল কাঠমিস্ত্রী! কবে উঠছ এখানে?'

'শিগ্‌গিরই। শুয়োরের পালের জন্যে একটা ঘের করব, তারপর!'

'হ্যাঁ, শুয়োর খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এ দ্বীপে।'

'চলো বন থেকে একটু ঘুরে আসি। কাল আউতে উপত্যকায় একটা মাদী

শুয়োর দেখেছি আটটা বাচ্চা সহ। পারলে ধরে আনব কয়েকটা বাচ্চা।'

মাথা নাড়ল তেতাহিতি। 'না, তুমি যাও। সারারাত মাছ ধরেছি, এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমাব।'

সূর্য যখন মাথার ওপর তখন ঘুম ভাঙল তেতাহিতির। বাড়ির কাছে এক পুরাউ গাছের ছায়ায় মাদুর পেতে শুয়েছিল ও। ঘুম ভেঙেছে স্বপ্ন দেখে। কয়েক মুহূর্ত বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে রইল মাথার ওপরের সবুজ পাতার চাঁদোয়ার দিকে। স্ত্রীর পায়ের আওয়াজ পেয়ে উঠে বসল হাই তুলতে তুলতে।

খাবারের ঝুড়ি হাতে এসে দাঁড়াল নানাই। স্বামীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে খাবার বের করে সাজিয়ে দিতে লাগল সামনে।

'ঘুম ভাল হলো?' জিজ্ঞেস করল নানাই। 'নিহাউ রেঁধেছে তোমার খাবার। ঠাণ্ডা শুয়োরের মাংস, পোড়ানো কাঁচকলা আর তোমার ধরা মাছ নারকেলের চাটনী দিয়ে।'

খেতে শুরু করল তেতাহিতি। নানাই গিয়ে এক ক্যালাবাশ পানি নিয়ে এল। খাওয়া শেষ করে হাত মুখ ধুয়ে ক্যালাবাশ মুখে লাগিয়ে পানি খেলো তেতাহিতি। পরিতৃপ্তির একটা ঢেকুর তুলল।

'তেতাহিতি, আমরা একা থাকতে থাকতেই একটা কথা বলে নিতে চাই তোমাকে,' সতর্ক কণ্ঠে বলল নানাই। 'আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। তবু তোমার জানা দরকার।'

'বলো,' মাথা ঝাকিয়ে বলল তেতাহিতি।

'সুজানাহ বলেছে আমাকে, অবশ্য তার আগে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে কাউকে যেন না বলি। মার্টিন বলেছে ওকে। কথাটা শুনলে বুঝতে পারবে কেন আমি প্রতিজ্ঞা ভাঙছি।'

'ফাআইতে মাই!' অসহিষ্ণু কণ্ঠে নির্দেশ দিল তেতাহিতি।

'সুজানাহ বলল, সাদারা নাকি সবাই এক সাথে বসেছিল আমাদের না জানিয়ে। ওরা ঠিক করেছে দ্বীপের সব জমি ভাগ করে প্রত্যেক পুরুষের সীমানায় পাথর পুঁতে চিহ্ন দিয়ে···'

'তুমি এটা বিশ্বাস করতে পারোনি?' বলল তেতাহিতি! 'কেন? এটা আমাদের পুরনো রীতি, এতে ঝগড়া ফ্যাসাদ এড়ানো যায়।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমাকে শেষ করতে দাও আগে। ও বলল, মাওরী পুরুষদের ভাগের বাইরে রাখা হবে। মানে এখন থেকে তোমরা ওয়েরে হয়ে যাবে। দাসের মত কাজ করবে সাদাদের জমিতে।'

'মেয়েমানুষের গল্প!' তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল তেতাহিতি। 'ক্রিশ্চিয়ান সম্পর্কে তুমি জানো না, এমন কাজ ও করতেই পারে না।'

'আমি তো আগেই বলেছি, সত্যি কিনা জানি না!' বলল নানাই।

স্বামীকে গাছের নিচে একা রেখে চলে গেল ও। তেতাহিতি আবার শুয়ে পড়ল। সুজানাহ-র গল্পটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও একেবারে উড়িয়ে দিতে পারল না ও। একটু একটু করে মনে আসতে লাগল সাদা মানুষদের দু'চারটে আচরণের কথা।

বিশেষ করে কুইনটাল, ম্যাককয়, মার্টিন, মিলস–হঠাৎ ওরা এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে কেন? ধীরে ধীরে সন্দেহের বীজ শিকড় ছড়াল ওর মনে। উঠে মার্টিনের বাড়ির পথে পা বাড়াল তেতাহিতি।

সুজানাহকে একাই পেল বাড়িতে। মিলস কাজে গেছে আর মার্টিন নাক ডাকাচ্ছে অশ্বত্থ গাছের ছায়ায়। তেতাহিতির গলা শুনে চমকে উঠল সুজানাহ। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওকে কাছে ডাকল তেতাহিতি। নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল:

'নানাইকে যা বলেছ–সত্যি?'

'বলে দিয়েছে তোমাকে?' ঘাবড়ে যাওয়া স্বরে বলল সুজানাহ।

'হ্যাঁ। ও ওর কর্তব্য করেছে। গল্পটা তুমি মাথা থেকে বানিয়েছ?'

'মার্টিন যা বলেছে তা-ই আমি বলেছি।'

তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েটার দিকে তাকাল তেতাহিতি। বুঝতে বাকি রইল না, সে সত্যি কথাই বলেছে। জিজ্ঞেস করল, 'এ ধরনের গল্প বানাবে কেন মার্টিন?'

'গল্প?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল সুজানাহ। 'কে জানে? হয়তো গল্প নয়, এটা সত্যিই।'

এই সময় জেগে উঠল মার্টিন। তেতাহিতিকে তার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লাফ দিয়ে উঠে ছুটে এল।

'কী চাও এখানে?' ক্রোধ আর ভীতির মিশেল দেয়া এক স্বরে জিজ্ঞেস করল সে।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল তেতাহিতি। 'সত্য জানতে চাই। আমি মনে করি সুজানাহকে তুমি যা বলেছ সব মিথ্যা!'

'কী বলেছি?' এবার আর ক্রোধ নয়। পুরোপুরি ভীতি প্রকাশ পেল মার্টিনের কণ্ঠে।

'তোমরা সাদারা নাকি নিজেদের ভেতর ভাগ করে নিচ্ছ দ্বীপটা, আমাদের না জানিয়ে! বলেছ ওকে একথা?'

মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল মার্টিন। 'না।' অবশেষে স্বর বেরোল ওর গলা দিয়ে। 'ও নিশ্চয়ই বানিয়ে বলেছে।'

এক পা এগোল তেতাহিতি। মার্টিনের ঘাড় ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল:

'মিথ্যে কথা! বাঁচতে চাস তো সত্যি কথা বল!' শেষ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মার্টিনকে ছেড়ে দিল ও। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনমতে বাঁচল মার্টিন। হাঁটু গেড়ে গুটিসুটি হয়ে বসে রইল মাটিতে।

'বল!' আবার চিৎকার করল তেতাহিতি, 'তোরা ভাগ করে নিচ্ছিস সব জমি?'

ভয়ে ভয়ে একটু মুখ তুলল মার্টিন। অস্ফুট স্বরে জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

'আমাদেরকে বাইরে রাখা হচ্ছে ভাগের?'

মাথা ঝাঁকাল মার্টিন।

'ক্রিশ্চিয়ান সম্মতি দিয়েছে এতে?' আগের চেয়ে হিংস্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল তেতাহিতি।

'হ্যাঁ।'

আর একটা কথাও না বলে ঘুরে দাঁড়াল তেতাহিতি। দুপদাপ পা ফেলে ছুটল

ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ির দিকে। মার্টিন তাকিয়ে রইল ওর গমন পথের দিকে। ও অদৃশ্য হয়ে যেতেই সে মাটি থেকে উঠে ঘরে ঢুকল। সুজানাহকে টেনে আনল চুলের মুঠি ধরে। তার পর চালাতে লাগল একের পর এক কিল, চড়, লাথি

দুপুরের খাওয়ার পর ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে উঠে ক্রিশ্চিয়ান দেখল বলহাদির সঙ্গে বাইরে যাচ্ছে মাইমিতি। ওকে উঠে বসতে দেখে মাইমিতি বলল:

'আমরা একটু ব্রাউনের কুয়ায় যাচ্ছি, কাপড় ধুতে।'

'কী বলছ তুমি!' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল ক্রিশ্চিয়ান। 'এখন কাপড় ধুতে যাবে! যে কোন সময় ব্যথা উঠতে পারে। বলহাদি একাই যাক।'

'আমাদের বাচ্চা রাতের আগে আসবে না।'

'ভাল কথা, তাহলে ঘরে বসে কোন কাজ করো, বাইরে যাওয়ার কী দরকার? এ তো পাগলামি!'

'আমার ইচ্ছে হচ্ছে যেতে,' আহ্লাদী কণ্ঠে বলল মাইমিতি। 'গেলাম। তোমরা পুরুষ মানুষ এসব বুঝবে না।'

বলহাদিকে নিয়ে চলে গেল মাইমিতি। ক্রিশ্চিয়ান আর কিছু বলার সুযোগ পেল না। ধীরে ধীরে উঠে দরজায় এসে দাঁড়াল। গোট-হাউস পাহাড় থেকে নেমে আসা পথের বাঁকে দেখা গেল আলেকজান্ডার স্মিথকে। ক্রিশ্চিয়ানকে দরজায় দেখে সে এগিয়ে এল মরচে ধরা একটা কুঠার হাতে।

'পেয়েছি স্যার!' বলল স্মিথ।

'কোথায়?'

'পাহাড়ে, স্যার, যেখানে তেতাহিতি সেই টাপোন গাছটা কাটছিল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্মিথের হাত থেকে কুঠারটা নিল ক্রিশ্চিয়ান। অন্যমনস্ক ভাবে ধার পরীক্ষা করতে করতে বলল, 'আমাদের সবচেয়ে ভাল কুঠারটা! এই ইন্ডিয়ানগুলো! কাজ শেষ করে, সে যেখানেই হোক, অস্ত্রপাতি ফেলে রেখে দেবে, তারপর বেমালুম ভুলে যাবে কোথায় ফেলেছে।... সব সমান; কি তেতাহিতি কি মিনারী!'

দাঁত বের করে হাসল স্মিথ। 'ঠিক বলেছেন, স্যার! আমার মেয়েমানুষটাকে এখনও শেখাতে পারলাম না জায়গার জিনিস জায়গায় রাখতে। এক বাড়িতে একশো বছর থাকলেও পারব কিনা সন্দেহ!'

একটু পরেই বিদায় নিল স্মিথ। ক্রিশ্চিয়ান ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল আবার মাথার নিচে হাত রেখে। ধীরে ধীরে চোখ বুজে এল ওর ঘুমে।

তেতাহিতি জীবনে কখনও সাড়া না দিয়ে কারও ঘরে ঢোকেনি। বাড়ির সামনে থেমে পলিনেশীয় রীতিমাফিক ডাক দেয় আগে। ভেতর থেকে আহ্বান এলে পরে ঢোকে। কিন্তু আজ না থেমেই ক্রিশ্চিয়ানের বাগানে ঢুকল সে। ধুপ ধাপ পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল খোলা দরজা দিয়ে।

তখনও ঘুম ভাল করে চেপে বসেনি ক্রিশ্চিয়ানের চোখে। পায়ের শব্দ পেয়ে চোখ খুলল সে। তেতাহিতির চেহারা দেখে অবাক হলো। ও কিছু বলার আগেই

কথা বলল তেতাহিতি।

'সত্যি একথা?' ক্রোধকম্পিত স্বরে চিৎকার করল সে। 'সত্যি তোমরা সাদারা গোপন বৈঠক করেছ? দ্বীপের সব জমি নিজেদের ভেতর ভাগ করে নিচ্ছ আমাদের ওয়েরে বানিয়ে, দাস বানিয়ে?'

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলাতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিল ক্রিশ্চিয়ান। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কে বলেছে তোমাকে একথা?'

'যে-ই বলুক!' হিংস্র কণ্ঠে জবাব দিল তেতাহিতি। 'সত্যি কিনা?'

'হ্যাঁ···না···শোনো আমি বুঝিয়ে বলছি···'

'আর বলতে হবে না, সব জানি আমি! ক্রিশ্চিয়ানকে থামিয়ে দিয়ে চিৎকার করল তেতাহিতি।

অনেক কষ্টে রাগ সামলাল ক্রিশ্চিয়ান। 'বসো, তেতাহিতি! আমি বুঝিয়ে বলছি সব।'

'বুঝিয়ে বলবে! কী আর বোঝাবে তুমি? ছি! তোমাকে বন্ধু হিসেবে নিয়েছিলাম ভাবতেও এখন লজ্জা হচ্ছে আমার! তুমি আবার গোত্রপতি! কুইনটালের চেয়ে কোন অংশে ভাল নও তুমি! ওই ছোটজাত মার্টিন শুয়োরের চেয়েও ভাল নও!'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তেতাহিতির মুখোমুখি হলো ক্রিশ্চিয়ান। ক্রোধে জ্বলছে চোখদুটো। তার দৃষ্টির সামনে একটু যেন কুঁকড়ে গেল টুপুয়াইয়ের গোত্রপতি। প্রবল চেষ্টায় নিজেকে শান্ত করল ক্রিশ্চিয়ান। তারপর আবার বলল, 'বসো! তোমার জানা দরকার···'

'যথেষ্ট জেনেছি!' বাধা দিয়ে আগের মতই হিংস্র কণ্ঠে বলল তেতাহিতি। তারপর ঘুরে ছুটল দরজা পেরিয়ে।

'দাঁড়াও! দাঁড়াও, তেতাহিতি!' পেছন থেকে চিৎকার করল ক্রিশ্চিয়ান, কিন্তু তেতাহিতি কর্ণপাত করল না সে চিৎকারে।

সোজা নিজের অর্থাৎ ইন্ডিয়ানদের যৌথ বাড়িতে গেল সে। দরজার কাছে দেখল তার স্ত্রীকে। উদ্বিগ্ন চোখে স্বামীর দিকে তাকাল নানাই।

'মিনারী কই?' চিৎকার করল তেতাহিতি।

'কথাটা সত্যি তাহলে?'

'মিনারী কই?'

'আসেনি। আমার মনে হয় ওর নতুন বাড়িতে আছে। সত্যি কথাটা?'

জবাব না দিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি ছুটতে ছুটতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল তেতাহিতি।

কুইনটালের উপত্যকায় পৌঁছে হাঁটার গতি একটু কমাল সে। তারপরই পেল গন্ধটা। মৃদু কিন্তু স্পষ্ট কাঠ পোড়ার। জোরে কয়েকবার শ্বাস টেনে মুখ উঁচু করল তেতাহিতি। সামনে গাছপালার ওপর দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে ধোঁয়া। হাঁটার গতি আবার বাড়াল ও। কয়েকটা মিনিট পেরিয়ে গেল। ঘন একটা ঝোপ থেকে বেরোল তেতাহিতি। মিনারীর পরিষ্কার করা জমির প্রান্তে পৌঁছে গেছে। পর মুহূর্তে পাথরের মত জমে গেল ও।

মিনারীর সদ্য তৈরি বাড়িটা যেখানে ছিল সেখানে ছাই-কয়লার স্তূপ ছাড়া

কিছু নেই। পাতার চাল অনেক আগেই পুড়ে শেষ হয়ে গেছে, মোটা কাঠগুলো পুড়ছে এখনও। কাছেই দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে মিনারী। মাথাটা নোয়ানো গভীর চিন্তামগ্ন ভঙ্গিতে। পেছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরাল বিশালদেহী গোত্রপতি।

'এ কী?'

'আগুন কে লাগিয়েছে আমি দেখিনি। কোন সন্দেহ নেই এ কুইনটালের কাজ।'

নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দু'জন। অবশেষে কথা বলল তেতাহিতি।

'বসো, মিনারী। একটা কথা জানা দরকার তোমার!'

এগারো

অনেক আগে অন্ধকার হয়ে গেছে কুইনটাল আর ম্যাককয়-এর বাড়ি। দোতলায় ওদের শোবার ঘর। মাঝখানে মাদুর ঝুলিয়ে দু'ভাগ করা হয়েছে ঘরটাকে। একতলাটা দু'জনই ব্যবহার করে। ঘরটায় আসবাব বলতে দুটো টেবিল, কয়েকটা খটখটে চেয়ার আর বেঞ্চ, আর একটা কাবার্ড খাবার দাবার আর থালাবাসন রাখবার জন্যে। মাঝরাতের সামান্য পর মিনারী নিঃশব্দে এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ির পথে রওনা হলো।

ক্রিশ্চিয়ানের বাড়িতে আলো জ্বলছে এত রাতেও। মাইমিতির প্রসব বেদনা উঠেছে তৃতীয় সন্তান জন্ম দেয়ার জন্যে। কয়েকজন মহিলা জড় হয়েছে একতলার ভেতরের ঘরটায় দ্বীপের সবচেয়ে দক্ষ ধাত্রী বলহাদিকে সাহায্য করার জন্যে। ক্রিশ্চিয়ান আর ইয়ং বাড়ির দক্ষিণ পাশের ঘাসে ছাওয়া জায়গাটায় পায়চারি করছে। বলহাদি ছাড়া বাকি মেয়েরা বসে আছে দরজার কাছে একটা বেঞ্চে।

নিঃশব্দে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এসব দেখল মিনারী। তারপর যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে আবার রওনা হলো পশ্চিমের পাহাড়টার উদ্দেশ্যে। ওদের মারাএ-র কাছে এক বিরাট পাথরের সামনে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। নিচু কণ্ঠে ডাকল:

'তেতাহিতি!'

'এ, তেইএ,' একই রকম নিচু কণ্ঠে জবাব শোনা গেল।

নিকষ কালো অন্ধকার চারদিকে। আকাশে তারা আছে কিন্তু তার আলো অন্ধকার কমানোর চেয়ে বাড়িয়ে তুলেছে যেন। বিরাট পাথরটার গায়ে হেলান দিয়ে বসল মিনারী।

'সবাই এসেছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'এসেছি,' এক স্বরে জবাব দিল সবাই।

'তাহলে শোনো,' বলল মিনারী, 'কুইনটাল আর ম্যাককয়-এর বাড়িতে দুটো মাস্কেট ছিল, তোমরা জানো। দুটোই আমি সব গুলি-বারুদ সহ নিয়ে এসেছি।

তোমার ওপর যে দায়িত্ব ছিল করেছ তেতাহিতি?'

'ইয়ং-এর বাড়িতে যে মাস্কেটটা ছিল সেটা এখন আমার কাছে, নিহাউ-এর কাছে মিলস আর মার্টিনের বাড়ির দুটো। বিশবার গুলি চালানোর মত বারুদ আর গুলি আছে আমাদের কাছে।'

'অস্ত্রগুলো ফস্কাবে না তো?' নিহাউ জিজ্ঞেস করল।

'এই ঝুঁকিটুকু আমাদের নিতেই হবে,' বলল মিনারী।

'আমার লোহাকাঠের ডাণ্ডাটা আমি নিয়ে এসেছি,' বলল নিহাউ। 'মাস্কেট থাকল কি না থাকল তাতে কিছু এসে যায় না আমার।'

'বোকার মত কথা বোলো না,' ধমক দিল মিনারী। 'আমাদের জাতের মানুষের সাথে লাগতে যাচ্ছি না আমরা। আমাদের উদ্দেশ্য ওদের খুন করা, এবং যত তাড়াতাড়ি পারা যায়। আমার কাছেও লাঠি আছে, তবু মাস্কেট রাখব আমি সাথে। তুইও রাখবি।'

'এখন ঠিক করতে হবে কাউকে আমরা ছেড়ে দেব কিনা,' বলল তেতাহিতি। 'ক্রিশ্চিয়ানের কথা বলছি আমি।'

'দাঁড়াও,' বলল মিনারী। 'আগে অন্যদের কথা ভেবে নেই। পাঁচজনকে আমি খুশি মনেই খুন করতে পারব—কুইনটাল, উইলিয়ামস, মার্টিন, মিলস আর ম্যাককয়।'

'খামোকা সময় নষ্ট করছি আমরা, ওদের নিয়ে আলাপ করে,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল তেতাহিতি।

'ওদের রক্ত দেখার জন্যে ভেতরটা পাগল হয়ে উঠেছে আমার,' হিংস্র ভঙ্গিতে যোগ করল নিহাউ।

'বেশ। বাকি থাকল চারজন। এই চারজন সম্পর্কে একমত হতে হবে আমাদের। তেতাহিতি, ক্রিশ্চিয়ানের কী হবে বলো আগে।'

'বড় কঠিন প্রশ্ন করেছ, মিনারী। ক্রিশ্চিয়ান সাহসী, ভাল লোক, তাছাড়া আমাদের বন্ধু।'

'বন্ধু!' ঘৃণা মিনারীর কণ্ঠে। 'বন্ধু কোন দিন বন্ধুকে অপমান করে? নিজের দেশে ও একজন গোত্রপতি। আমাদের দেশে তুমি আর আমি যে গোত্রপতি তা ও জানে। তারপর ও কী ভাবে আমাদের বাদ দিয়ে জমি ভাগ করার কথা ভাবতে পারল? বন্ধু কোনদিন বন্ধুকে দাস বানাতে চায়? এর চেয়ে ও যদি থুতু দিত আমাদের গালে তা-ও তো ভাল ছিল।'

'তোমার রাগ যুক্তিসঙ্গত,' জবাব দিল তেতাহিতি। 'তবু বলব ও যা করেছে আমাদের অপমান করার জন্যে করেনি, এটা আমি জানি।'

'কী করে জানো?'

'একদিন ও ব্যাপারটা বলেছিল আমাকে। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওর লোকদের সবারই নাকি কথা বলার অধিকার আছে ওর মত। বেশির ভাগ লোক যে মত দেবে—সে মত যদি নেতার বিরুদ্ধেও হয় অন্যরা তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।'

'মিথ্যে কথা!' বলল মিনারী। 'দুটোর একটা সত্য: হয় ও আমরা যা ভেবেছিলাম, মানে গোত্রপতি নয়; নয় তো ও আমাদের অপমান করতে চায়।'

প্রথমটা সত্যি হতে পারে না। কুইনটাল, মিলস, মার্টিনের মত শুয়োরদের ইচ্ছায় চলবে ও? জমি ভাগ করার মত এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওদের সিদ্ধান্ত মেনে নেবে?'

'আমার কিছু বলার নেই এ ব্যাপারে,' জবাব দিল তেতাহিতি। 'তোমার মত আমিও অন্ধকারে; তবু আমি বিশ্বাস করতে পারছি না ক্রিশ্চিয়ান আমাদের অপমানিত করতে চায়।'

'তা হলে কেন একাজ করল?' মিনারী জিজ্ঞেস করল। 'একজন গোত্রপতি তার নিজের ইচ্ছাতেই চলে। ক্রিশ্চিয়ান এবং ইয়ং দু'জনকেই মরতে হবে,' শান্ত কণ্ঠে বলে চলল সে। 'ওদের মারার ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমার ধারণা যদি সত্যিও হয় তবু মরতে হবে ওদের। ক্রিশ্চিয়ান, ইয়ং দু'জনেই পুরুষ। দেশী ভাইদের রক্তের বদলা ওরা নেবে ওদের বাঁচিয়ে রাখলে।'

চুপ তেতাহিতি। 'তা ঠিক,' অবশেষে বলল সে। 'আর কোন উপায় নেই। তবে, মিনারী, এটাও ঠিক ক্রিশ্চিয়ানকে যে মারবে সে আর আমার বন্ধু থাকবে না।'

'ঠিক আছে।' গম্ভীর মিনারীর কণ্ঠস্বর। 'দ্বীপটা যথেষ্ট বড়। তুমি তোমার মেয়েমানুষকে নিয়ে এক দিকে চলে যাবে, আমি আমার জনকে নিয়ে চলে যাব অন্যদিকে।'

'মিনারী,' তেতাহিতি বলল, 'ব্রাউন তোমার বন্ধু। ওকে কি ছেড়ে দেব?'

'ও আমার ভাইয়ের মত। ওর অন্তরে ভাল ছাড়া কিছু নেই। আমাদের আসতে দেখে কিছুই ও সন্দেহ করবে না। কে ওকে আঘাত করতে পারবে?'

'পারা যাবে,' বলল তে মোয়া। 'ওকে সবচেয়ে শেষে মারব আমরা, যখন আমাদের সবার রক্ত গরম হয়ে যাবে, মন পাগল হয়ে উঠবে খুনের নেশায়। কেউ না পারলে আমিই পারব তখন।'

'ক্রিশ্চিয়ান যদি মাফ না পায়, ব্রাউনও পাবে না,' উত্তপ্ত কণ্ঠে বলল তেতাহিতি।

'ঠিক আছে,' মিনারী জবাব দিল, 'কিন্তু তুই ওকে ছুঁবি না, তে মোয়া! তেতাহিতি খুন করবে আমার বন্ধুকে, যেহেতু আমি মারব ওর বন্ধুকে। কিন্তু তুমি, টুপুয়াইবাসী, যা করবার খুব তাড়াতাড়ি করবে!'

'চিন্তা কোরো না, মিনারী; তোমার হাতের মতই অচঞ্চল থাকবে আমার হাত। তুমি ক্রিশ্চিয়ানকে যত দ্রুত শেষ করবে ব্রাউনও তত দ্রুত শেষ হবে।'

'বুঝতে পারছি সাদা মানুষগুলো মরে যাওয়ার পর দ্বীপটা যতখানি ভাবছি ততটা বড় আর থাকবে না,' বলল মিনারী। 'আমাদের দু'জনের থাকার পক্ষে এটা খুব ছোট হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।'

এরপর যখন তেতাহিতি জবাব দিল উত্তাপ দূর হয়ে গেছে ওর কণ্ঠ থেকে। 'হয়েছে, মিনারী নিজেদের ভেতর ঝগড়া করে লাভ নেই। আমি বুঝতে পারছি আমার বন্ধুর বেঁচে থাকা চলবে না, আর তোমার বন্ধুর বেঁচে থাকা উচিত হবে না। দেশী ভাইদের হত্যাকারীদের মাঝে একা বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই ওর ভাল হবে না?'

'বুঝেছি,' একমুহূর্ত চুপ করে থেকে জবাব দিল মিনারী। 'ওকে নিয়ে আর কিছু

বলার দরকার নেই।'

'আর তাহলে বাকি থাকল একজন। স্মিথের কী হবে?'

'ভাল লোক, সাহসী, আমাদের কোন ক্ষতি করেনি,' বলল নিহাউ। 'কিন্তু সঙ্গীদের পাপ ওর মৃত্যু অবধারিত করে তুলেছে।'

'হ্যাঁ, আর কোন উপায় নেই,' মিনারী বলল। 'ওকেও মরতে হবে।'

সবাই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আবার কথা বলল মিনারী।

'নিহাউ, তে মোয়া, মন দিয়ে শোন: আমরা মাত্র চারজন, খুন করতে হবে ন'জনকে। সুতরাং কোন রকম ভুল বা বোকামি করা চলবে না। আমরা যেভাবে বলব ঠিক সেভাবে করবি তোরা।'

'ঠিক আছে,' নিহাউ বলল।

'কী ভাবে কী করব তুমিই ঠিক করো, মিনারী,' বলল তেতাহিতি। 'তুমি বড় সুতরাং এ ব্যাপারে তোমার অধিকার আগে।'

'ঠিক আছে,' প্রসন্নকণ্ঠে বলল মিনারী, 'একটা কথা, যুদ্ধের নেতা হিসেবে আমাকে মেনে চলতে হবে তোমাকে।'

'চলব।'

'একটা লজ্জা সারাজীবন আমাদের বয়ে বেড়াতে হবে, সত্যিকারের যুদ্ধ করে না, খাওয়ার জন্যে শুয়োর মারার মত মানুষ মারব আমরা। কিন্তু এছাড়া উপায় নেই।'

'আচ্ছা, মিনারী, কাজটা গোপনে না করে ওই পাঁচজনকে আমরা প্রকাশ্য লড়াইয়ে আহ্বান জানাতে পারি না?' জিজ্ঞেস করল তেতাহিতি।

'একজন গোত্রপতির মতই কথা বলেছ তুমি, তেতাহিতি,' বলল মিনারী। 'সেটা করা গেলে আমার চেয়ে বেশি খুশি কেউ হত না। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান দেবে না ওদের লড়তে বরং আমাদের সাথে কোন না কোন ভাবে একটা সমঝোতা করিয়ে দেবে এবং সে সমঝোতা আমি জানি এক চাঁদও টিকবে না; মাঝখান দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যটা জানাজানি হয়ে যাবে, ওদের খুন করার সুযোগটা আমরা হারাব।'

'আমরা অপেক্ষা করতে পারি না বন্ধুত্বের ভঙ্গি করে?' বলল নিহাউ। 'তার পর যখন ওরা ভাববে আমরা সব ভুলে গেছি তখন এখনকার মত...'

'এ নিয়ে আর কোন কথা নয়,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল মিনারী। 'অমন ভঙ্গি করা কি সম্ভব আমাদের পক্ষে? না। আমি চাই আরেকটা সূর্যাস্তের আগে ওদের সব ক'জনের লাশ দেখতে।'

'তাহলে আর আলোচনা অর্থহীন,' বলল তেতাহিতি। 'কী ভাবে কী করতে হবে বলো।'

'বলব। আগে জানতে হবে আসছে দিনেই আমরা কাজটা করতে পারব কিনা।'

উঠল মিনারী। তার দেখাদেখি অন্যরাও। পশ্চিম পাহাড়ের পাথুরে ঢাল বেয়ে উঠে চলল ওদের মারাএ-র দিকে। মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকে বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল তেতাহিতি, নিহাউ আর তে মোয়া; মিনারী গিয়ে ঢুকল পাশের ছোট্ট চালা

ঘরটায়। একটু পরেই ফিরল ও পুরোহিতের আলখাল্লা পরে। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল বেদীর ওপর। পেছন পেছন উঠল অন্যরা। ছোট্ট পিরামিডটার সামনে দাঁড়াল মিনারী। তেতাহিতি চলে গেল পিরামিডের পেছনে। টাআরোয়ার আধার অর্থাৎ কারুকাজ করা পালকি চেহারার ছোট্ট বাক্সটা নিয়ে এসে রাখল পিরামিডের সামনে। চার ভক্ত এবার হাঁটু গেড়ে বসল। নিঃশব্দ কয়েকটা মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। দু'হাত উঁচু করে প্রার্থনা শুরু করল মিনারী:

'আমাদের প্রভু! আমাদের দেবতা! শোনো আমাদের কথা!
বিচার করো, আমাদের পথ দেখাও যদি বিপথগামী হয়ে থাকি।
বিচার করো, বলো, আমরা দোষ করছি কিনা,
আমাদের ক্রোধ যথার্থ কিনা।
তোমার তো অজানা নেই সে ক্রোধের কারণ:
তুমি সর্বজ্ঞ, আমরা বলার আগেই তুমি জেনেছ।
এখন, আমাদের ক্রোধ যদি তোমার ক্রোধ হয়,
জানতে দাও আমাদের।
এখনই সময় কিনা বলো!'

আবার গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল। অবশেষে উঠে দাঁড়াল মিনারী। তেতাহিতি ছোট্ট বাক্সটা রেখে এল পিরামিডের পেছনে। সারি বেঁধে নেমে এল সবাই মারা-এ থেকে। মন্দিরের পবিত্র সীমানার বাইরে এসে মিনারী থেমে দাঁড়াল। ঘুরে সঙ্গীদের মুখোমুখি হলো।

'আমাদের সাফল্য সুনিশ্চিত,' বলল সে। 'ওদের সব ক'জন না মরা পর্যন্ত আমরা আর বিশ্রাম নেব না।'

'প্রথমে কী করতে হবে?' জিজ্ঞেস করল তেতাহিতি।

'তুমি আর আমি ফিরে যাব গ্রামে,' বলল মিনারী। 'ভোর হয়ে আসছে। আরও সময় বাইরে থাকলে ওরা সন্দেহ করতে শুরু করবে।'

'যদিও কথা দিয়েছি তোমার আদেশ মেনে চলব,' বলল তেতাহিতি, 'কিন্তু এই কাজটা আমি করতে পারব না। মাইমিতির বাচ্চা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে এতক্ষণে। আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তারপর ওর এবং ক্রিশ্চিয়ানের মুখোমুখি আমি হতে পারব না।'

'তা ঠিক,' বলল মিনারী। 'আমরা তাহলে যাব না। নিহাউ একাই যাবে।'

'কী করব আমি?' জিজ্ঞেস করল নিহাউ।

'প্রথম যে মেয়েমানুষটার সঙ্গে দেখা হবে তাকে বলবি, আমি উইলিয়ামস-এর সঙ্গে শুয়োর শিকারে যাচ্ছি আর তোরা বাকি তিনজন পশ্চিম পাহাড়ের নিচে উপকূলে মাছ ধরবি সন্ধ্যা পর্যন্ত। এক্ষুণি চলে যা, তাড়াতাড়ি ফিরবি।'

বসতি থেকে পশ্চিম উপত্যকার দিকের পথটা পাহাড়ী এলাকা অতিক্রম করেছে গোট-হাউস চূড়ার সামান্য নিচ দিয়ে। ওখানে পথটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় পথটা এগিয়ে গেছে দক্ষিণে আউতে উপত্যকার আংশিক পরিষ্কার করা ভূমির দিকে। দুই পথের সংযোগস্থলটা গাছপালা শূন্য। কিন্তু সামান্য দক্ষিণে উঁচু হয়ে

উঠেছে ঘন গাছগাছালিতে ছাওয়া একটা টিলা। টিলাটার ওপর থেকে খুব সহজেই নজর রাখা যায় দু'পাশের উপত্যকার দিকে। এই টিলার ওপর ঘাপটি মেরে বসে আছে মিনারী, তেতাহিতি আর তে মোয়া নিহাউ-এর অপেক্ষায়।

সূর্য এখনও ওঠেনি। তবে অনেক উঁচুতে ভেসে থাকা কয়েক টুকরো মেঘে কমলা রঙের ছোপ লেগেছে। মৃদু পুবাল হাওয়া সাগরের নোনা গন্ধ বয়ে আনছে ডাঙায়। টিলার চূড়া মাত্র কয়েক গজ প্রশস্ত। তেতাহিতি আর তে মোয়া মাস্কেট পাশে নিয়ে শুয়ে আছে উপুড় হয়ে। দু'জনেরই চোখ নিচে দুই পথের সংযোগস্থলটার দিকে। মিনারী বসে তাকিয়ে আছে বসতির দিক থেকে উঠে আসা ঢালটার দিকে।

আধঘণ্টা পর নিহাউকে আসতে দেখা গেল।

'এদিকে!' মৃদু কণ্ঠে ডাকল মিনারী। কয়েক মুহূর্ত পরেই তিন জনের পাশে গুঁড়ি মেরে বসল নিহাউ।

'ওরা কিছু সন্দেহ করেনি,' বলল সে। 'নানাই মোয়েটুয়া আর সুজানাহর সাথে দেখা হয়েছে আমার। ওরা খাওয়ার পানি আনতে যাচ্ছিল।'

'ক্রিশ্চিয়ানকে দেখেছিস?' জিজ্ঞেস করল তেতাহিতি।

'না। ও আর ইয়ং এখনও ওর বাড়িতেই আছে। মাইমিতির বাচ্চা হয়েছে ভোর রাতে।'

'ছেলে না মেয়ে?'

'মেয়ে।'

'পুরুষদের কাকে কাকে দেখেছিস?' জিজ্ঞেস করল মিনারী।

'শুধু স্মিথকে। ঝরনা থেকে পানি নিয়ে যাচ্ছিল ক্রিশ্চিয়ানের বাসায়।'

'মিনারী, আজ ক্রিশ্চিয়ানের বাচ্চা হয়েছে,' বলল তেতাহিতি, 'আজকের দিনে ওকে খুন করা সহজ?'

'কঠিন জানি,' জবাব দিল মিনারী, 'তবু করতে হবে। এখন আমাদের দু'জন উইলিয়ামস-এর কুটিরে যাবে। যারাই থাক ওকে শেষ না করে ফিরবে না এখানে।'

'আমি যাব,' বলল তেতাহিতি। 'ক্রিশ্চিয়ান আজ সম্ভবত ওর ইয়াম্ খেতে কাজ করবে। এপথে যখন যাবে ওর মুখোমুখি হতে চাই না আমি।'

'ঠিক আছে,' বলল মিনারী। 'তে মোয়া যাবে তোমার সাথে। খেয়াল রাখবে উইলিয়ামস-এর মেয়েমানুষটা যেন পালাতে না পারে। ওকে ভাল মত বেঁধে রেখে আসবে ওদের বাড়ির পেছনের ছোট্ট উপত্যকায়। আমাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেন ছুটতে না পারে।'

মাস্কেটটা নিয়ে উঠতে যাবে তেতাহিতি, মিনারী হাত রাখল ওর বাহুতে। উইলিয়ামস-এর বাড়ির দিক থেকে আসা পথের বাঁকে দেখা গেল হুটিয়াকে। ঝুড়ি হাতে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে আসছে সে। ঝুড়ির ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা টাপা-গেটানি (টাপা কাপড় তৈরি করতে লাগে হালকা মুগুরের মত এই অস্ত্র)। দুই পথের সংযোগস্থলে এসে একটা বড়সড় পাথরের ওপর বসল সে। পা তুলে আঁচড় জাতীয় কিছু একটা পরীক্ষা করল। আঙুলের ডগায় থুতু লাগিয়ে ডলল জায়গাটায়। তারপর সুডৌল দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে নাচের ভঙ্গিমায় নাড়ল

কয়েকবার এদিক ওদিক। পুরো উপত্যকাটা এখন সোনালি হয়ে উঠেছে সদ্য ওঠা সূর্যকিরণে। উঠে দাঁড়াল হুটিয়া। নিচে বনের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর হাঁটতে শুরু করল আবার আগের মত গুনগুন করতে করতে। একটু পরেই গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল সে।

'কোন সন্দেহ নেই দেবতাকে সময় মতই তোলা হয়েছে,' বলল মিনারী। 'আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয় এমন ভাবেই সব ঘটনা ঘটাচ্ছেন তিনি। কোন সন্দেহ নেই, আমরা সফল হব।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বলল তেতাহিতি। 'তোমরা তাহলে থাকো। শিগ্‌গিরই ফিরব আমরা।'

তে মোয়াকে নিয়ে টিলা থেকে নামল তেতাহিতি। অদৃশ্য হয়ে গেল নিচের ঘন ঝোপ ঝাড়ের ভেতর।

ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ির সাগর-পাশের ছোট্ট একটা ঘাস ছাওয়া জমিতে বসে আছে ক্রিশ্চিয়ান আর ইয়ং, ক্রিশ্চিয়ানের কোলে তার তিন বছরের ছেলে থার্সডে অক্টোবর।

'আর দেরি করছ কেন, নেড,' বলল ক্রিশ্চিয়ান, 'আমি যে হারে নতুন মুখ আনছি তোমরা তো পেছনে পড়ে যাবে।'

মৃদু হাসল ইয়ং। 'টাউরুয়া, আমি দু'জনেই এ ব্যাপারে হিংসা করি আপনাকে আর মাইমিতিকে,' বলল সে। 'বেচারা টাউরুয়ার সন্দেহ আমাদের কোন দিনই হয়তো ছেলে মেয়ে হবে না।'

'টাউরুয়া! যন্ত্রসব! যৌবন ফুরিয়ে যাওয়ার আগে এক ডজন ছেলেপুলে দেবে ও তোমাকে। ক'বছরের মধ্যে দ্বীপটার চেহারা কেমন বদলে দিয়েছে ওরা খেয়াল করেছ?'

'ওদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে কী করব না আমরা? এ নিয়ে কিছু ভেবেছেন?'

'না,' জবাব দিল ক্রিশ্চিয়ান।

'লিখতে পড়তে শেখাবেন না?!'

'কী কাজে আসবে ওদের লেখাপড়া? ভেবে দেখ, এই দ্বীপটাই ওদের পৃথিবী; এখানে যা দেখবে, শুনবে, জানবে তা-ই ওদের সব দেখা শোনা জানা। কী করে আমাদের দুনিয়া বা ধর্ম সম্পর্কে ধারণা দেব ওদের? তারচেয়ে আমি মনে করি মায়ের ধর্মেই শিক্ষা পাওয়া উচিত ওদের। কেবলমাত্র ওরো বা যুদ্ধের দেবতার প্রতি আনুগত্য ছাড়া আর সব দিক থেকে ওদের ধর্ম মোটামুটি আমাদের মত। জংলী, প্রায় অসভ্য হলেও আমাদের মতই সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে ওরা। দুটো ধর্মবিশ্বাসকে মিলিয়ে ফেলা আমার মনে হয় বোকামি হবে।'

'হতে পারে,' সন্দেহের সুরে জবাব দিল ইয়ং। 'তবু ভবিষ্যতের কথা ভাবলে...'

'মানে আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন বড় হবে?'

'হ্যাঁ। আমাদের বাবা-মা-রা যখন তাদের নাতি নাতনীদের দেখবে এবং জানবে তারা ইন্ডিয়ান ধাঁচে পূজা পার্বণ করছে কী ভাববে তারা?'

নিষ্প্রাণ একটা হাসি হাসল ক্রিশ্চিয়ান। 'এসব নাতি নাতনীদের দেখা দূরে

থাক এদের কথা ওরা আদৌ জানবে কিনা সন্দেহ আছে।...তোমার চোখগুলো ঢুলু ঢুলু করছে, নেড। যাও, বাড়ি গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও।'

'আপনার অবস্থাও তো তা-ই। চলুন না আমার বাসায়, বিশ্রাম নেবেন। ওখানে কেউ বিরক্ত করবে না আমাদের।'

'না। মাইমিতির অগ্নিপরীক্ষা শেষ, এটা ভেবেই আমি অনেক সুস্থ বোধ করছি। আজ সন্ধ্যায়ই সবাইকে ডাকব আমি। ওরা চাক না চাক জমি ভাগের ব্যাপারটা বদলে ফেলব। ইন্ডিয়ানদের আমাদের সমান ভাগ এবং অধিকার দিতে হবে।'

গাছপালা ছাওয়া ছোট্ট টিলাটার ওপর অপেক্ষা করছে মিনারী আর নিহাউ। নিচের ঢালটা ওরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ঢালে কেউ এসে পড়লে ওদের দেখতে পাবে না। সূর্য বেশ খানিকটা উঠে এসেছে দিগন্তের ওপরে। হঠাৎ নিচ থেকে কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে এল। একটু পরেই পথের বাঁকে দেখা গেল মিলস আর মার্টিনকে। দু'জনেরই ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, পরনে শুধুমাত্র নাবিকদের হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে পড়া ট্রাউজার, মাথায় রুমাল বাঁধা। হুটিয়া যে পাথরে বসেছিল সেটার পাশে পৌঁছে দু'জনই ধপ করে বসে পড়ল। ঢাল বেয়ে ওঠার পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে ওরা জিভ বেরিয়ে পড়া কুকুরের মত।

'ক্রিশ্চিয়ানের সঙ্গে দেখা হয়েছে আজ সকালে?' একটু পরে জিজ্ঞেস করল মার্টিন।

মাথা নাড়ল মিলস। 'আমার মেয়েমানুষ সারারাত ছিল ওর বাসায়। ও বলছিল, এবারের বাচ্চাটা নাকি মেয়ে।'

'আমিও তাই শুনলাম। এই নিয়ে মোট সাতটা হলো, তার তিনটেই ক্রিশ্চিয়ানের।'

'কিন্তু তোমাদের খবর কী?' জিজ্ঞেস করল মিলস। 'তিন বছরে একটাও বাচ্চা দিতে পারল না তোমার মেয়েমানুষ?'

'দোষটা সুজানাহর–কোন সন্দেহ নেই,' জবাব দিল মার্টিন।

'তা তো বলবেই। যত দোষ সব মেয়েমানুষের।'

'তা ছাড়া আর কার? ও যদি দেশের মেয়ে হত, দেখতে, এত দিনে ক্রিশ্চিয়ানের মতই কম পক্ষে তিনটের বাপ হতাম আমি।'

'আর গপ্প দিও না, দোষটা তোমারও হতে পারে।...ও কী! গুলির শব্দ না?'

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই উইলিয়ামস। শুয়োর শিকার করছে বোধ হয়।'

'আমিও ভাবছি বিকেলে বেরোব। কাল ওই দিকে দারুণ একটা পালকে ছুটতে দেখেছি। আচ্ছা দুপুরে জ্যাকের ওখানে অতিথি হলে কেমন হয়? এক সপ্তার বেশি হয়ে গেল ওর মুখ দেখিনি।'

'আপত্তি নেই আমার।'

'কিন্তু তার আগে হাতের কাজ শেষ করতে হবে। চলো যাই।'

'এখনই! আরেকটু বসি, জন। বেলা তো বেশি হয়নি।'

'কুঁড়ের বাদশা। ইচ্ছে হলে তুমি বসে থাকো। আমি গেলাম।' উঠে দাঁড়াল

মিলস।

'অস্ত্র-ঘর থেকে আমার কুঠারটা নিয়ে যেও। আমি সরাসরি চলে যাব,' পেছন থেকে চিৎকার করল মার্টিন। জবাব না দিয়ে হাঁটতে লাগল মিলস। একটু পরে হারিয়ে গেল পাহাড়ের একটা ছোট চূড়ার আড়ালে।

নিহাউ সামান্য ঘুরে নিঃশব্দে মাস্কেটটা সামনে নিয়ে এল। কাঁধে বাঁট ঠেকিয়ে ট্রিগারে আঙুল দিয়ে তাকাল মিনারীর দিকে অনুমতির আশায়। কিন্তু মিনারী নিচের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই হাত তুলে ওকে যেমন আছে তেমন থাকার ইশারা করল।

মার্টিন হাঁটুতে কনুই ঠেকিয়ে বসে আছে ঝুঁকে। হাত দুটো হালকাভাবে মুখ পাকানো। দৃষ্টি দু'পায়ের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায়। হঠাৎ পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকাল সে পাহাড়ের গা বরাবর এগিয়ে যাওয়া পথের দিকে। তেতাহিতি আ তে মোয়া আসছে। পথের দু'পাশের ফার্নে আংশিক ঢাকা পড়ে আছে তাদের গা এক পলক দেখেই আবার আগের জায়গায় দৃষ্টি স্থির করল মার্টিন। এদিকে, ওরে দেখেই হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে তেতাহিতি। মাস্কেটটা নিয়ে নিয়েছে ডান হা থেকে বাঁ হাতে। ওরা কাছে পৌঁছার পর আবার মুখ তুলল মার্টিন। ঘাড়টা সামান হেলিয়ে তাকাল ঘৃণার দৃষ্টিতে।

'তোরাই তাহলে শুয়োর শিকারী?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল সে। 'তা শুয়োর কই? পালিয়েছে তাই না? কে গুলি করেছিল? একটাই শব্দ শুনলাম।'

ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল দুই ইন্ডিয়ান। কেউ কোন কথা বলল না।

আয়েসী ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল মার্টিন। 'আমার কাছে দে ওটা,' তে মোয়া মাস্কেটটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল সে। 'কী করে গুলি ছুঁড়তে হয় শিখিয়ে দেই।'

ঝট করে মাস্কেটটা সরিয়ে নিল তে মোয়া। আর তেতাহিতি বিড়ালের ম ক্ষিপ্রতায় হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল মার্টিনের কব্জি। একই সময় মিনারী আর নিহা বেরিয়ে এল পাহাড়ের পাশের ঝোপ থেকে। নিহাউ তার মাস্কেটটা তে মোয়া কাছে দিয়ে এগিয়ে এসে ধরল মার্টিনের আরেক হাত। আর কোন কথা বলতে পারার আগেই ঠেলা ধাক্কা খেতে খেতে মার্টিন এগিয়ে চলল আউতে উপত্যকার প ধরে। ঘটনার আকস্মিকতায় মার্টিন এমন হকচকিয়ে গেছে যে কয়েক সেকেন্ড বা দেয়ার কথাও ওর মনে পড়ল না। তারপরই হিংস্র হয়ে উঠল সে। প্রাণপণে চে চালাতে লাগল নিজেকে মুক্ত করার।

'কী করছিস তোরা!' ভয়ঙ্কর কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল সে। 'ছেড়ে দে আমাকে বাদামী বেজন্মার দল! ছেড়ে দে বলছি! ছেড়ে দে! ...জন! জন!'

'ছেড়ে দাও ওকে,' শান্ত কণ্ঠে নির্দেশ দিল মিনারী।

তেতাহিতি আর নিহাউ ছেড়ে দিল মার্টিনকে। মিনারী এবার এগিয়ে এসে ঘা ধরে ওকে তুলে ফেলল মাটি থেকে অন্তত এক হাত।

'না! না, মিনারী!' যন্ত্রণাকাতর স্বরে চিৎকার করে উঠল মার্টিন। 'আমায় ছেড়ে দাও!'

মাটিতে নামিয়ে দিল ওকে মিনারী। 'তাহলে হাঁটো!' নির্দেশ দিল সে।

শ'খানেক গজ সামনে পাহাড়ের গায়ে একটুখানি একটা ফাঁকা জায়গা। সেদিকে নিয়ে চলল ওরা মার্টিনকে। জায়গাটার কিনারে পৌঁছে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল মার্টিন। ঘুরে তাকাল মিনারীর দিকে। দু'চোখে আতঙ্ক। একে একে চারজনের দিকে তাকাল সে। তারপর কম্পিত স্বরে বলল:

'কী চাও তোমরা? তে মোয়া! ...নিহাউ!...ঈশ্বরের দোহাই! তোমরা কথা বলছ না কেন?'

মিনারী আবার এগিয়ে এল ওকে ধরার জন্যে। মার্টিনের মনে হলো ওর পাদুটো শক্তিহীন হয়ে গেছে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। ওরা হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিল ওকে। মার্টিন আবার বসে পড়ল।

'তুলে নিয়ে চলো বদমাশটাকে!' বলল তেতাহিতি।

তে মোয়া আর নিহাউ দু'দিক থেকে ধরে ছেঁচড়ে নিয়ে চলল ওকে। বিরাট এক ঝোপের ধারে পৌঁছে ছেড়ে দিল মিনারীর নির্দেশে। মুহ্যমানের মত পড়ে রইল মার্টিন। একটু পরে কোন মতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ইন্ডিয়ান ক'জনের দিকে। তে মোয়াকে ইশারা করল মিনারী। সঙ্গে সঙ্গে এক পা পিছিয়ে এসে কোমর থেকে লম্বা একটা ছোরা বের করল তে মোয়া। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে বসল মার্টিন।

'না! ও ঈশ্বর! না! আমাকে মেরো না!' আর্তনাদ করল সে।

'জলদি তে মোয়া!' অসহিষ্ণু কণ্ঠে নির্দেশ দিল মিনারী।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল মার্টিন। নিহাউও লাফ দিল। ঠেসে ধরে বসিয়ে দিল ওকে। নিহাউ সরে দাঁড়াতেই আবার দাঁড়াতে গেল মার্টিন। একই সময় ছোরা চালাল তে মোয়া। এক কোপে ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেল মার্টিনের।

নিহত মানুষটার শেষ চিৎকারের অনুরণন তখনও বোধহয় মিলিয়ে যায়নি বাতাস থেকে। মার্টিনের কাটা মুণ্ডটা মাটিতে পড়ে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে গেছে বেশ কিছুদূর। তে মোয়া পেছন পেছন ছুটে গিয়ে ওটা তুলে নিয়ে ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্তে হাত ভরে নিচ্ছে। এই সময় কুঠার হাতে মিলস পৌঁছুল সেখানে। তে মোয়ার পেছনটা দেখতে পাচ্ছে ও। এক মুহূর্ত থেমে ভয়ঙ্কর হিংস্র এক গর্জন করে কুঠার উঁচিয়ে ছুটে গেল সে ইন্ডিয়ানটার দিকে। ঘাড় ফিরিয়ে মিলসকে দেখল তে মোয়া, এবং কোন মতে লাফ দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর সুযোগটুকু পেল।

ছুটে আসার ঝোঁকে মিলস ওকে পেরিয়ে গেল খানিকটা। তাল সামলে ঘুরে আবার কুঠার তোলার আগেই ঝোপের ওপাশ থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল মিনারী। হাতের লাঠিটা তুলে সর্বশক্তিতে আঘাত হানল মিলস-এর কুঠার ধরা হাতে। কুঠারটা ছিটকে চলে গেল এক দিকে আর হাতটা শক্তিহীন হয়ে ঝুলতে লাগল দেহের পাশে। বিপদ বুঝে মিলস পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই নিহাউ চলে এসেছে ঝোপের এ পাশে। হাতের লোহা-কাঠের ডাণ্ডাটা সে প্রাণপণ শক্তিতে বসিয়ে দিল মিলস-এর মাথায়।

পরিষ্কার জায়গাটার ওপাশে ঘন ঝোপের ভেতর নিয়ে গেল ওরা দেহ দুটো। নিহাউ এবার তার ছুরি বের করে মিলস-এর মাথাটা আলাদা করে নিল ধড় থেকে। তে মোয়া কাছের এক লোহা-কাঠ গাছ থেকে লম্বা, সরু, সোজা একটা ডাল কেটে এনে সেটার এক প্রান্ত কেটে ছুঁচাল করে মার্টিনের মুণ্ডটা মাটিতে রাখল কাত করে।

ডালটা এক আঘাতে মুণ্ডটার এ কান দিয়ে ঢুকিয়ে বের করে আনল ও কান দিয়ে। তারপর ওটা বের করে সেই ছিদ্র দিয়ে ঢোকাল নমনীয় বাকলের একটা ফালি। ফালিটা গিঁট দিয়ে নিল তার হাঙরের চামড়ার কোমরবন্ধে। মিলস্-এর মুণ্ডটারও একই গতি করল নিহাউ। মিনারী আর তেতাহিতি একটু দূরে দাঁড়িয়ে নীরবে দেখল দু'জনের কাজ। তারপর বলল:

'চলো!'

বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা পাহাড়ের দিকে। কিছুক্ষণ পর পাহাড়টার পশ্চিমাংশে একটা গর্ত মত জায়গায় পৌঁছাল। দুই পথের সংযোগস্থল এখান থেকে খুব বেশি হলে বারো কদম ওপরে। গর্তটার চার কিনারে ঘন হয়ে জন্মেছে ফার্ন। ভাল করে না দেখলে গর্ত আঁছে কিনা টেরই পাওয়া যায় না। গর্তটায় নেমে পড়ে গুঁড়ি মেরে বসল মিনারী। অন্যরাও তাকে অনুসরণ করল। নিহাউয়ের দিকে ফিরল মিনারী।

'ওখানে গিয়ে বস তুই,' গাছপালায় ঢাকা ছোট্ট টিলাটার দিকে ইশারা করে বলল সে। 'কাউকে আসতে দেখলে এখানে এক মুঠো মাটি ছুঁড়ে সঙ্কেত দিবি।'

নিহাউ তার মাস্কেট নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ফার্নের ভেতর।

'এই বুদ্ধিটা সুন্দর হয়েছে,' মন্তব্য করল তেতাহিতি।

'এ ভাবে মানুষ মারায় কোন পৌরুষ নেই, তবু এটা করতে হবে আমাদের,' বলল মিনারী। এরপর আর কোন কথা হলো না ওদের ভেতর।

একটু পরেই হালকা কয়েকটা নুড়ি এসে পড়ল ওদের সামনে। মিনারী বুকে হেঁটে এগোতে শুরু করল। গর্তের কিনারে পৌঁছে সাবধানে মাথা উঁচু করে দেখল। পর মুহূর্তে মাথা নিচু করে পিছিয়ে এল সে।

'কে?' তেতাহিতি জিজ্ঞেস করল ফিসফিস করে।

ওর দিকে তাকাল না মিনারী। 'তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ অন্তত আজ যুদ্ধের নেতার মত মেনে চলবে আমাকে। সুতরাং কোন প্রশ্ন না। অপেক্ষা করো এখানে–তোমরা দু'জনেই।'

তেতাহিতি হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেখার চেষ্টা করল নিচের বন ছাওয়া ঢাল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। নিচু হলো আবার ও। মিনারীর মাস্কেটটা তার হাতে দিয়ে বলল, 'তোমার লাঠি এখানে থাক। যাও তাড়াতাড়ি।'

ওরা যেখানে লুকিয়ে আছে সেখান থেকে দু'শো গজ মত দূরে একটা টিলার পাশে ছোট একটা ঘর তৈরি করা হয়েছে অস্ত্রপাতি, কখনও কখনও কম পরিমাণে ফসল বা বীজ ইত্যাদি রাখার জন্যে। নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেল মিনারী ঘরটার দিকে। ওটা যখন পুরোপুরি দৃষ্টিপথের ভেতর এসে গেল থামল সে। কয়েক মুহূর্ত পরেই ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে এল ক্রিশ্চিয়ান। হাতে কুঠার। কোন দিকে না তাকিয়ে পথ ধরে নেমে যেতে লাগল সে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল বনের ভেতর। মিনারী সাবধানে মাস্কেটের গুলি-বারুদ পরীক্ষা করল। একটু পরেই সামনের বন থেকে ভেসে আসতে লাগল নিয়মিত বিরতিতে কুঠার চালানোর শব্দ। মাস্কেট হাতে উঠে দাঁড়িয়ে সেই শব্দ লক্ষ্য করে এগোল মিনারী।

কিছু দূর গিয়ে দেখতে পেল ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গার প্রান্তে বিরাট এক

পুরাউ গাছের গোড়ায় কুঠার চালাচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান। মিনারীর দিকে ওর পিঠ।

এক হাতে মাস্কেট ধরে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল মিনারী। ক্রিশ্চিয়ানের দশ কদম দূরে পৌঁছে থামল।

'ক্রিশ্চিয়ান,' শান্তকণ্ঠে ডাকল সে।

ঘাড় ফেরাল ক্রিশ্চিয়ান। কুঠারটা গাছের সঙ্গে ঠেকনা দিয়ে রেখে সোজা হলো। মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে মুখে।

'আ, মিনারী,' বলল সে। হাসির জবাবে ইন্ডিয়ান গোত্রপতির মুখে হাসি ফুটল না দেখে আস্তে আস্তে হাসি মিলিয়ে গেল ক্রিশ্চিয়ানের। 'কী ব্যাপার?' উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করল সে।

মিনারী কিছু বলল না। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ক্রিশ্চিয়ানের চোখের দিকে। আস্তে আস্তে উঁচু হচ্ছে ওর মাস্কেটের নল। ক্রিশ্চিয়ানের চোখে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে বিস্ময়। তারপর হঠাৎ যেন বিপদ টের পেল সে। লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল এক পা, হাত বাড়াল কুঠারের দিকে। দ্রুত মাস্কেটের বাঁট কাঁধে লাগিয়ে গুলি করল মিনারী। দু'হাত তুলে একটা পাক খেয়ে গাছের ওপর আছড়ে পড়ল ক্রিশ্চিয়ান। তারপর আস্তে আস্তে বসে পড়তে লাগল হাঁটু ভাঁজ হয়ে। মাথাটা নোয়ানো, দুলছে অল্প অল্প। হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

বারো

আলেকজান্ডার স্মিথের টারো বাগান বসতি থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ দূরে এক জলাভূমিতে। সকাল থেকে ও কাজ করছে সেখানে হাঁটু-কাদায় দাঁড়িয়ে। শ্যাওলা জলজ ঘাস ইত্যাদি বেছে ফেলছে নতুন লাগানো চারাগুলোর চারপাশ থেকে। কাজ করতে করতে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল স্মিথ। ওর নাম ধরে ডাকছে কে যেন। চোখ তুলে কাউকে দেখতে পেল না। কয়েক মুহূর্ত পরেই জেনি বেরিয়ে এল এক ঝোপের আড়াল থেকে। সোজা ছুটে আসছে ওর দিকে।

'কী হয়েছে, জেনি?'

'তাড়াতাড়ি এসো!' যন্ত্রণাকাতর স্বরে বলল মেয়েটা। জলাভূমির প্রান্তে পৌঁছে দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিল সে। স্মিথ দেখল রক্তে মাখা হাত দুটো। শঙ্কা ফুটে উঠল ওর চেহারায়।

'আমার মা, ব্রাউনের রক্ত এ!' রুদ্ধশ্বাসে বলল জেনি। 'তেতাহিতি খুন করেছে ওকে! গুলির শব্দ শোনোনি?'

'শুনেছি, কিন্তু…'

'তেতাহিতি ওকে খুন করেছে, বিশ্বাস করো আমার কথা! ওরা সব ক'জন একজোট হয়েছে–তেতাহিতি, মিনারী, নিহাউ আর তে মোয়া। মাস্কেট, লাঠি, ছোরা সব আছে ওদের কাছে। তিন জন এরমধ্যেই মরেছে। ক্রিশ্চিয়ান কই?'

'আউতে উপত্যকায় গেছে।'

'তাহলে ও-ও মরবে! এসো জলদি! কিছু একটা অস্ত্র নাও!'

'দাও, জেনি! বলছ···'

'তুমি আসবে?' হাত ঝাঁকিয়ে চিৎকার করল জেনি। 'মিলস-এর কাটা মাথা আমি দেখেছি! নিহাউ-এর কোমরে ঝুলছে! এখন ওরা তোমাকে খুঁজছে!'

দূর পুব থেকে অস্পষ্ট একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

'শুনেছ! এবার বিশ্বাস হচ্ছে আমার কথা? শুয়োর না, মানুষ মারছে ওরা!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বসতির দিকে ছুটতে শুরু করল জেনি। কাদা থেকে উঠে স্মিথও ছুটল পেছন পেছন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাছে পৌঁছে হাত ধরে থামাল জেনিকে।

'মাইমিতিকে এ-সবের কিছু জানানো চলবে না, জেনি! বুঝেছ আমার কথা? এখন আমি যা বলছি করো! ইয়ং ওর বাড়িতে ঘুমাচ্ছে। ওকে গিয়ে সাবধান করো। বোলো, আমি আসছি এক্ষুণি ওর বাসায়। ক্রিশ্চিয়ানের মাস্কেটটা নিয়ে আসি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ছুটে চলে গেল জেনি ইয়ং-এর বাড়ির দিকে।

ক্রিশ্চিয়ানের বাড়িতে কোন সাড়া শব্দ নেই। দরজা হাট করে খোলা। হালকা পায়ে ঢুকল স্মিথ। বলহাদি ঘুমিয়ে আছে মাইমিতির ঘরের দরজায়। আলতো করে কাঁধে হাত ছুঁইয়ে ওকে একটু নাড়া দিল স্মিথ। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বলহাদি চোখ ডলতে ডলতে। 'আউএ! ও, আলেক্স, তুমি! শশ্‌শ্‌! সারারাত পরে একটু ঘুমিয়েছে মাইমিতি! ওকে জাগিয়ে দিও না!'

'ক্রিশ্চিয়ানের মাস্কেটটা কই, বলহাদি?'

'মাস্কেট? দাঁড়াও দেখি। হ্যাঁ, পাশের ঘরের দেয়ালে ঝোলানো আছে।'

'নিয়ে এসো। বারুদের চোঙ আর গুলির থলেটাও এনো।'

দরজার কাছে এসে বাইরে তাকাল স্মিথ। নিশ্চুপ জনহীন পড়ে আছে সামনের ফাঁকা জায়গাটা। অশান্তির কোন চিহ্ন নেই। মাস্কেট নিয়ে ওর পেছনে এসে দাঁড়াল বলহাদি।

'কী হয়েছে, আলেক্স?' নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

বলহাদিকে ধরে বাড়ির বাইরের ছোট্ট গুদাম ঘরটার কাছে নিয়ে এল স্মিথ।

'তুমি যেটা ভয় পাচ্ছিলে সেটাই ঘটেছে, বলহাদি,' বলল সে। 'মাওরিরা সাদা মানুষদের খুন করছে।'

'আউএ!'

'হ্যাঁ। জেনি একটু আগে খেত থেকে তুলে এনেছে আমাকে। ও বলছিল, তিনজন এর মধ্যেই মারা গেছে। ও নিহাউয়ের বেল্টে মিলস-এর কাটা মাথা দেখেছে, তে মোয়ার বেল্টে মার্টিনের। ব্রাউনকে মেরেছে তেতাহিতি। মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানও হয়তো···, তবে এখনও সেটা ঠিক মত জানা যায়নি। ইয়ং কই?'

'বাড়িতে আমার মনে হয়। যাও, আলেক্স, তাড়াতাড়ি যাও!'

'তুমি মাইমিতির কাছে থাকো। কিছু বোলো না ওকে···'

'মাথা খারাপ! কী ভাবো আমাকে? যাও! আর দেরি কোরো না!'

ক্রিশ্চিয়ান আর ইয়ং-স্মিথের বাড়ির মাঝের জায়গাটুকু বন ছাওয়া। সাবধানে চারদিকে তাকাতে তাকাতে তার মাঝ দিয়ে এগোল স্মিথ। বনের প্রান্তে পৌঁছে

দেখল, জেনি, প্রুডেন্স আর টাউরুয়া দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির দরজায়। ওকে দেখেই ছুটে এল টাউরুয়া।

'নেড এখানে নেই, আলেক্স,' বলল সে; ভয়ে, দুর্ভাবনায় কাঁপছে তার গলা। 'ভোরের সামান্য আগে ও ঘুমাতে এসেছিল–আমি জানি। আমি এসেছি একটু আগে। এসে ওকে দেখিনি। এখন কোথায় খুঁজব?'

'যেখান থেকেই হোক খুঁজে বের করতে হবে!'

'যদি এখনও বেঁচে থাকে তাহলে। একটু আগে কুইনটালের খেতের ওদিক থেকে দুটো গুলির শব্দ শুনলাম!'

'আমিও শুনেছি। ছুটে যাও, আমার মাস্কেটটা নিয়ে এসো তো!'

টাউরুয়া ফিরল একটা মাত্র কাটল্যাস নিয়ে।

'একটা মাস্কেটও নেই,' বলল সে। 'তোমারটাও না, নেডেরটাও না। নিশ্চয়ই রাতে ওরা এসে নিয়ে গেছে।'

'তাহলে এটা রেখে দাও তুমি।' ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ি থেকে আনা মাস্কেটটা টাউরুয়ার হাতে দিল স্মিথ। 'কাটল্যাসটা আমাকে দাও।'

'কী করবে তুমি?'

'মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব, যদি তিনি বেঁচে থাকেন। এখন যাও, তোমরা তিনজনই, ইয়ংকে খুঁজে বের করো। আমি আউতে উপত্যকার দিকে যাচ্ছি। যদি দেখি অন্য সবাই মারা পড়েছে গোট-হাউসের কাছে কোথাও লুকিয়ে পড়ব। ইয়ংকে পেলে ওখানে চলে আসতে বোলো।'

আবার বনের ভেতর ঢুকে পড়ল স্মিথ। আর তিন রমণী আলাদা হয়ে খুঁজতে শুরু করল ইয়ংকে।

টাউরুয়া মাস্কেটটা লুকিয়ে রেখে সাগরের দিকে ঢাল বেয়ে এগোল আশপাশের প্রতিটা ঝোপ, ঢালের প্রতিটা গর্ত, খানাখন্দক পরীক্ষা করতে করতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ে গেল ইয়ংকে। ঘাসে ছাওয়া একটুকরো জমিতে ঘুমিয়ে আছে। ওকে উঠিয়ে জড়িয়ে ধরল টাউরুয়া। এক মুহূর্ত বসে রইল ওর বুকে মুখ গুঁজে। তারপর তড়বড় করে বলে গেল যা ঘটেছে বা ঘটছে সব। নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ইয়ং।

'নেড! তুমি জেগে আছ?' চিৎকার করল টাউরুয়া। 'আমার কথা বুঝতে পারছ?'

'ভাল মত। মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান সম্ভবত মারা গেছেন। বলছ আলেক্স মাস্কেটটা রেখে গেছে আমার জন্যে? কেন ওকে এ কাজ করতে দিলে, টাউরুয়া?'

'কেন? কারণ তোমার চেয়ে ওর গায়ে শক্তি বেশি! কাটল্যাস দিয়েই ও আত্মরক্ষা করতে পারবে।'

ইয়ং উঠে দাঁড়াল। 'এক্ষুণি ওকে খুঁজে বের করতে হবে। মাস্কেটটা কোথায়?'

'এসো আমার সাথে। বাড়ির কাছে এক ঝোপে লুকিয়ে রেখেছি।'

প্রুডেন্স আর জেনি ফিরে এসেছে ইয়ং-এর বাড়িতে। বাড়ির পুব পাশের দেয়ালে

একটা জানালা আছে, যেখান দিয়ে খাঁড়ির দিকের পথটা দেখা যায়। প্রুডেন্স তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে সেই জানালার পাশে বসে নজর রাখছে পথের দিকে। পশ্চিম পাশের দেয়ালেও একটা জানালা আছে। সেখানে বসে নজর রাখছে জেনি। ইয়ংকে ঘরে বসিয়ে টাউরুয়া ঝোপের ভেতর থেকে নিয়ে এল মাস্কেটটা। বারুদের চোঙটা অর্ধেক ভর্তি, আর গুলি আছে মোটে চারটে। ইয়ং সবে মাস্কেটটায় গুলি-বারুদ ভরতে শুরু করেছে, প্রুডেন্সের নিচু কণ্ঠস্বর শোনা গেল জানালার কাছ থেকে:

'লুকাও, নেড!···মিনারী!'

ছো মেরে ওর হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেল টাউরুয়া। দুটো বড় জাহাজী সিন্দুক আছে এ ঘরে বিছানার কাছে। দু'সিন্দুকের মাঝখানে ইয়ংকে বসিয়ে ওপরে বড় একটা টাপা চাদর মেলে দিল টাউরুয়া। জেনি চলে গেল শোয়ার জায়গার পাশে টানানো পর্দার পেছনে। প্রুডেন্স জানালার কাছেই রইল। মেয়ের সঙ্গে খুনসুটি করতে লাগল। টাউরুয়া দ্রুত বাইরের ঘরে চলে এসে কোণের দিকের একটা টুলে বসে নারকেল কোরাতে লাগল আপন মনে। দরজায় দেখা গেল মিনারীকে। মুখ তুলে একটু হাসল টাউরুয়া। আগে কথা বলার মত সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারল না ও।

'কোথায় যাচ্ছ, মিনারী?' প্রুডেন্স জিজ্ঞেস করল। 'সারা সকাল তুমিই শুয়োর মেরে বেড়াচ্ছ?'

'এ,' জবাব দিল গোত্রপতি, 'উইলিয়ামস আর আমি। বিরাট একটা মর্দা শুয়োর আমরা জখম করেছি পাহাড়ের ওপর। গুলি খেয়ে মূল উপত্যকার দিকে নেমে গেছে ব্যাটা, এখনও খুঁজে পাইনি। ইয়ং কোথায়, টাউরুয়া?'

'মাছ ধরতে গেছে, খাঁড়িতে। সেই ভোরে।'

সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে ঘরের চারপাশে দৃষ্টি বুলাল মিনারী।

'ব্রাউনের বাড়ির কাছ দিয়ে যদি যাও,' প্রুডেন্স বলল, 'জেনিকে একটা খবর দিতে পারবে?—ওর জন্যে এক আঁটি খাগড়া জোগাড় করেছি আমি, বিকেলে দিয়ে আসব।'

'বলব ওর সঙ্গে দেখা হলে।' মাস্কেট তুলে নিয়ে দুই নারীর দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে বিদায় নিল মিনারী। 'আ নোহো, ওরুয়া।'

'হায়েরে ওএ,' জবাব দিল মেয়ে দুটো।

ঘুরে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলে গেল মিনারী। প্রুডেন্স জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল।

'ওকে বোকা বানাতে পেরেছি আমরা, টাউরুয়া,' ফিসফিস করে বলল সে 'ভেবেছে আমরা কিছুই জানি না।'

'পথ ধরে যাচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল টাউরুয়া।

'হ্যাঁ।···এই চোখের আড়ালে চলে গেল।'

টাউরুয়া লাফ দিয়ে উঠে পাশের ঘরে ঢুকল। কয়েক সেকেন্ড পর প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ইয়ং। হারিয়ে গেল বনের ভেতর।

মাঝ সকাল এখন। বেশ কিছুক্ষণ হয় ইয়ং চলে গেছে। তিন রমণী দরজার কাছে

একটা বেঞ্চে বসে নিচু স্বরে আলাপ করছে।

'মিনারী বাঁচাতে চেয়েছিল ব্রাউনকে?' জেনির একটা কথার পিঠে প্রশ্ন করল টাউরুয়া।

'মনে হয়,' জবাব দিল জেনি। 'ও ইচ্ছে করলেই মারতে পারত ওকে। ঘটনাটা ঘটেছে এরকম: আমরা বাড়ির পাশের ইয়াম খেতে নিড়ানি দিচ্ছিলাম। ওখানেই দেখতে পায় আমাদের মিনারী। দুপদাপ পা ফেলে এসে ও বলল, "বেশি কথা বলার সময় নেই। সাদা মানুষদের তিনজন মরেছে। তেতাহিতি, নিহাউ, তে মোয়া আর আমি ওদের মেরেছি। ব্রাউন ছাড়া বাকি সব কটাও মরবে। ব্রাউনকে আমি চেষ্টা করব বাঁচাতে। আমি ওর মাথার ওপর দিয়ে গুলি করব। ও হুমড়ি খেয়ে পড়ে যদি মরার মত ভান করে থাকে এবং অন্যরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত নড়াচড়া না করে তাহলে বেঁচে যাবে। আমরা চলে যাওয়ার পর বনের ভেতর লুকিয়ে পড়বে ও।" এই বলে ও আকাশের দিকে গুলি করে এবং নিজেই ব্রাউনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে বলে, "এভাবে পড়ে থাকো, নড়বে না।" তারপর আমাকে বলল, "ঘরে গিয়ে বসে থাকো চুপচাপ। অন্যরা এক্ষুণি এসে পড়বে!" এর পর ও তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল বনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এল অন্য তিনজন। বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমি দেখছিলাম। ব্রাউনকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেই ওরা দাঁড়িয়ে গেল। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল ওর কাছে, ব্রাউন ওদের শব্দ পায়নি। এই সময় ও মাথাটা সামান্য কাত করে দেখার চেষ্টা করে। তেতাহিতি দশ পা-ও দূরে ছিল না ওর কাছ থেকে। মাস্কেট তুলে সোজা ওর মাথা তাক করে গুলি করে সে। ওকে মাস্কেট তুলতে দেখেই আমি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তার আগেই যা হবার হয়ে গেছে। ওরা তিনজন আমার হাত পা বেঁধে ঘরে নিয়ে ফেলে রাখে। তারপর অনেক কষ্টে বাঁধন খুলে ছুটে গেছি আলেক্সকে সাবধান করতে।'

'এখন আমি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা,' বলল টাউরুয়া। 'নিশ্চয়ই মিনারী আগে খুন করেছে তেতাহিতির বন্ধু ক্রিশ্চিয়ানকে। ওদের ভেতর ঝগড়া হয়েছিল সম্ভবত কে মরবে আর কে...'

'জানোয়ার! ইতর কুত্তা!' বলল জেনি, প্রতিহিংসায় জ্বলছে ওর চোখ। 'আমার নিরীহ স্বামীকে খুন করল মাটিতে শুয়ে থাকা অবস্থায়! আউএ! আউএ!'

দু'হাতে মুখ ঢাকল সে। কিন্তু আর কোন শব্দ করল না। কান্নার সময় এখনও হয়নি।

'নানাই নিশ্চয়ই জানত একথা,' হিংস্রকণ্ঠে বলল প্রুডেন্স। 'শুধু নানাই কেন, মোয়েটুয়াও নিশ্চয়ই জানত, আজ কী ঘটবে, অথচ ওরা একবার সাবধানও করল না আমাদের!'

'ভুল ভাবছ তুমি, প্রুডেন্স,' জবাব দিল টাউরুয়া। 'আমার মনে হয় না মিনারী, তেতাহিতি বউদের জানিয়ে শুনিয়ে এ কাজ করেছে।'

'তবু সারা জীবন আমি ওদের ঘৃণা করে যাব।'

'তা ঠিক,' বলল টাউরুয়া, 'কিন্তু ওদের দোষ দেয়া যায় না। ভোরে দু'জনের সাথেই আমার দেখা হয়েছে। ওরা যদি কিছু জানত ওদের মুখ দেখেই আমি আন্দাজ করতে পারতাম। না, ওরা আমাদের মতই নিরপরাধ।'

নিচু কণ্ঠে কথা বলতে বলতে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। প্রুডেন্সের বাচ্চা জেগে উঠে কান্না জুড়ে দিয়েছে। ও ঘরে গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে এল। টাউরুয়া জেনির কাঁধে হাত রাখল। এই সময় আবার কান্নার শব্দ।

দু'জন এক সাথে ঘাড় ফেরাল। সামনে পথের বাঁকে দেখতে পেল মেরি আর সারাহকে। যার যার বাচ্চা কোলে ছুটতে ছুটতে আসছে ওরা। মেরি কাঁদছে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত।

'টাউরুয়া! টাউরুয়া, ওরা এখানে এসেছিল?' কাছে এসে চিৎকার করল মেরি।

'আগে বলো, তোমাদের পুরুষরা মরে গেছে না বেঁচে আছে?'

'মনে হয় মরে গেছে! মিনারী···'

'দূর, মেরি,' বাধা দিয়ে বলল সারাহ, 'এখনও আমরা জানি না ওরা মারা গেছে কিনা।'

'নিশ্চয়ই গেছে! ম্যাককয়-এর কাছে আছে কেবল ওর বুশ-নাইফটা, কুইনটালের কাছে কিছুই নেই। কী করে ওরা বাঁচবে? আউএ, প্রুডেন্স! তুমিও এখানে? তোমার পুরুষ তো নেই! আ হা হা রে! এবার আমাদেরগুলোও যাবে!'

নবাগত দুজনকে নিয়ে ঘরে ঢুকল ওরা। মেরি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল। টাউরুয়া ওর বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল।

'কী হয়েছে, সারাহ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'গুলির শব্দ শোনোনি?'

'হ্যাঁ।'

'কুইনটালকে গুলি করেছিল ওরা। ও আর ম্যাককয় বেড়া দিচ্ছিল বাড়ির চারদিকে। কুইনটাল বনে ঢুকেছিল আর্গে কেটে রাখা খুঁটিগুলো নিয়ে আসার জন্যে। যাওয়ার সময় কুঠারটা দিয়ে গেছিল আমার কাছে ধার করতে। ধার করে ওটা যখন দিয়ে আসতে যাচ্ছি তখন মিনারী আর তে মোয়া বেরিয়ে আসে এক ঝোপের পেছন থেকে। তে মোয়ার সারা গা রক্তে মাখা, কোমরে ঝুলছে মার্টিনের কাটা মাথা। মিনারী আমার কাছ থেকে কুঠারটা নিয়ে আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলে। ঠিক সেই সময় আমার পুরুষকে দেখলাম এক বোঝা খুঁটি কাঁধে বেরিয়ে আসছে বনের ভেতর থেকে। ওকে দেখে চিৎকার করে উঠলাম আমি। মিনারী আর তে মোয়া ছুটে গেল ওর দিকে। ছুটতে ছুটতেই গুলি করল দু'জন। কিন্তু লাগাতে পারেনি। ততক্ষণে কাঁধের বোঝা ফেলে আবার বনের দিকে দৌড় দিয়েছে কুইনটাল।'

'ম্যাককয়-এর খবর কী?'

'ও বাড়িতেই ছিল। আমি ছুটে এসে ওকে সাবধান করি। ও তক্ষুণি পালিয়ে যায়। একটু পরে খুনীগুলো এসে পায়নি ওকে।'

'তোমাদের মাস্কেটগুলো আছে?'

'না। সকালে উঠেই খেয়াল করেছি, যেখানে সাধারণত থাকে সেখানে নেই ওগুলো। অবাক হয়ে ভাবছিলাম কোথায় গেল।'

'কে কে এসেছিল ম্যাককয় পালানোর পর?'

'তেতাহিতি আর নিহাউ। তেতাহিতিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কুইনটালকে মারতে পেরেছে কিনা। ও কোন জবাব দেয়নি। যখন ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে

তখন নিহাউ হঠাৎ দরজার কাছে থেমে বলে, "তোমার মরদ মরেছে কিনা জানতে চাও?" আমি বলি, "হ্যাঁ।" ও জবাব দেয়, "এটুকুই শুধু জেনে রাখো, কাল তুমি আমার মেয়েমানুষদের একজন হবে; আর তে মোয়া নেবে মেরিকে।" এরপর আর না দাঁড়িয়ে ও চলে যায় তেতাহিতির পেছন পেছন।'

'কোন্ দিকে গেছে ওরা?'

'দ্বীপের ভেতর দিকে। নেড-এর খবর কী, টাউরুয়া? আর ক্রিশ্চিয়ানের, আলেক্স-এর?'

'মরে গেছে! মরে গেছে!' আতঙ্কিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল মেরি। তারপর আবার ভেঙে পড়ল কান্নায়। টাউরুয়ার পা দুটো আঁকড়ে ধরল শক্ত করে। জেনি রূঢ়ভাবে সেখান থেকে সরিয়ে আনল ওকে। ধমক দিল কড়া গলায়: 'চুপ! থামো! এমন ছিঁচকাদুনের মত করছ কেন? বুকে সাহস আনো!'

'এমন অপদার্থ মেয়েমানুষ হয়?' নিচুকণ্ঠে বলল প্রুডেন্স। 'ছেড়ে দাও, জেনি। খামোকা সময় নষ্ট করছ।'

আর কিছুক্ষণ ওরা চেষ্টা করল মেরিকে থামানোর। কিন্তু পারল না। ক্রমেই আরও বেশি হিস্টিরিয়া আক্রান্তের মত হয়ে উঠছে তার কান্না। টাউরুয়ার শরীরের সাথে সেঁটে যেতে চাইছে। চোখে ফুটে উঠেছে মৃত্যুভয়।

'চলো,' কাঁদতে কাঁদতেই মেরি রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করল, 'চলো, পালাই আমরা! ওরা আমাদেরও খুন করবে! হ্যাঁ···আমাদের সবাইকে খুন করবে! শৃশ্‌শ্‌! কিছু শুনতে পাচ্ছ?'

ভয়ার্ত চোখে দরজার দিকে তাকাল সে। টাউরুয়া কোমলকণ্ঠে বলল, 'না, মেরি, আমাদের কোন ভয় নেই। মেয়েমানুষদের ওরা মারবে না।'

'মারবে! মারবে! তুমি দেখোনি ওদের! রক্তপাগল হাঙরের মত হয়ে উঠেছে সব ক'জন!'

প্রুডেন্স এগিয়ে এসে কষে এক চড় লাগাল মেরির গালে। চিৎকার করল, 'থামবে তুমি?'

চিৎকারে যতটা না কাজ হলো তার চেয়ে বেশি হলো চড়ে। চুপ হয়ে গেল মেরি। কান্না থেমে গেল। টাউরুয়া ওকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল পাশের ঘরে বিছানায়। অন্যরা অপেক্ষা করতে লাগল এ ঘরে। একটু পরেই ফিরে এল টাউরুয়া।

'ঘুমিয়ে যাবে শিগ্‌গিরই,' বলল সে।

'ঘুমালেই ভাল,' বলল জেনি। মেরির দু'বছরের ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে যোগ করল, 'ছেলেটার দশা কী হবে যদি মায়ের স্বভাব পায়?'

দরজার কাছে গিয়ে রাস্তার ওপাশে বনের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল টাউরুয়া। তারপর বলল, 'আমি মাইমিতির কাছে যাচ্ছি। বলহাদি একা আছে। তোমরা তিনজন থাকো এখানে।'

'আর বসে বসে মাছি মারি যখন আমাদের স্বামীরা মরছে?' বলল জেনি। 'আমি অন্তত তা পারব না।'

'কী করবে তাহলে?' জিজ্ঞেস করল সারাহ।

'আর কিছু না পারি, আমার পুরুষ পড়ে আছে বাড়ির সামনে মাটিতে, ওকে পিঁপড়ের খোরাক হওয়া থেকে বাঁচাতে তো পারব। প্রুডেন্স, যাবে আমার সঙ্গে?'

'না, না, প্রুডেন্স! থাকো!' অনুনয় করল সারাহ। 'মেরির সাথে একা রেখে যেও না আমাকে!'

'এখানে কোন বিপদ হবে না তোমার, সারাহ,' টাউরুয়া বলল। 'আমাদের যদি ওরা মারতে চাইত তোমার কী মনে হয় আরও আগে পারত না মরতে? জেনি ঠিকই বলেছে। আমাদের পুরুষদের জন্যে কিছু করতে হবে আমাদের। শোনো, জেনি, হুটিয়াকে খুঁজে বের করো। মনে হয় ব্রাউনের কুয়াতেই পাবে ওকে। ওকে নিয়ে তোমার পুরুষের দেহটা ঘরে তুলে জানার চেষ্টা করো কে কে মারা গেছে। আলেক্স আর ইয়ংকে যদি পাও বোলো, আমাদের ধারণা ম্যাককয় আর কুইনটাল এখনও বেঁচে আছে। অথবা, তুমি যদি চাও আমি যেতে পারি তোমার জায়গায়, তুমি মাইমিতির কাছে থাকো। প্রুডেন্স বাচ্চা নিয়ে এখানেই থাক।'

'তুমিই থাকো মাইমিতির কাছে,' জেনি জবাব দিল। 'আমি যাই।'

শেষ বিকেল। ইয়ং-এর বাড়ির সামনের বেঞ্চটায় একা বসে আছে প্রুডেন্স, সারাহ আর মেরি ঘরের ভেতর তাদের বাচ্চাদের নিয়ে। মেরি ঘুমায়নি, তবে এখন আর কান্নাকাটি করছে না আগের মত। তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। এর ভেতর কিছু শোনেনি, কিছু দেখেনি ওরা। অবশেষে ঘাড় ফেরাল প্রুডেন্স।

'টাউরুয়া আসছে,' বলল সে।

উদ্বিগ্ন মুখে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল মেরি আর সারাহ। টাউরুয়া একা আসছে।

'জেনি ফেরেনি?' সে জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল প্রুডেন্স। 'তুমি যাওয়ার পর কেউ আসেনি। ক্রিশ্চিয়ানের বাড়িতে কে আছে?'

'বলহাদি। আমি পৌঁছানোর একটু পরেই সুজানাহ এসেছিল। হুটিয়ার সঙ্গে ও ব্রাউনের কুয়ায় ছিল। জেনির কাছে খবর পাওয়ার আগে কিছুই শোনেনি ওরা। দু'জনই জেনির সঙ্গে গেছে। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

রান্নাঘরে গিয়ে খানিকটা ঠাণ্ডা পোড়ানো ইয়াম আর কাঁচকলা নিয়ে এল টাউরুয়া। টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, 'যে যে খাবে। প্রুডেন্স! মেরি! আর কিছু না হোক বাচ্চাদুটোর কথা ভেবে তোমাদের কিছু খাওয়া উচিত।'

বড় বাচ্চাদুটোকে খাবার দিতেই ওরা লোভীর মত খেতে শুরু করল। আর কেউ খাবার ছুঁলো না।

টাউরুয়া ফেরার পর মেরি আর সারাহ দরজার কাছে বেঞ্চটায় গিয়ে বসার সাহস পেল। প্রুডেন্স আর টাউরুয়াও বসল। চারজন বসে রইল পথের ওপাশে বনের দিকে তাকিয়ে।

'মাইমিতিকে বলোনি তো?' জিজ্ঞেস করল প্রুডেন্স।

'আমি গিয়ে দেখি সবে সে ঘুম থেকে উঠেছে,' জবাব দিল টাউরুয়া। 'মেয়েটাকে পেয়ে এমন খুশি ও! আমাকে বলছিল: "আমার আর কিছু চাইবার নেই,

টাউরুয়া।" একটু পরপরই আমাকে বা বলহাদিকে দরজায় পাঠাচ্ছিল ক্রিশ্চিয়ান আসছে কিনা দেখতে। এই অবস্থায় কী করে আমি ওকে বলি বলো? কী করে? কে পারবে?' বলতে বলতে দু'চোখ জলে ভিজে উঠল টাউরুয়ার। অন্যদেরও চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল। নিজেদের দুঃখের কথা ভুলে ওরা সদ্য মা হওয়া মেয়েটার দুঃখে কাঁদতে লাগল।

'কী করবে ও, টাউরুয়া?' অনেকক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল সারাহ।

'এখন এ নিয়ে ভাবব না আমরা,' চোখের পানি মুছতে মুছতে জবাব দিল টাউরুয়া। 'এখনও আমরা জানি না ক্রিশ্চিয়ান সত্যিই মারা গেছে কি না। যতক্ষণ না জানছি ততক্ষণ আশা করতে দোষ কী?'

সূর্য পশ্চিম পাহাড়ের আড়ালে চলে যাওয়ার পর ফিরল জেনি। সঙ্গে হুটিয়া আর সুজানাহ। তিনজনেরই গায়ের কাপড় কাদা মাটি মেখে, ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার, হাত পা কেটে ছড়ে গেছে অনেক জায়গায়। ওরা ঘরে ঢুকতেই জানালা দরজা সব বন্ধ করে দিল টাউরুয়া।

'এবার, জেনি?' সে জিজ্ঞেস করল।

'আগে একটু পানি দাও,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জেনি। 'গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

ঢকঢক করে পানি খেলো তিনজনই। তারপর জেনি শুরু করল, 'নিহাউ আর মিনারীকে দেখেছি আমরা, আর কাউকে না। ফার্নের ঝোপে লুকিয়ে ছিলাম। আমাদের প্রায় গায়ের ওপর দিয়েই চলে গেল দু'জন।'

'আমাদের কাছে মাস্কেট থাকলে দু'জনকেই শেষ করে দিতে পারতাম,' যোগ করল হুটিয়া।

'ওরা বোধহয় আবার আউতে উপত্যকায় যাচ্ছিল। পাহাড়ের ওপর দিক থেকে আসছিল। ওরা পেরিয়ে যাওয়ার পরপরই আমরা আবার রওনা হই। প্রথম যাই হুটিয়ার বাড়িতে। দরজার মুখেই পড়ে থাকতে দেখি উইলিয়ামস-এর দেহ। ওর মাথায় গুলি করা হয়েছে। লাশটা ঘরে তুলে গেলাম ক্রিশ্চিয়ান নতুন যে জমিটা পরিষ্কার করছে সেখানে। আধকাটা এক গাছের গোড়ায় হেলান দেয়া অবস্থায় একটা কুঠার দেখেছি, মাটিতে রক্তের দাগও দেখলাম কিন্তু অনেক খুঁজেও ওর লাশ পেলাম না।'

'মিলসকে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল প্রুডেন্স।

একটু ইতস্তত করল জেনি, দ্রুত এক পলক তাকাল হুটিয়ার দিকে। তারপর বলল, 'না। নিশ্চয়ই লুকিয়ে ফেলেছে ওরা।'

'আমাদের পুরুষদের কাউকে দেখোনি? কাউকে না?' কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সারাহ।

মাথা নাড়ল জেনি।

'তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই,' শান্তকণ্ঠে বলল টাউরুয়া। 'ওরা লুকিয়ে আছে কোথাও।'

'ওরা মরে গেছে!' দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল মেরি।

'থামো তো, মেরি!' ধমক দিল টাউরুয়া। 'কী বোকার মত কথা বলছ! ওরা

সবাই এতক্ষণে এক জায়গায় হয়েছে। নিশ্চয়ই তাই।'

'হলেও অস্ত্র ছাড়া কী ওরা করতে পারবে?'

'নেড-এর কাছে মাস্কেট আছে। আলেক্স স্মিথের কাছে কাটল্যাস। কুইনটাল শক্তি-সামর্থ্যে মিনারীর চেয়ে কম নয় কোন অংশে। ও নিশ্চয়ই জঙ্গল থেকে লাঠি জোগাড় করে নিয়েছে। অত হতাশ হওয়ার কিছু নেই, আমি বলছি!'

'তুমি কি ভাবো ওদের সব ক'জনকে মারার আগে মিনারী শান্ত হবে? কক্ষনো না। ও ভাল করেই জানে এক জন সাদা মানুষ বেঁচে থাকতেও ও নিরাপদে থাকতে পারবে না।'

'তা ঠিক,' হতাশ কণ্ঠে বলল সারাহ। 'দু'দলের এক দল শেষ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত শান্তির আশা আর নেই।'

'কে চাইছে শান্তি ওই চার খুনী শেষ না হওয়া পর্যন্ত?' সক্রোধে বলল জেনি। 'আমি দেখেছি, কী করে আমার অসহায় নিরপরাধ স্বামীকে গুলি করে মেরেছে তেতাহিতি। ওর মৃত্যু দেখার আগে আমি শান্ত হব ভাবো?'

'আর বোলো না,' বলল টাউরুয়া। 'যথেষ্ট রক্তপাত হয়েছে...'

থেমে গেল সে। কাছেই কোথাও থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এসেছে একটা। মেরি কানে হাত চাপা দিল সভয়ে। অন্যরা মুখ চাওয়াচাউয়ি করল।

'বাড়িটা গুছিয়ে ফেলি আমরা, এসো,' বলল টাউরুয়া। 'আমাদের পুরুষরা হয়তো আসবে এখানে আত্মরক্ষার জন্যে।'

'তোমরা গোছাও,' বলল জেনি। 'আমি দেখে আসি কী হলো, কে কাকে গুলি করল।' বলে এক মুহূর্ত দেরি না করে সে বেরিয়ে গেল বাইরে।

পথ পেরিয়ে বনের ভেতর ঢুকল জেনি। গাছ, ঝোপঝাড়ের পাশ কাটিয়ে ছুটে চলল যেদিক থেকে গুলির শব্দ এসেছে সেদিক লক্ষ্য করে। ইয়ং-এর বাড়ি থেকে দেড়শো গজ মত দূরে আধ একর পরিমাণ একটা জায়গা পরিষ্কার করে ইয়াম আর মিষ্ট আলু লাগানো হয়েছে। গুলির শব্দটা সেদিক থেকেই এসেছে। জায়গাটার প্রান্তে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল জেনি। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল খেতের ওপর। কাউকে দেখতে পেল না। আবার ছুটে চলল ও। কিছুদূর যেতেই দেখল এক কলা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে একটা কাটল্যাসের আগা। আশ পাশে ছড়িয়ে আছে তাজা রক্ত। রক্তে ভেজা একটা নগ্ন পায়ের ছাপও দেখল কলা ঝোপটার ওপাশে। সতর্ক চোখে মাটির দিকে তাকিয়ে আরও কয়েক পা এগোল জেনি। সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে দেখতে পেল আলেকজান্ডার স্মিথকে। মুখ থুবড়ে পড়ে গোঙাচ্ছে দুর্বল স্বরে। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল জেনি। দু'হাতে ধরে ওকে চিৎ করে মাথাটা তুলে নিল কোলে।

'জেনি?' চোখ খুলে জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করল স্মিথ।

দ্রুত ওকে পরীক্ষা করল জেনি। কাঁধ দিয়ে ঢুকে গলার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে গুলি। 'আলেক্স, আমার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা ঝাঁকাল আলেক্স। এক হাত জেনির কাঁধের ওপর দিয়ে অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াল সে। কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই শিথিল হয়ে এল তার দেহ। ঝুলে পড়ল জেনির কাঁধে রাখা হাতটা। জ্ঞান হারিয়েছে স্মিথ। ওকে নামিয়ে রেখে ইয়ং-

এর বাড়িতে ছুটে গিয়ে টাউরুয়া আর হুটিয়াকে নিয়ে জেনি এল জেনি। তিন জনে ধরাধরি করে নিয়ে চলল স্মিথকে। পনেরো মিনিট পর ওরা ইয়ং-এর বিছানায় শুইয়ে দিল ওকে। প্রচুর রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়েছে স্মিথ। ঘন ঘন শ্বাস টানছে।

'পরিষ্কার ক্ষত; গুলি এদিক দিয়ে ঢুকে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে,' বলল টাউরুয়া। 'বড় ধমনীটা ছোঁয়নি বোঝা যাচ্ছে। নইলে এতক্ষণ ও বাঁচত না।'

নিঃশব্দে দ্রুত কাজ করে গেল মেয়ে কটা। সুজানাহ পানি নিয়ে এল, টাউরুয়া আর জেনি রক্ত বন্ধ করার ব্যবস্থা করে বেঁধে দিল ক্ষতস্থান। এখনও অজ্ঞান স্মিথ। মুখটা ফ্যাকাসে। হুটিয়া দরজায় আর প্রুডেন্স জানালায় বসে নজর রাখতে লাগল পথের দিকে।

'মরা মনে করে ফেলে গেছে ওকে,' বলল জেনি। 'মিনারী যদি টের পেত এখনও বেঁচে আছে, নিশ্চয়ই এসে লাঠি পেটা করে মারত।'

'হ্যাঁ,' বলল টাউরুয়া, 'আমাদের তৈরি থাকতে হবে, যে কোন সময় ওরা এসে পড়তে পারে। আমি যাই, বলহাদিকে ডেকে আনি। ততক্ষণ তোমরা পাহারা দাও। ওদের কাউকে যদি আসতে দেখ সঙ্গে সঙ্গে আলেক্সকে একটা টাপা চাদর দিয়ে ঢেকে দেবে যাতে ওরা ভাবে ও মরে গেছে। এর ভেতর আলেক্সের জ্ঞান ফিরে আসলে বোলো ও যেন নড়াচড়া না করে মরার মত পড়ে থাকে। তোমরা পাশে বসে বিলাপ করে কাঁদতে থাকবে। বলহাদি এসে গেলে আর চিন্তা থাকবে না, ও পাওহিনো দিয়ে কপাল কেটে কাঁদতে পারবে।'

'এর চেয়ে ভাল বুদ্ধি আর হতে পারে না,' বলল জেনি। 'তুমি তাড়াতাড়ি কোরো, টাউরুয়া। তুমি যেমন বললে আমরা তেমন করব। আর দেখো বলহাদি যেন আসতে দেরি না করে।'

ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ির দিকে রওনা হলো টাউরুয়া। দুই বাড়ির মাঝে পথটা নির্জন। দ্রুত হেঁটে চলল ও। আধাআধি মত গেছে এই সময় শুনল ওর নাম ধরে ডাকছে কে যেন। দাঁড়িয়ে পড়ল টাউরুয়া। এক ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল নানাই। ইশারায় কাছে ডাকল ওকে। মুখে শীতল অভিব্যক্তি ফুটিয়ে এগিয়ে গেল টাউরুয়া।

'ইচ্ছে করলে আমাকে ঘৃণা করতে পারো,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল নানাই। 'আমার পুরুষ আজ যা করেছে তাতে তা ছাড়া আর কিছু আশা করা আমার উচিত না। তবু বলছি, বিশ্বাস করো, ওদের পরিকল্পনার কিছুই আমি জানতাম না। মোয়েটুয়াও আমার মতই নিরপরাধ।'

'আমি বিশ্বাস করতে চাই তোমার কথা,' জবাব দিল টাউরুয়া, 'কিন্তু তাতে তো মরা মানুষগুলো বেঁচে উঠবে না। আর কিছু বলার থাকলে বলতে পারো, আমার সময় নেই।'

'তোমার পুরুষ বেঁচে আছে...'

টাউরুয়া ছোঁ মেরে ওর হাত ধরল। 'সত্যি! সত্যি, নানাই? কোথায় আছে ও?'

'গোট-হাউস চূড়ায়। এমন এক জায়গায় লুকিয়েছে যেখান থেকে কেউ কোনদিন খুঁজে বের করতে পারবে না। আমিই ওকে দেখিয়ে দিয়েছি জায়গাটা।'

তীক্ষ্ণ চোখে নানাই-এর দিকে তাকাল টাউরুয়া। 'আমরা অনেক দিনের সখী,' বলল সে। 'তুমি আমাকে প্রতারিত করবে–আমি বিশ্বাস করি না।'

নানাইয়ের চোখ দুটো ভিজে উঠল, 'তুমি আমার বোনের মত, টাউরুয়া, নেড ভাই। তোমার অন্তরকে প্রশ্ন করে দেখ, আমার পক্ষে তোমাকে ঠকানো সম্ভব কি না। একটা কথা, টাউরুয়া, নেড যদি বেঁচে যায়, মন থেকে প্রতিশোধের চিন্তা দূর করতে হবে ওকে। তেতাহিতি আমার স্বামী।'

'দেখ, নানাই, আমি যা বুঝি, তেতাহিতি এবং ওর সঙ্গের সব ক'জনকে হত্যা করলেও যারা মারা গেছে তারা আর বেঁচে উঠবে না। আমি কথা দিচ্ছি না যে ওকে প্রতিশোধ নেয়া থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব, এটুকু বলতে পারি আমার সাধ্যমত আমি চেষ্টা করব।'

'এটুকুই যথেষ্ট, টাউরুয়া। মিনারী রাগে ভয়ঙ্কর হয়ে আছে ঠিক, তবে খুনের নেশা এক সময় কাটবে ওর। ততক্ষণ নেড যদি লুকিয়ে থাকতে পারে তাহলেই আর চিন্তা নেই। তেতাহিতিও তা-ই চাইবে–আমি জানি। মোয়েটুয়া আর আমি এ ব্যাপারে তোমাদের পাশে আছি সর্ব সময়।'

'আলেক্স মারাত্মক জখম হয়েছে। আমরা ওকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে গেছি। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানের কোন খোঁজ এখনও পেলাম না।'

'মোয়েটুয়া কাছেই আছে। ওকে নিয়ে আমি এক্ষুণি বেরোচ্ছি ক্রিশ্চিয়ানের খোঁজে। এখনও যদি বেঁচে থাকে, আমরা ওকে সাহায্য করতে পারব আশা করি। যা-ই ঘটে থাকুক আমরা জানতে পাওয়া মাত্র তোমাকে জানাব। এদিকে তুমি অন্যদের মন নরম করার চেষ্টা করো আমাদের দু'জনের প্রতি। আমাদের স্বামীরা যা করেছে; ক্ষমার অযোগ্য সে কাজ, কিন্তু মোয়েটুয়া আর আমি নিরপরাধ।'

'চেষ্টা করব,' বলল টাউরুয়া। 'তবে সব শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ওদের কাছ থেকে দূরে থাকলেই ভাল করবে তোমরা। বিশেষ করে ওই তিনজনের কাছ থেকে–জেনি, হুটিয়া আর প্রুডেন্স। ওদের স্বামীরা তোমাদের স্বামীদের হাতে মরেছে। তোমাদের ওপর ওদের রাগটা সহজেই অনুমান করে নিতে পারো।'

'ওরা আমাদের দেখা পাবে না,' জবাব দিল নানাই।

'ঠিক আছে, আমি তাহলে যাই,' বলল টাউরুয়া। 'মাইমিতির কাছে যাচ্ছি। তুমিও যাও।'

নানাই ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখল কিছুক্ষণ। তারপর ছেড়ে দিয়ে হারিয়ে গেল বনের ভেতর।

ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ি।

টাউরুয়াকে আসতে দেখেই দরজার কাছে এসে দাঁড়াল বলহাদি। ফিসফিস করে কয়েকটা কথা হলো দু'জনের। উদ্বেগের ছাপ পড়ল বলহাদির চেহারায়।

'ও বাঁচবে, বলহাদি,' বলল টাউরুয়া। 'অন্তর থেকে আমি বিশ্বাস করি, নইলে মিথ্যা আশা তোমাকে দিতাম না। তাড়াতাড়ি চলে যাও। মিনারী বা অন্যরা এলে যেভাবে বললাম সেভাবে করবে। ওরা যেন কিছুতেই বুঝতে না পারে আলেক্স বেঁচে

আছে।'

এক মুহূর্ত পরে টাউরুয়া একা হয়ে গেল ঘরে। মাইমিতির ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শুনল কিছুক্ষণ। তারপর সরে এসে টেবিলের সামনে বেঞ্চটায় বসল। শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল জানালা দিয়ে বাইরে। কখন যে দু'চোখ ভিজে উঠল নিজেও টের পেল না।

একটু পরেই ও মাইমিতির গলা শুনতে পেল, বলহাদিকে ডাকছে। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ঘরে ঢুকল টাউরুয়া।

'বলহাদি বাসায় গেছে, মাইমিতি।'

'ও, তুমি টাউরুয়া! ক্রিশ্চিয়ান ফেরেনি এখনও?'

'না। বাতি জ্বেলে দেব?'

'দরকার নেই, সন্ধ্যার এই আবছা আলোই ভাল। ওহ্, যা একটা ঘুম দিলাম! দেখ, টাউরুয়া, কেমন করে খাচ্ছে! একেবারে বাচ্চা শুয়োরের মত। কোথায় যেতে পারে ক্রিশ্চিয়ান? বলে গেল বিকেলের মধ্যেই ফিরবে, আর এদিকে রাত হয়ে গেল তা-ও দেখা নেই।'

'এসে যাবে, চিন্তা কোরো না।'

'টাউরুয়া, লক্ষ্মী বোন আমার, রাস্তায় গিয়ে দেখ না, আসছে কিনা। কী আশ্চর্য বাপ! রোজ রোজ মানুষের ছোট্ট তুলতুলে মেয়ে জন্মায়? যাও, টাউরুয়া, দেখলে তাড়াতাড়ি আসতে বোলো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পাশের ঘরে চলে এল টাউরুয়া। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ফাঁকা পথের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আবার এসে বসল বেঞ্চে। আবার জলের ধারা নামল ওর গাল বেয়ে।

তেরো

অবতরণ স্থান এবং দ্বীপের সর্বপুবের অন্তরীপের মাঝখানের উপত্যকায় এক ফার্ন ঝোপের ভেতর শুয়ে আছে তেতাহিতি আর নিহাউ। এখানেই রাত কাটিয়েছে ওরা। দু'জন নিচুস্বরে আলাপ করছে। চাঁদ ডুবে গেছে অনেক আগে। ভোরের প্রথম ধূসর আলো ফুটতে শুরু করেছে পুব আকাশে। নিহাউ উঠে বসল কাঁধ ঝাঁকিয়ে থু করে থুতু ফেলল। পর মুহূর্তে চমকে উঠে অস্ত্র আঁকড়ে ধরল সে। পায়ের আওয়াজ শোনা গেছে কাছেই। তেতাহিতিও উঠে বসেছে মাস্কেট ধরে।

দু'জনই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মিনারীর নিচু কণ্ঠের ডাক শুনে। একটু পরেই দেখা গেল তাকে। পেছনে তে মোয়া। এক কাঁদি পাকা কলা কাঁধে করে আনছে সে। হাতে চারটে ডাব সেগুলোরই খোসার আঁশ দিয়ে এক করে বাঁধা। ফলগুলো নামিয়ে রাখল তে মোয়া।

নিঃশব্দে খাওয়া সারল ওরা। খাওয়ার পর কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে বসে রইল তেতাহিতি।

'মিনারী,' অবশেষে জিজ্ঞেস করল সে, 'ইয়ংকে ছেড়ে দেয়া যায় না? কুইনটাল আর ম্যাককয়কে মরতেই হবে, কিন্তু ইয়ং···'

'ওকেও মরতে হবে! এ নিয়ে আর কোন কথা আমি শুনতে চাই না! ওদের সবাইকে মরতে হবে!'

'কোথায় ওরা?' জিজ্ঞেস করল নিহাউ।

'যেখানেই থাক আজ দিনের শেষ দেখার জন্যে ওরা বেঁচে থাকবে না।' মাস্কেটটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল মিনারী। তেতাহিতির দিকে তাকিয়ে যোগ করল, 'নিহাউকে নিয়ে পশ্চিমের ঢালগুলো খুঁজে দেখ। আমি তে মোয়াকে নিয়ে দ্বীপের ওদিকটায় খোঁজ করছি। একটা ইঁদুরও পালাতে পারবে না আমাদের চোখ এড়িয়ে। সন্ধ্যায় কুইনটালের বাড়ির কাছে ঝোপে মিলিত হব আমরা।'

তে মোয়াকে সাথে আসতে ইশারা করে রওনা হয়ে গেল মিনারী। উপত্যকার মাথার দিকে এগিয়ে চলল দু'জন চড়াই বেয়ে। অবশেষে পৌঁছুল দ্বীপের পুব প্রান্তের চূড়ায়, যেখান থেকে পাহাড়ের গা খাড়া দেয়ালের মত নেমে গেছে নিচে এক চিলতে পাথুরে সৈকত পর্যন্ত; যেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল ফাসটো। চূড়ার একেবারে প্রান্তে একগুচ্ছ প্যানডানাস গাছের ভেতর গিয়ে দাঁড়াল মিনারী।

'এই জায়গাটার কথা একবারও মনে হয়নি,' নিচু কণ্ঠে তে মোয়াকে বলল সে। 'খেয়াল রাখো কেউ আসে কিনা, আমি নিচের সৈকতটায় চোখ বুলিয়ে নেই একবার। শিগ্‌গিরই সূর্য উঠবে।'

মাস্কেট নামিয়ে রেখে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মিনারী। সাবধানে কিনারের ওপর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে তাকাল কয়েকশো ফুট নিচে সরু পাথুরে সৈকতটার দিকে। প্রবল ঢেউ সগর্জনে এসে ভেঙে পড়ছে তার ওপর

আলো বাড়ছে একটু একটু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোল থালার মত সূর্যের খানিকটা বেরিয়ে এল পুব দিগন্ত ফুঁড়ে। একই সময় মিনারীর গলা চিরে বের হলো অস্ফুট একটা বিস্ময় ধ্বনি। ঘুরে ফিরিয়ে সঙ্গীকে কাছে ডাকল সে ইশারায়।

'দেখেছি!' সামান্য ঝুঁকে উঁকি দিয়েই ফিসফিস করে উঠল তে মোয়া। 'ওই যে, ওই বড় পাথরটার কাছে! আহ্, সরে গেল!'

'কে বুঝতে পেরেছিস?'

'না, এক পলকের জন্যে কেবল দেখেছি, তবে মনে হলো দু'জন।'

'দু'জনই হোক আর একজনই হোক, ফাঁদে পড়েছে। এই পাহাড় বেয়ে কারও পক্ষে ওঠা সম্ভব না, ওদিকের সাগর পেরিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। কেমন ঢেউ দেখছিস তো! এ ঢেউ হচ্ছে মিটি ভাভাউ, দূরে কোথাও ঝড় হচ্ছে তার ফল। যেমন তাড়াতাড়ি এ তৈরি হয় তেমনই আবার মিলিয়ে যায়। আমি থাকছি এখানে, তুই যা, অবতরণ স্থানে গিয়ে আমাদের ক্যানোটা ভাসানোর ব্যবস্থা কর। যদি সাগর শান্ত হয় আমি চলে আসব ওখানে; যদি না হয় তাহলে কথা মত সন্ধ্যায় দেখা হবে কুইনটালের বাসার কাছে।'

চলে গেল তে মোয়া। মিনারী যেমন ছিল তেমনি পড়ে থেকে নজর রাখতে লাগল নিচের দিকে। পাহাড়ের এক খণ্ড পাথরের মত অনড় পড়ে রইল সে। সময় গড়িয়ে চলল। সূর্য ধীরে ধীরে উঠে আসতে লাগল মাঝ আকাশের দিকে। এর

ভেতর বার কয়েক মিনারী মানুষের অবয়ব দেখল নিচে। কিন্তু সেগুলো এক জনেরই না বিভিন্ন জনের বুঝতে পারল না সে। পাথুরে সৈকতে তীব্র বেগে ঢেউ ভেঙে পড়ায় এমন ভীষণভাবে জল ছিটকাচ্ছে আর বাতাস সেগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে আসছে যে মনে হচ্ছে ধোঁয়ার এক পর্দায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে সৈকতটা।

অবশেষে সূর্য মাথার ওপর উঠল। তারপর নেমে যেতে লাগল পশ্চিম দিকে। এক ভাবে পড়ে থাকতে থাকতে ঝিমুনি লেগে এল মিনারীর। বিকেল যত গড়াচ্ছে ঘুম ঘুম ভাব ততই পেয়ে বসছে ওকে। লম্বা একটা হাই তোলার সময় হঠাৎ ওর সতর্ক কান পায়ের আওয়াজ পেল। খুব বেশি দূরে নয়। উঠে বসে মাস্কেট তুলে নিল মিনারী। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পাতার ফাঁক দিয়ে। ও যেখানে বসে আছে সেখান থেকে বিশ গজেরও কম দূরের এক ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল ম্যাথ্যু কুইনটাল। সতর্ক চোখে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। চোখদুটো ওর টকটকে লাল। দেহের অনাবৃত অংশগুলোয় অসংখ্য আঁচড়ের দাগ। ঝোপ থেকে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এল সে। থেমে চোখের ওপর হাত রেখে সূর্য আড়াল করে তাকাল পশ্চিমের পাড়ার দিকে।

আগ্নেয়াস্ত্র–এমন কি তীর ধনুকও–দক্ষিণ সাগরীর দ্বীপবাসীদের কাছে কাপুরুষের অস্ত্র হিসেবে গণ্য হয়। তাছাড়া কুইনটালের প্রতি মিনারীর ঘৃণা এমন তীব্র রূপ নিয়েছে যে সে খালি হাতেই তাকে খুন করবে বলে ভাবল। নিঃশব্দে মাস্কেট নামিয়ে রেখে প্যানডানাস ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল সে। লড়াইয়ের আহ্বান জানানোর স্থানীয় রীতি অনুযায়ী বাঁ বাহুর পেশি ফুলিয়ে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুসি মারল সেখানে। ঘুসির শব্দটা হলো পিস্তল থেকে গুলি ছোটার আওয়াজের মত। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল কুইনটাল। মুহূর্তের মধ্যে প্রস্তুতি নিয়ে ছুটে গেল মিনারীর দিকে।

সামান্য ঝোঁকা অবস্থায় এক জন আরেক জনের মুখোমুখি হলো ওরা। একই সময় ঘুসি হাঁকাল দু'জন প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে। মিনারী একই সঙ্গে ঘুসি চালিয়েছে এবং নিজের মাথা নিচু করে নিয়েছে। ফলে কুইনটালের ঘুসিটা ফস্কে গেল, কিন্তু মিনারীরটা ফস্কাল না। সবেগে গিয়ে সেটা লাগল কুইনটালের চোয়ালে। টলটলায়মান ভঙ্গিতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। মুহূর্তের মধ্যেই অবশ্য সামলে নিয়ে আবার ছুটে গেল প্রতিপক্ষের দিকে। এবার আগের চেয়ে অনেক সতর্ক। মাথা নোয়ানো। ছুটে গিয়ে বগলের নিচ দিয়ে জড়িয়ে ধরে মাটি থেকে তুলে ফেলল কুইনটাল মিনারীকে। তারপর এমন চাপ দিল, যে চাপে ষাঁড়েরও পাঁজর গুঁড়িয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু মিনারীর কিছু হলো না। পায়ের নিচে মাটি হারিয়ে চাপা এক গর্জন করল মিনারী। বিদ্যুৎ গতিতে দু'হাতের বুড়ো আঙুল এক করে চেপে ধরল শত্রুর কণ্ঠনালী। চোখগুলো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে কুইনটালের। এর ভেতরই সে একটা হাঁটু সবেগে উঠিয়ে আনল মিনারীর পেট বরাবর। কুইনটালের গলা থেকে হাত ছুটে গেল ইন্ডিয়ান গোত্রপতির। ব্যথায় ককিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। এই সুযোগে বাঘের মত লাফ দিল কুইনটাল। মিনারীকে ধরে পেড়ে ফেলল মাটিতে। শুরু হলো জড়াজড়ি ধস্তাধস্তি। দু'জনই চেষ্টা করছে প্রতিপক্ষের ঘাড় ধরার। তারপর হঠাৎ, যেমন পড়েছিল তেমনি, উঠে দাঁড়াল দু'জন। তবে এখন

সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে কুইনটাল। এক হাতে সে পেঁচিয়ে ধরে আছে মিনারীর বুক অন্য হাতে ধরেছে ডান কব্জি। মুহূর্তের মধ্যে মিনারী টের পেল বিপদটা। কিন্তু ততক্ষণে এক মুহূর্ত হলেও দেরি হয়ে গেছে। বাঁ হাতে সে এলোপাতাড়ি ঘুসি চালাতে লাগল কুইনটালের মুখ লক্ষ্য করে। কিন্তু কুইনটাল নাছোড়বান্দার মত ধরেই আছে তাকে। উপরন্তু ডান হাতটায় মোচড় দিয়ে চলেছে সর্বশক্তিতে।

কয়েক সেকেন্ড যেতে না যেতেই শোনা গেল কড়াৎ একটা শব্দ। হাড় ভেঙে গেল মিনারীর হাতের। ব্যথা এবং ক্রোধে গর্জন করে উঠে ভয়ানক এক ঝাড়া দিল সে শরীরে। কুইনটালের হাত ছুটে গেল তার বুক থেকে। পর মুহূর্তে তার বাঁ হাতের প্রচণ্ড এক ঘুসি আঘাত হানল কুইনটালের মাথার পাশে। ছিটকে পেছন দিকে সরে গেল কুইনটালের মাথা। টলতে লাগল ওর দেহ। চোখে ফুটে উঠেছে শূন্য এক চাউনি। এই অপ্রস্তুত অবস্থা সামলে নেয়ার আগেই আরেকটা বিরাশি সিক্কা ওজনের ঘুসি পড়ল কুইনটালের গলায়। একই সঙ্গে লাফ দিয়ে এসে ওর গলা ধরে ফেলেছে মিনারী। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, অক্ষত হাতটার চেয়ে কোন অংশে কম ব্যবহার করছে না সে আহত হাতটা। আবার দু'চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার অবস্থা কুইনটালের।

বিশাল আঙুলগুলো শত্রুর গলায় চেপে ধরে তাকে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে কিনারের দিকে নিয়ে চলেছে মিনারী। দ্রুত জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে কুইনটালের। মরিয়া করে প্রবল চেষ্টা করছে ফুসফুসে একটু বাতাস ঢোকানোর। লাভ হচ্ছে না। দু'হাতে খামচে ধরে সে চাইছে মিনারীর আঙুলগুলো গলা থেকে সরিয়ে আনতে। তা-ও পারছে না। হঠাৎ একটা আঙুল সামান্য আলগা হলো মিনারীর। অমনি মুখ পাকিয়ে সেটা ধরে ফেলল কুইনটাল এবং হ্যাঁচকা একটানে হাতটা ছাড়িয়ে আনল তার গলা থেকে। ফুঁপিয়ে ওঠার মত করে শ্বাস টেনে উঠে দাঁড়াল সে। শত্রুর গলা হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ায় ভয়ানক এক গর্জন করে মিনারী প্রচণ্ড এক লাথি তুলল তার থুতনী লক্ষ্য করে। লাথিটা যদি সে লাগাতে পারত তাহলে এখানেই ইতি হত লড়াইয়ের। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওর। চূড়ার একেবারে কিনারে এসে পড়েছিল ওরা। লাথি তুলতেই ওর পায়ের নিচের একটা আলগা পাথর নড়ে উঠল। দু'হাত উঁচু করে তা সামলানোর চেষ্টা করল মিনারী। ওর একটা পা লাথি মারার ভঙ্গিতে ওপরে তোলা এক মুহূর্ত দেরি না করে লাফ দিল কুইনটাল। মিনারীর উঁচু পা-টা ধরে তাকে ঠেলে দিল পেছন দিকে।

আঙুলের দাগ বসে যাওয়া গলায় হাত বুলাতে বুলাতে কুইনটাল দেখল ইন্ডিয়ান গোত্রপতির বিরাট দেহটা চার হাত পা ওপরে তোলা অবস্থায় নেমে যাচ্ছে চূড়ার ওপাশের শূন্য স্থান দিয়ে। পাঁচশো ফুট নিচে নিরেট পাথরের ওপর পড়ে থেঁতলে গেল দেহটা। টলতে টলতে পশ্চিমের উপত্যকার দিকে নামতে শুরু করল কুইনটাল।

ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে সাবধানে এগিয়ে চলেছে তেতাহিতি আর নিহা। বসতির যথাসম্ভব দূরে থেকে সম্মিলন স্থলের দিকে এগোচ্ছে ওরা। সারাদিন দু'জন দ্বীপের পশ্চিম অর্ধেকে তল্লাশী চালিয়েছে। যাদের খোঁজে এই তল্লাশী তাদের কা

দেখা পায়নি। তেতাহিতি আগে আগে চলেছে। দ্বীপের ভেতর দিকে যাওয়া একটা পথের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিহাউ-এর হাত ধরে ঢুকে পড়ল এক ঝোপের ভেতর। পর মুহূর্তে পথটায় দেখা গেল মিনারীর মেয়ে মানুষ মোয়েটুয়াকে। একা হেঁটে আসছে সে।

'মোয়েটুয়া ও!' নিচুকণ্ঠে ডাকল তেতাহিতি।

মোয়েটুয়া ঘাড় ফেরাতেই ইশারায় তাকে ঝোপের ভেতর ডাকল তেতাহিতি।

'মিনারী কই?' জিজ্ঞেস করল মোয়েটুয়া।

'তে মোয়াকে নিয়ে সাদা মানুষদের খুঁজছে।'

'তেতাহিতি,' আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলল মোয়েটুয়া, 'খুনের সাধ এখনও মেটেনি তোমাদের? এক জনকেও রেহাই দেবে না?'

'সবাইকে মরতে হবে। তোমার স্বামীর কথা এটা। কুইনটাল বা ম্যাককয় কোথায় জানো?'

'না। আর ইয়ং-এর কথা জানলেও বলতাম না।'

কাঁধ ঝাঁকাল তেতাহিতি। 'আমারও মনের কথা এটা। তবু মিনারীই ঠিক, আমরা নয় তো ওরা। এক দলকে নয় অন্য দলকে শেষ হতেই হবে।'

'রক্ত! রক্ত!' নিচু কণ্ঠে বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়াল মোয়েটুয়া। 'পুরুষগুলো সব বুনো পশু। সব! আজ থেকে ওদের সবাইকে ঘৃণা করব আমি!'

চলে গেল মোয়েটুয়া। আবার এগোল তেতাহিতি আর নিহাউ।

কুইনটালের বাড়ির কাছে যেখানে চারজনের মিলিত হওয়ার কথা সেখানে অপেক্ষা করছিল তে মোয়া। তেতাহিতিকে সে বলল পুব পাহাড়ের চূড়া থেকে সে আর মিনারী যা যা দেখেছে। মিনারীর নির্দেশও সে জানাল তাকে। তার পর যোগ করল:

'এখানে খাবার আছে। তোমরা দু'জনই ক্লান্ত। খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। সারাদিন আমি কিছু করিনি, আমি জেগে থাকছি। মিনারী বোধহয় শিগ্‌গিরই এসে যাবে! এলেই তোমাদের জাগিয়ে দেব।'

প্রুডেন্স আর হুটিয়া বসে আছে মিলস-এর বাড়ির মেঝেতে। প্রুডেন্স মাঝে মাঝে বিলাপ করে উঠছে তার ঘুমন্ত মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা।

'ওভাই টেরা?' শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল হুটিয়া।

'আমি, জেনি?'

দরজা বন্ধ করে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল জেনি। 'আমাদের সুযোগ এসেছে!' ফিসফিস করে বলল সে। 'সুযোগটা নেয়ার সাহস আছে তোমাদের?'

'কিসের সুযোগ?' শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল প্রুডেন্স।

'আমাদের স্বামীদের যারা খুন করেছে তাদের খুন করার।'

উঠে দাঁড়াল প্রুডেন্স। মেয়েকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এসে বলল, 'কী বলতে চাও এবার বলো পরিষ্কার করে।'

'তেতাহিতি, নিহাউ আর তে মোয়াকে এক জায়গায় ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছি। তে মোয়া অন্য দু'জনের থেকে একটু দূরে এক গাছে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। ওরা

নিশ্চয়ই ওকে পাহারা দেয়ার জন্যে বসিয়েছিল, কিন্তু ঘুমের কাছে হার মেনেছে সে। আমাদের আছে একটা কুঠার আর দুটো কাটল্যাস। তোমাদের মন যথেষ্ট শক্ত, হাত কাঁপবে না?'

'আমার অন্তত না!' গম্ভীর কণ্ঠে বলল হুটিয়া।

'আমি চাই নিহাউকে,' শান্ত কণ্ঠস্বর প্রুডেন্সের।

'আর আমি তেতাহিতিকে!' বলল জেনি।

হুটিয়া আস্তে তার উরুতে একটা চাপড় মারল। 'এইটা এ পিয়াপিয়া! বাকিটা আমার···কিন্তু মিনারী, ও কোথায়?'

'জানি না,' বলল জেনি। 'শিগ্‌গিরই হয় তো এসে পড়বে। তার আগে আমাদের করতে হবে যা করার। জলদি চলো, চাঁদ ডুবে যাবে একটু পরেই। তোমরা দু'জন কাটল্যাস নাও, আমার কাছে থাক কুঠারটা।'

অস্ত্র তুলে নিল তিনজন। প্রুডেন্স গিয়ে দাঁড়াল তার বাচ্চার পাশে। ঝুঁকে তার কপালে চুমু খেলো আলতো করে। তারপর অন্য দু'জনের পেছনে পেছনে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। পশ্চিম পাহাড়ের সামান্য ওপরে রয়েছে চাঁদ। এক পরেই হারিয়ে যাবে ওপাশে।

ক্লান্ত পায়ে বসতির দিকে চলেছে কুইনটাল। পদক্ষেপ ক্লান্ত হলেও সতর্ক ওর চোখে। যথাসম্ভব ঝোপঝাড়ের আড়ালে থেকে হাঁটার চেষ্টা করছে। মিনারীর পোড়াবাড়ির পাশ কাটিয়ে গিয়ে বড় একটা ঝোপে ঢুকল সে। সেখান থেকে উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করল নিজের বাড়িটা। ভাল করে দেখতে পেল না। আরও কয়েক পা এগোল। ঝোপের ভেতর একটুখানি একটা ফাঁকা জায়গা পড়তেই দম বন্ধ হয়ে এল ওর। থমকে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে উঠল: 'ঈশ্বর!'

ঝুঁকে তে মোয়ার কাটা মাথাটা তুলে নিয়ে ভাল করে দেখল ও চাঁদের আলোয়। মাথাটা তে মোয়ারই নিশ্চিত হয়ে ওটা মাটিতে নামিয়ে রেখে এদিক ওদিক তাকাল কুইনটাল। কয়েক গজ দূরে একটা গাছের কাছে গেল। গাছটার গোড়ায় পড়ে আছে তেতাহিতি আর নিহাউ-এর নিষ্প্রাণ দেহ।

'সব ক'জন শেষ!' বিড়বিড় করল সে। 'দারুণ কাজটা কে করল!'

মাটি থেকে তিনটে মাস্কেট কুড়িয়ে নিয়ে বগলদাবা করে বসতির দিকে এগোল কুইনটাল।

মিলস-এর বাড়িতে মোম-বাদাম জ্বলছে। কিন্তু জানালাগুলো সব বন্ধ। ফাঁক ফোকর দিয়ে সামান্য আলো এসে পড়েছে বাইরে। বাড়ির কাছে গিয়ে আস্তে শিস বাজাল কুইনটাল।

'কে?' গলা শোনা গেল জেনির।

নিজের পরিচয় দিল কুইনটাল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল সে। প্রুডেন্স মেঝেয় বসে দুধ খাওয়াচ্ছে বাচ্চাকে। হুটিয়া শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'মিনারী কই?' দরজা বন্ধ করতে করতে জিজ্ঞেস করল জেনি।

'মরে গেছে। আমি মেরেছি। ইংরেজদের ভেতর কে কে মরেছে? জ্যাকের লাশ আমি দেখেছি। গুলিতে মরেছে। মার্টিন আর মিলস-এর মাথাছাড়া ধড়ও দেখেছি। বাকিদের খবর কী?'

জেনি যা জানে বলল সংক্ষেপে।

'উইল ম্যাককয় কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কুইনটাল।

মাথা নাড়ল জেনি।

'ওই ঝোপের ভেতর মাওরিদের লাশ দেখলাম তিনটে, কে মেরেছে?' আবার কুইনটালের প্রশ্ন।

তিন রমণী দৃষ্টি বিনিময় করল। অবশেষে কথা বলল জেনি। 'তোমাকে যদি বলি কথাটা গোপন রাখবে? পারাউ মাউ?'

'রাখব।'

'ওরা আমাদের স্বামীদের খুন করেছে,' ধীর কণ্ঠে বলল জেনি। 'ওদের খুন করে আমরা তার শোধ নিয়েছি।'

বোকার মত চেহারা হলো কুইনটালের। যেন বুঝতে পারেনি জেনির কথা। 'ওহ ঈশ্বর! মেয়েমানুষের কাজ ওটা!' অবশেষে ওর গলা দিয়ে বের হলো।

'শোনো,' জেনি বলে চলল, 'ওই লোকগুলোকে মারা আমাদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু ওদের স্ত্রীদের অন্য রকম ভাবনা থেকে থাকতে পারে। তাই সত্যি কথাটা ওদের জানা চলবে না। অনেক ঝামেলা হয়েছে, অনেক রক্ত ঝরেছে এই অভাগা দেশে; আরও ঝরুক আমরা চাই না। ওই তিনজনকে তুমি হত্যা করেছ, বলবে সবাইকে?'

'তোমরা চাইলে আমার কোন আপত্তি নেই।'

'সত্যি কথাটা কাউকে বলতে পারবে না। সারাহকেও না।'

'ঠিক আছে। সারাহ কোথায়।'

'ইয়ং-এর বাড়িতে।'

প্রুডেন্সের বাচ্চার খাওয়া হয়ে গেছে। স্তন ঢেকে ও উঠে দাঁড়াল। বাচ্চাকে মিলস-এর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল, 'তোমাকে এখানে পেয়ে বড় স্বস্তি লাগছে। মিনারী আর ওই তিনজনের প্রেতাত্মার ভয়ে আধমরা হয়ে ছিলাম আমরা।'

পরদিন সকালে কুইনটালের অনুরোধে ওর স্ত্রী সারাহ, ম্যাককয়-এর স্ত্রী মেরি আর জেনি বেরিয়েছে ম্যাককয়কে খুঁজতে। সারাহ চলেছে পুব দিকে, অন্য দু'জন মূল উপত্যকা পেরিয়ে পশ্চিমের পাহাড়ের দিকে।

শঙ্কিত চোখে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চলেছে সারাহ। মাঝে মাঝে গলা সামান্য চড়িয়ে ডাকছে: 'উইল! উইল ও! উইল ম্যাককয়!' কিন্তু কোন সাড়া পাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ পর এক ঝোপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কর্কশ একটা গলা ফিসফিস করে ডাকল ওকে।

'সারাহ! একা তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'বসে পড়ো জলদি! ম্যাট কোথায়?'

ঝোপটার কাছে গিয়ে ভেতরে তাকাল সারাহ। বুনো চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ম্যাককয়।

'ম্যাট কই?' আবার জিজ্ঞেস করল সে।

'বাসায়। আমার সাথে চলো। ওরা সব মরে গেছে।'

'কারা?'

'মাওরি পুরুষরা। সব ক'জন।'

'আর ইংরেজরা?'

'আমার সাথে চলো। কুইনটালের কাছে শুনো সব।'

'সত্যি কথা বলছ তো তুমি?'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ!' অস্থির কণ্ঠে জবাব দিল সারাহ।

কোন ইঁদুর বা গিরগিটি চলে যাওয়ার শব্দ হলো খসখস করে। অমনি এমন ভয়ঙ্করভাবে চমকে উঠল ম্যাককয়, মনে হলো খোদ যমদূতকে দেখেছে সামনে। সন্দেহের চোখে সারাহর মুখটা পর্যবেক্ষণ করে সে বলল, 'ম্যাটকে নিয়ে এসো। ওর নিজের মুখ থেকে শুনলে আমি বিশ্বাস করব।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সারাহ। 'ঠিক আছে। তুমি এখানে থাকো, আমি নিয়ে আসছি ম্যাটকে।'

ম্যাককয় যখন বন্ধু আসার আশায় রয়েছে তখন টাউরুয়া দ্রুত এগিয়ে চলেছে উপত্যকার পশ্চিম পাশ ধরে ক্রিশ্চিয়ানের ইয়াম খেতের দিকে। একটু পরপরই সে নিচু কণ্ঠে ডাকছে: 'মোয়েটুয়া! নানাই!' অবশেষে পাহাড়ের ওপর উঠে যাওয়া খাড়া পথটার পাশে এক ঝোপে দু'জনকে পেল সে।

পুরাউ গাছের ডাল লতা-বাকল দিয়ে বেঁধে বানানো একটা খাটিয়ার পাশে বসে আছে তারা। খাটিয়ার ওপর শোয়ানো ক্রিশ্চিয়ানের দেহ, সপ্রাণ না প্রাণহীন বোঝা যায় না প্রথম দর্শনে। চোখ দুটো বোজা, মুখটা ছাইয়ের মত বিবর্ণ। তবে একটু খেয়াল করলে বোঝা যায় অতি ধীরে হলেও বুকটা ওঠা নামা করছে।

টাউরুয়ার পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলল মোয়েটুয়া। স্থানীয় রীতি অনুযায়ী মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলতে গেল মুখে। কিন্তু টাউরুয়ার চেহারা দেখে হাসিটা আর ফুটল না।

'কী হয়েছে, টাউরুয়া?' শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

টাউরুয়ার চেহারায় দুঃসংবাদের আভাস পেয়েছে নানাইও। 'হ্যাঁ, বলো, কী খবর নিয়ে এসেছ,' তাড়া দিল সে।

'দুর্ভাগ্য আমার, খবরটা আমাকেই আনতে হলো…'

'কী, বলো!' নির্দেশ দিল মোয়েটুয়া।

'তোমাদের স্বামী…দু'জনই মারা গেছে, তে মোয়া আর নিহাউও।'

মোয়েটুয়ার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'দেবতাদের ইচ্ছা কে ফেরাতে পারে। অভিশপ্ত দেশ এটা।…কে খুন করেছে মিনারীকে?'

'কুইনটাল একাই মেরেছে সব ক'জনকে।'

'ইয়ং-এর কোন হাত ছিল না?'

'না।'

সজল চোখে টাউরুয়ার চোখের দিকে তাকাল মোয়েটুয়া। 'তুমি ঠিক বলছ?'

'শপথ করে বলছি!'

হাঁটু গেড়ে ক্রিশ্চিয়ানের পাশে বসল টাউরুয়া। ওর কপালে হাত দিয়ে বলল, 'জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা! এক্ষুণি ওকে আমাদের বাড়িতে নেয়া দরকার।'

'তুমি মাইমিতির কাছে যাও, আমরা নিয়ে যাচ্ছি একে,' বলল মোয়েটুয়া।

টাউরুয়া চলে যাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ নীরবে মাথা নিচু করে বসে রইল দু'জন। অবশেষে মোয়েটুয়া উঠে খাটিয়ার এক প্রান্ত ধরল। নানাইকে ইশারা করল অন্য প্রান্ত উঁচু করতে। দু'জন অনায়াসে খাটিয়াটা তুলে রওনা হলো ইয়ং-এর বাড়ির দিকে।

ইয়ংকে ওরা ঘরেই পেল। আলেকজান্ডার স্মিথ সাগরের দিকের বিছানাটায় শুয়ে আছে। এখনও অচেতন ও। প্রচুর রক্তক্ষরণে মুখটা বিবর্ণ। বলহাদি ওর বিছানার পাশে বসে। দরজায় সাড়া পেয়ে মুখ তুলল সে।

কোন সম্ভাষণ বা কথা ছাড়াই মোয়েটুয়া আর নানাই খাটিয়াটা বয়ে নিয়ে এল ঘরের মাঝখান পর্যন্ত। স্মিথের বিছানার উল্টো দিকে আরেকটা বিছানার পাশে নিয়ে নামিয়ে রাখল সাবধানে। নতুন একটা টাপা চাদর পেতে বিছানাটায় ওরা শুইয়ে দিল ক্রিশ্চিয়ানকে তুলে। ওরা ঘরে ঢুকতেই ইয়ং উঠে দাঁড়িয়েছে। ক্রিশ্চিয়ানকে বিছানায় শুইয়ে দেয়ার পর মোয়েটুয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিছু বলতে গেল সে। কিন্তু মোয়েটুয়া তাকাল মা ওর দিকে। যেমন এসেছিল তেমিন নীরবে, মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। নানাই অনুসরণ করল ওকে।

দ্রুত পায়ে ক্রিশ্চিয়ানের পাশে এসে দাঁড়াল ইয়ং। ঝুঁকে কান পেতে শুনল আহত মানুষটার শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ। আলতো হাতে খুলে দিল ওর জামার বুকের কাছটা। টাপা কাপড়ের পট্টি সরিয়ে পরীক্ষা করল ক্ষতস্থান। তারপর উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে।

'বাঁচবে?' উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করল বলহাদি।

'বাঁচতেই হবে!' নিচু কণ্ঠে জবাব দিল ইয়ং। 'ওঁকে বাঁচতেই হবে!'

চোদ্দ

সবগুলো পাল উড়িয়ে দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছে আমেরিকান সীল শিকারী জাহাজ টোপায। মাসটা ফেব্রুয়ারি। সাল ১৮০৮। সীলের চামড়া, তিমির তেল বা বাণিজ্যের সন্ধানে দক্ষিণ সাগরে এসেছেন ক্যাপ্টেন মেহিউ ফলগার।

পেরুর উপকূল থেকে অন্তত তিন হাজার লিগ দূরে এসে পড়েছে টোপায। এখন চলেছে এমন এক জলপথ ধরে যা ১৭৬৭-এর পর আর ব্যবহার হয়নি। ক্যাপ্টেন কার্টারেট-এর 'সোয়ালো' শেষবার ব্যবহার করেছিল এই জলপথ।

দুপুরে সূর্যের উচ্চতা মাপার পর নিচে কেবিনের দিকে রওনা হলেন ক্যাপ্টেন ফলগার হিসেব নিকেশ এবং খাওয়া সারার জন্যে। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নামার সময় মেট-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন:

'যেমন চলছে চলুক, মিস্টার ওয়েবার। আপাতত গতিপথ বদলানোর দরকার নেই।'

এগিয়ে চলল জাহাজ উত্তর-পুব থেকে এগিয়ে আসা মৃদু ঢেউয়ের তালে তালে।

দুটোর ঘণ্টা বাজল। একটু পরেই মাস্তুলের ওপরের লোকটার চিৎকার শোনা গেল:

'ডাঙা দেখা যায়!'

ডেকে উঠে এলেন ক্যাপ্টেন। হাতে পুরনো ধাঁচের একটা স্পাই গ্লাস। ওটা মেট-এর হাতে দিতে দিতে তিনি বললেন:

'উপরে উঠে দেখ, মিস্টার ওয়েবার, কত দূরে দ্বীপটা।'

মেট নেমে না আসা পর্যন্ত ডেকে পায়চারি করে কাটালেন ফলগার।

'ছোট পাহাড়ী দ্বীপ, স্যার,' দূরবীনটা ক্যাপ্টেনকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল ওয়েবার। 'পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ মাইল মত দূরে। অবস্থান পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে।'

'হুমম্! সীলদের আস্তানা হতে পারে। দিক বদলে দ্বীপটার দিকে চালাও জাহাজ।' মিস্টার ওয়েবার প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিয়ে ফিরে আসার পর ক্যাপ্টেন আবার বললেন, 'নতুন একটা দ্বীপ আবিষ্কার করেছি আমরা, কোন সন্দেহ নেই। পিটকেয়ার্ন'স আইল্যান্ড ছাড়া আর কোন দ্বীপের উল্লেখ এ অঞ্চলের মানচিত্রে নেই। সেটাও কার্টারেট্ দেখিয়েছে এখান থেকে অন্তত দেড়শো মাইল পশ্চিমে।'

ডাঙার দিকে এগিয়ে চলল টোপায়। সন্ধ্যা হলো। তখনও দ্বীপটা অনেক দূরে। মাঝরাত নাগাদ ওটার কাছাকাছি পৌঁছুল জাহাজ। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে পাল গুটিয়ে ফেলা হলো। ভোরের আগে আর এগোনো উচিত হবে না।

ভোরের প্রথম আলো ফুটে উঠতে না উঠতে ডেকে চলে এলেন ক্যাপ্টেন ফলগার। ওয়েবারকে পাশে নিয়ে টেলিস্কোপ চোখে লাগালেন। ঠিক মত ফোকাস করতে পারার আগেই পাশ থেকে শুনতে পেলেন সহকারীর বিস্মিত গলা।

'ধোঁয়া, স্যার! ওই যে ওখানে!'

জবাব দেয়ার আগে কয়েক মুহূর্ত দূরবীন দিয়ে দেখলেন ক্যাপ্টেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, তা-ই। নিঃসন্দেহে মানুষ আছে ওখানে।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'সীলের আশা গেছে। ভেবেছিলাম খালি পানির পাত্রগুলো ভরে নেব, তা-ও সম্ভব হবে কিনা কে জানে! দ্বীপটার অধিবাসীরা নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ান, এ অঞ্চলের ইন্ডিয়ানদের মত হিংস্র মানুষ কমই আছে দুনিয়ায়।'

'মানুষ থাক না থাক,' মন্তব্য করল মেট, 'এপাশ দিয়ে কোন নৌকাই তীরে ভেড়ানো যাবে না। উপকূলের চেহারা দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, ওখানে নৌকা ভেড়ানোর চেষ্টা আর আত্মহত্যা করা এক কথা।' আবার দূরবীন চোখে লাগালেন ফলগার। 'একটু যদি বেলাভূমি থাকত। খালি পাথর আর···আরে! ক্যানো! ওরা আসছে আমাদের দিকে!'

মিনিট পনেরোর মধ্যে ক্যানোটা পৌঁছে গেল জাহাজের কাছে। কাছে তবে একেবারে কাছে নয়। টোপাযের গজ তিরিশেকের ভেতর পৌঁছে বৈঠা চালানো বন্ধ করল আরোহীরা। এবং ওখানেই ভাসিয়ে রাখল ক্যানো। বৈঠা হাতেই রাখল তারা। ভাবখানা প্রয়োজন পড়লে যেমন এসেছে তেমনিই দ্রুত চম্পট দেবে। চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে ওরা দেখছে জাহাজখানা। জাহাজ থেকে বার বার ডাকা বা ইশারা করা সত্ত্বেও বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না বা ক্যানো জাহাজের আরও কাছে নিয়ে এল না ওরা।

গভীর কৌতূহল নিয়ে ক্যানোর আরোহীদের দিকে তাকিয়ে আছে মেট মিস্টার ওয়েবার। মোট তিনজন। তিনজনই কিশোর বা সবে কৈশোরোত্তীর্ণ। সবচেয়ে যে বড় তার বয়স হবে আঠারো উনিশ। যদি ইন্ডিয়ান হয় তাহলে বলতে হবে সচরাচর যেমন দেখা যায় তার চেয়ে অনেক ফর্সা কোন গোত্রে ওদের জন্ম। মুখগুলো রোদে পুড়ে ব্রোঞ্জের রঙ নিয়েছে; তবে জাহাজে কাজ করা শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে বেশি গাঢ় নয় রঙটা। একেবারে পেছনের ছেলেটার মাথায় খড়ের তৈরি অদ্ভুতদর্শন এক হ্যাট, পাখির পালক লাগানো।

'আপনাদের এটা ইংলিশ জাহাজ?' ভরাট, পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল সে।

'কী আশ্চর্য!' অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন ফলগার। তারপর; 'না। এটা আমেরিকান জাহাজ।'

তিন তরুণ একে অপরের সাথে দৃষ্টিবিনিময় করল। নিচুস্বরে আলাপ করতে লাগল নিজেদের ভেতর।

'তোমরা কারা?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ফলগার।

'আমরা ইংরেজ।'

'কোথায় জন্ম তোমাদের?'

'ওই দ্বীপে।'

'তাহলে কী করে তোমরা ইংরেজ?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'আমাদের বাবা ইংরেজ তাই,' শান্ত জবাব শোনা গেল।

'কে তোমাদের বাবা?'

'আলেক্স।'

'আলেক্স কে?'

'আলেক্সকে চেনেন না!'

'চিনব! ও ঈশ্বর! আমি কী করে চিনব ওকে?'

আকৃতিভরা চোখে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল তরুণ। আবার কিছুক্ষণ আলাপ করল সঙ্গীদের সাথে। অবশেষে বলল, 'আমাদের বাবা আপনাকে তীরে স্বাগত জানাতে পারলে খুশি হবেন, স্যার।'

'তার আগে আমি তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমার জাহাজে। উঠে এসো। কোন ভয় নেই,' নরম করে জবাব দিলেন ফলগার।

হালে বসা তরুণ সঙ্গীদের দিকে তাকাল। তারপর একটু ইতস্তত করে ক্যানো নিয়ে ভিড়াল জাহাজের গায়ে। ওপর থেকে একটা রশি ফেলা হলো। সেটা দিয়ে

জাহাজের সঙ্গে ক্যানো বেঁধে তিন তরুণ উঠে পড়ল ডেকে। এমন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ওরা উঠল যে নাবিকরা দেখে অবাক না হয়ে পারল না। হাসি মুখে ওদের অভ্যর্থনা জানালেন ক্যাপ্টেন।

'আমি ক্যাপ্টেন ফলগার,' সবচেয়ে লম্বা ছেলেটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন। 'আর এ মিস্টার ওয়েবার, আমার মেট।'

'আমি, স্যার, থার্সডে অক্টোবর। এ আমার ভাই চার্লস আর এ হলো জেমস।'

কথা বলল যে, চেহারায় তরুণ হলেও লম্বায় সে পুরো ছ'ফুট, মাপা দেহের গঠন; পৌরুষদীপ্ত সুন্দর চেহারা, মুখে মিষ্টি একটা হাসি ধরে আছে সব সময়। পরনে কোমর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলে পড়া অদ্ভুত এক ধরনের কাপড়ের ঝুল পোশাক। চোখ গোল গোল করে ডেকের চার পাশটা দেখছে সে।

'কী বিরাট, বিশাল জাহাজ, স্যার!' সবিস্ময়ে বলল থার্সডে অক্টোবর। 'বাবার মুখে এমন জাহাজের কথা শুনেছি আমরা, কিন্তু এর আগে কখনও দেখিনি।'

'আরও ভাল করে, উপর নিচ সব জায়গা যাতে দেখতে পারো তার ব্যবস্থা করছি,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'কিন্তু তার আগে তোমাদের দ্বীপ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। প্রথমে: ওই পাশে কোন অবতরণ স্থান আছে?'

'আছে। মাত্র একটা, তা-ও খুব বিপজ্জনক। আমরা ওই খাঁড়ি দিয়েই আসা যাওয়া করি।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন ফলগার খাঁড়িটার দিকে। তারপর মাথা নাড়লেন। 'না আমাদের কোন নৌকাই ওখানে ভেড়ার ঝুঁকি নিতে পারবে না। তোমাদের ওখানে খাওয়ার পানি আছে প্রচুর?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

গ্যালির দরজার কাছে রাখা একটা পিপের দিকে ইশারা করলেন ফলগার। 'ওরকম বিশ পঁচিশটা খালি পিপে আছে আমাদের। ওগুলো কি তোমাদের খাঁড়িতে নেয়া যাবে?'

'খুব সহজেই যাবে,' জবাব দিল থার্সডে অক্টোবর। 'খাঁড়ির মুখ পর্যন্ত যদি আপনারা পৌঁছে দেন তারপর আমরা একটা একটা করে সাঁতরে ঠেলে নিয়ে যেতে পারব।'

'তারপর ভরে দিতে পারবে?'

'হ্যাঁ, স্যার, অবশ্য পানি আমাদের ক্যালাবাশ-এ করে আনতে হবে।'

'কতটা সময় লাগবে?'

'সবচেয়ে কাছে পানি পাওয়া যায় ব্রাউনের কুয়ায়,' বলে একটু চিন্তা করল ছেলেটা। চোখ দিয়ে মাপল গ্যালির দরজায় রাখা পিপেটা। তারপর, 'আমরা সবাই যদি লাগি তাহলে এই ধরুন দু'তিন দিন।'

'তোমরা কি করবে আমাদের সাহায্যটা?'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল তরুণের মুখ। 'নিশ্চয়ই, স্যার। ডাঙায় আমাদের অনেক ভাই বোন আছে। সবাই হাত লাগাব।'

'বেশ। চিন্তা কোরো না, কাজটা করে দিলে উপযুক্ত পুরস্কার তোমরা পাবে। এখন যাও দেখে এসো জাহাজ। দেখার সময় খেয়াল কোরো, কোন জিনিসটা

তোমাদের সবচেয়ে কাজে লাগতে পারে। আমার সামর্থ্যের মধ্যে হলে সেটা দেব তোমাদের।'

সারেঙের সঙ্গে রওনা হয়ে গেল তিন তরুণ। মেট-এর দিকে ফিরলেন ক্যাপ্টেন ফলগার। 'পানি ভরার কাজটা যাতে ঠিক মত হয় দেখবার জন্যে তুমি যাবে তীরে?' ওয়েবারের চোখে এমন স্বচ্ছ খুশির ঝিলিক দেখা গেল যে জবাবের অপেক্ষা না করেই বলে চললেন ক্যাপ্টেন, 'আরেকটা দায়িত্ব দিচ্ছি তোমাকে। ওরা কারা এটা এক রহস্য। এই রহস্যের সমাধান করবে তুমি।'

'ওদের ক্যানোয় চড়ে যাব তো?'

'হ্যাঁ। আর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি ডাঙায়ই থেকো। লঙবোটে করে পিপেগুলো পৌঁছে দেব খাঁড়ির মুখে। ওই মিস্টার আলেক্স বা যে-ই হোক, তাকে বোলো আমরা খাঁড়ির এপাশেই থাকব ভরা পিপে তুলে নেয়ার জন্যে।'

তরুণ দ্বীপবাসীরা জাহাজ পরিদর্শন শেষে ফিরে এল। কী তাদের প্রয়োজন বা পছন্দ হয়েছে জানতে চাওয়ায় প্রথমে তারা কিছু বলল না। বেশ চাপাচাপির পর শেষ পর্যন্ত বলল, এক জোড়া ছুরি, একটা কুঠার আর একটা তামার কেটলি পেলে ওরা খুশি হবে বিশটা পিপে ভরে দেয়ার বিনিময়ে। ফলগার তক্ষুণি ওদের দিতে বললেন কেটলিটা। এ ছাড়াও প্রত্যেককে এক জোড়া করে ছুরি আর একটা করে কুঠার দিলেন।

'মিস্টার আলেক্স-এর গড়ন কেমন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'লম্বা না খাটো?'

'আপনার মতই স্যার,' জবাব দিল থার্সডে অক্টোবর। 'খাটো, বলিষ্ঠ গড়ন।'

নিচে চলে গেলেন ফলগার। ফিরলেন নীল একটা নতুন সুট নিয়ে।

'এটা নিয়ে যাও,' থার্সডে অক্টোবরের হাতে সুটটা দিয়ে বললেন তিনি, 'মিস্টার আলেক্সের জন্যে আমার উপহার।'

খুশিতে চক চক করে উঠল থার্সডে অক্টোবরের চোখ। 'আপনার এই সহৃদয়তার প্রতিদান দেবেন ঈশ্বর! এমন গরম কাপড় আমরা চোখেও দেখিনি। আমাদের বাবার বয়েস হয়েছে। শীতে আজকাল প্রায়ই কষ্ট পান।'

তিনজন এর পর উষ্ণ করমর্দন করল ফলগার এবং সারেঙের সাথে। অন্যদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে নেমে গেল ক্যানোয়। মিস্টার ওয়েবারও নামল ওদের সাথে।

আধ ঘণ্টারও কম সময়ের ভেতর ক্যানো পৌঁছে গেল তীরে। তিন তরুণ তাদের অতিথিকে নিয়ে নামল সরু এক চিলতে বেলে সৈকতে। গোটা ছয়েক গাট্টাগোট্টা ছেলে ছুটে এসে ক্যানোটা টেনে তুলে ফেলল সৈকতের একেবারে ওপরে। কৌতূহলী চোখে দেখতে লাগল তারা মিস্টার ওয়েবারকে। ক্যানোটা যেখানে তোলা হলো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে আরও কয়েক জন। ওরা মেয়ে। ছেলেমেয়ে সবার বয়েস দশ থেকে আঠারোর ভেতর। ছেলেদের সবার পরনে আগের তিন জনের মত গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলে পড়া পোশাক। মেয়েদেরও তাই। তবে ওদের ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত নয়। ছেলেমেয়ে সবাই কেমন একটু লাজুক ধরনের। মিস্টার ওয়েবারকে দেখল তারা কিন্তু কোন রকম সম্ভাষণ জানাল না বা হাসি উপহার দিল না। ওয়েবার খেয়াল করল, মেয়েদের কয়েক জন রীতিমত সুন্দরী। তবে তাদের সৌন্দর্য যতটা

না ইংরেজ ধাঁচের তারচেয়ে বেশি স্প্যানিশ ধাঁচের।

আঁকাবাঁকা পথ ধরে অতিথিকে নিয়ে চলল দ্বীপবাসী তরুণ-তরুণীরা। দুটো উপত্যকা পেরোনোর পর একটা ছোট গ্রাম মত জায়গায় এল ওরা। পাঁচটা মাত্র বাড়ি গ্রামটায়। একটা থেকে অন্যটা মোটামুটি দূরে। সবগুলোই দোতলা আর প্যানডানাস পাতার ছাউনিঅলা। প্রথম বাড়িটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওয়েবার দেখল কালো জিপসী চেহারার এক মহিলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। দ্বিতীয় বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ও একই দৃশ্য। তবে এবারের মহিলা সুন্দরী এবং আগের জনের চেয়ে অনেক কম বয়েসী। এর মাথায় তাম্র-লাল চুল যেমনটা ওয়েবার আর কখনও দেখেনি। অন্য বাড়িগুলোর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময়ও বেশ কয়েক জন মহিলার মুখ দেখতে পেল সে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পথের সাগরমুখী পাশে এক প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের কাছে পৌঁছুল ওরা। গাছটার ওপাশে শেষ বাড়িটা। বাড়ির সামনে সুন্দর নিকানো উঠান, উঠান ঘিরে চমৎকার বাগান। রঙবেরঙের অসংখ্য ফুল ফুটে আছে বাগানে। বছর পঞ্চাশেক বয়েসের এক লোক দাঁড়িয়ে বাড়ির দরজায়। খাটো হলেও অসম্ভব বলিষ্ঠ তার গড়ন। ছেলেমেয়েদের মতই অদ্ভুত ধরনের কাপড় পরে আছে।

'স্বাগতম, স্যার,' এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বলল লোকটা।

'আমার নাম ওয়েবার। ওই জাহাজের মেট আমি।'

থার্সডে অক্টোবর নিচু কণ্ঠে কিছু বলল লোকটাকে। শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে অতিথিকে ঘরের ভেতর নিয়ে বসাল সে। তারপর চেঁচিয়ে ডাকল:

'ডিনা! র‍্যাচেল! কোথায় তোমরা?'

দুটি কিশোরী সলজ্জ মুখে এসে দাঁড়াল দরজায়।

'ভদ্রলোকের জন্যে ডাব নিয়ে এসো,' বলল তাদের বাবা, 'আর ফল-টল যা পাও।'

ছুটে চলে গেল মেয়ে দুটো। ওদের বাবা, একটা চেয়ার এনে রাখল অতিথির সামনে। বলল, 'বসুন, স্যার। বিশ্রাম নিন আর আমাদের এখানে সামান্য যা পাওয়া যায় মুখে দিন। নিশ্চয়ই অনেকদিন ধরে সাগরে আছেন আপনারা?'

'তিন মাসের বেশি। আপনাদের এই দ্বীপের নাম কী?'

'পিটকেয়ার্নস আইল্যান্ড, স্যার। নিঃসন্দেহে আপনারা মানচিত্র দেখে ভুল ধারণা করেছিলেন। ক্যাপ্টেন কার্টারেট এ দ্বীপের অবস্থান আসল জায়গা থেকে অন্তত দেড়শো মাইল দূরে দেখিয়েছেন।'

'কিন্তু তিনি তো লিখেছেন এটা জনবসতিহীন।'

'হ্যাঁ, তা-ই ছিল।...ছেলের কাছে শুনলাম আপনাদের পানি দরকার। আমাদের এখানে প্রচুর আছে, তবে আপনাদের অতগুলো পিপে ভরে দিতে অন্তত তিন দিন তো লাগবে।'

'লাগলেও কিছু করার নেই। আমরা সব মিলিয়ে যা পানি এনেছিলাম তার অর্ধেকের বেশি শেষ হয়ে গেছে।'

'এ অঞ্চলে কী কাজে এসেছেন আপনারা?'

'সীল শিকার করতে,' জবাব দিল ওয়েবার। 'পশ্চিম দিকে যাচ্ছিলাম আমরা,

এই সময় দেখলাম আপনাদের দ্বীপটা। সীল আছে আশপাশে?'

মাথা নাড়ল দ্বীপবাসী। 'হতাশ করতে হচ্ছে আপনাকে, মিস্টার ওয়েবার। এ দ্বীপের উপকূলে শেষ যে সীলটা আমি দেখেছি সেটা দশ বছর আগে।...আপনি ইংরেজ, তাই না?'

'হ্যাঁ। তবে জাহাজটা আমেরিকান। নিউ ইংল্যান্ডের বস্টন থেকে রওনা হয়েছে।'

আগ্রহের দৃষ্টিতে মিস্টার ওয়েবারের দিকে তাকাল দ্বীপবাসী লোকটা। 'আচ্ছা!' বলল সে। 'তার মানে উপনিবেশগুলোর সাথে এখনও আমাদের শান্তি বজায় আছে?'

'হ্যাঁ। সামান্য ব্যবসা বাণিজ্যও চলে।'

দ্বীপবাসী বৃদ্ধ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'বিশ বছর হতে চলল এখানে এসেছি আমি, মিস্টার ওয়েবার। এর ভেতর আপনিই প্রথম মানুষ যিনি এখানে পা রাখলেন।'

'বিশ বছর!' সবিস্ময়ে উচ্চারণ করল ওয়েবার। 'তার মানে দুনিয়ার কোন খবরই আপনি জানেন না! ফরাসী বিপ্লব, বা ওল্ড বোনি বা ট্র্যাফালগার কিছুই না!'

ডিনা এবং র‍্যাচেল এবং আরও কয়েকজন ফিরল কচি ডাব, পাকা কলা এবং মিস্টার ওয়েবারের অচেনা কয়েক ধরনের ফল নিয়ে। দীর্ঘদিন ডাঙার তাজা খাবার বঞ্চিত মেট একবার বলতেই খাওয়া শুরু করল। খেতে খেতে শোনাতে লাগল আধুনিক পৃথিবীর খবরাখবর। রাজনীতির প্রসঙ্গগুলো নিরাসক্ত মুখে শুনল দ্বীপবাসী লোকটা। কিন্তু যখনই ইংল্যান্ডের নৌ বিজয়ের প্রসঙ্গ উঠল আগ্রহে চকচক করে উঠল তার চোখ

সূর্য যখন প্রায় মাথার ওপর থার্সডে অক্টোবরের সাথে সৈকতের দিকে রওনা হলো ওয়েবার। পিপেয় পানি ভরতে শুরু করেছে দ্বীপের ছেলেমেয়েরা।

'পানি ভরতে যে ক'দিন লাগে সে ক'দিন আপনি বা আপনার ক্যাপ্টেন আমার অতিথি হলে খুবই খুশি হব,' ভদ্রলোককে বিদায় দিতে দিতে বলল দ্বীপবাসী।

'আমার ক্যাপ্টেন আসবেন, তবে পানি ভর্তি পিপেগুলো জাহাজে ওঠার আগে নয়। ততদিন আমি যদি আপনার অতিথি হই কিছু মনে করবেন না...'

'মনে করব, মিস্টার ওয়েবার! ঈশ্বরের কাছে হাজার শুকরিয়া জানাব! আপনি আপনার ক্যাপ্টেন দু'জনই সমান সমাদর পাবেন এখানে। বিশ্বাস করুন আমার কথা।'

শেষ বিকেলে মিস্টার ওয়েবার ফিরল বাড়িতে। গৃহকর্তা তখন উঠানে একটা বেঞ্চে বসে আছে, তাকে ঘিরে ঘাসের ওপর বসেছে আধ ডজন ছেলেমেয়ে। তাদের পড়াচ্ছে সে।

'ব্যস,' অতিথিকে দেখে বলল বৃদ্ধ, 'আজ এ পর্যন্তই। র‍্যাচেল, যাও মাকে গিয়ে বলো আমরা খাওয়ার জন্যে তৈরি। চলুন, মিস্টার ওয়েবার, ঘরে গিয়ে বসি। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে আপনার?'

ঘরে গিয়ে খাবার টেবিলে বসল দু'জন। পেছনের দরজা দিয়ে বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েসের এক মহিলা ঢুকল বিরাট একটা থালায় খাবার দাবার নিয়ে। পোড়ানো শুয়োর, মিষ্টি আলু, ইয়াম আর কাঁচকলা স্তূপ হয়ে আছে থালাটায়। সব ধূমায়িত গরম।

'এ হচ্ছে বলহাদি, মিস্টার ওয়েবার, ওই মেয়ে দুটির মা।'

মেট উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে অভিবাদন জানাল মহিলাকে।

খাওয়া শেষ করে দু'জন যখন বাড়ির সামনে উঠানে এসে বসল তখন গোধূলি লগ্ন পথ ছেড়ে দিচ্ছে সন্ধ্যার আঁধারকে। মিস্টার ওয়েবার লক্ষ করল সারা উঠানে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বসে আছে নারী, শিশু আর কিশোর কিশোরীরা। সবার পরনে পাটভাঙা পরিষ্কার কাপড়। কম বয়েসী মেয়েদের মাথায়, গলায় সদ্য বানানো ফার্ন আর সুগন্ধী ফুলের মালা। অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল অতিথি। তার মনে হলো এমন স্বাস্থ্যবান, এমন সুখী ছেলেমেয়ে আর কখনও দেখেনি সে। গুনে দেখল ছেলেমেয়ের সংখ্যা চব্বিশ; তাদের মাঝে বসে আছে আট ন'জন মধ্যবয়সী মহিলা, সব ক'জন ইন্ডিয়ান। ছেলেমেয়েগুলোর মা নিঃসন্দেহে! কিন্তু বাবাগুলো কোথায়? একজন অর্থাৎ গৃহকর্তা ছাড়া আর কোন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের দেখা সে পায়নি এখনও।

বৃদ্ধ লোকটা উঠে দাঁড়াল। তার ইশারায় বয়স্ক মহিলারা সামনে এগিয়ে এল অতিথিকে অভিবাদন জানাতে। প্রথম যে মহিলা মিস্টার ওয়েবারের সাথে করমর্দন করল তার বয়েস চল্লিশের কোঠায়। দীর্ঘাঙ্গিনী, ঋজু শরীর। মিস্টার ওয়েবারের মনে হলো এমন দুঃখী অথচ পরিপূর্ণ সুন্দর মুখ আর কখনও সে দেখেনি।

'মিস্টার ওয়েবার,' গৃহকর্তা বলল, 'আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। এ হচ্ছে মাইমিতি, থার্সডে অক্টোবরের মা।'

নিচু কণ্ঠে অতিথিকে সম্ভাষণ জানাল মহিলা। তার ভাষাটা ইংরেজি হলেও উচ্চারণ ভঙ্গিটা অদ্ভুত।

এর পর একে একে এগিয়ে এল ইংরেজি নামের চার মহিলা—মেরি, সুজানাহ, জেনি এবং ফ্রডেন্স। নাম ইংরেজি হলেও জাতিতে তারা অন্যদের মতই ইন্ডিয়ান। এর পর যে তিনজন এল অদ্ভুত তাদের নাম, তিনজনই ইন্ডিয়ান। অনভ্যস্ত কানে নামগুলো এমন খটমটে মনে হলো মিস্টার ওয়েবারের যে সেগুলো মনে রাখতে পারল না সে।

পরিচয় পর্ব শেষে সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা সভা শুরু হলো। রূপায় বাঁধানো একটা পুরনো বাইবেল থেকে ধীরোদাত্ত স্বরে স্তোত্র পাঠ করল দ্বীপবাসী বৃদ্ধ। বাকিরা বসে মাথা নিচু করে শুনল।

প্রার্থনা শেষে ছোট বড় সবাই এগিয়ে এল অতিথিকে শুভরাত্রি জানাতে। একে একে বিদায় নিল তারা। ওদের শেষজন চলে যাওয়ার পর ওয়েবার-এর মনে হলো দ্বীপবাসী লোকটা যেন আগের চেয়ে বেশি সদয় চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে, যেন একবার বললেই সে হৃদয় মেলে দেবে তার কাছে। কিন্তু কিছু বলল না ওয়েবার। আগে কথা বলল লোকটাই। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটু ইতস্তত

করল সে। তারপর ধীরে ধীরে বলল:

'আপনি নিশ্চয়ই অবাক হয়েছেন, আমি আমার পরিচয় দেইনি বলে। স্মিথ আমার নাম···আলেকজান্ডার স্মিথ।'

সঙ্গীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সে। যেন দেখতে চাইল তার নাম শুনে তার কী প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া হলো না ওয়েবার-এর।

'নিশ্চয়ই আরও সব ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন আপনি,' একটু চুপ করে থেকে বলে চলল স্মিথ, 'কে আমরা, কোত্থেকে এসে এই ছোট্ট দ্বীপে উঠলাম?'

হাসল মেট। 'আমি তো মানুষ। কৌতূহল জাগবে না?'

'এ পর্যন্ত আপনাকে যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে আপনি ভাল লোক। আমি বিশ্বাস করি না আপনার দ্বারা আমার বা আমার পরিবারের কোন ক্ষতি হবে।'

'আমি ক্ষতি করব আপনার? ঈশ্বর না করুন!' জবাব দিল মেট। 'নিশ্চিন্ত থাকুন, বন্ধু। আমারও স্ত্রী ছেলেমেয়ে আছে। আপনার ক্ষতি করার আগে তাদের ক্ষতি করব আমি।'

'তাহলে শুনুন, মিস্টার ওয়েবার, অনেক অনেক দিন আগে--বিশ বছরেরও বেশি হবে···।' আচমকা থেমে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল স্মিথ অতিথির দিকে। 'বাউন্টি নামের কোন জাহাজের কথা আপনি শুনেছেন?'

মাথায় বজ্রাঘাত হলেও বোধ হয় ওয়েবার ততটা চমকাত না যতটা চমকাল এখন। বাউন্টির ইতিহাস ভাল করেই জানে সে।

'মানে--মানে আপনি···'

'হ্যাঁ,' বাধা দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল স্মিথ, 'ফ্লেচার ক্রিশ্চিয়ানের সঙ্গীদের একজন। এখানে এসেই আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম।'

হাজারটা প্রশ্ন এক সাথে ভীড় করছে ওয়েবারের মনে। তার সঙ্গীর অবস্থাও তাই।

'ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের খবর কী?' জিজ্ঞেস করল স্মিথ। 'ইংল্যান্ডে পৌঁছুতে পেরেছিল?'

'হ্যাঁ, অনেক কষ্টে। তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তাদের বেশিরভাগকে নিয়ে প্রথমে তিনি বাতাভিয়ায় পৌঁছান সেখান থেকে ইংল্যান্ডে।'

স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলল, স্মিথ। 'বিরাট উপকার করলেন আমার, স্যার, খবরটা জানিয়ে। আজ থেকে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পারব রাতে। আর আমরা যাদের তাহিতিতে ছেড়ে এসেছিলাম তাদের অবস্থা?'

'ওই বিষয় নিয়ে লেখা দু'একটা বই আমি পড়েছি,' জবাব দিল ওয়েবার। 'তাতে যা জেনেছি তা হলো, বাউন্টির খোঁজে একটা সশস্ত্র জাহাজ পাঠানো হয়েছিল। কী যেন নাম···হ্যাঁ, প্যানডোরা। ওরা প্রথমেই তাহিতিতে যায়। সেখানে বাউন্টির নাবিকদের বারো চোদ্দ জনকে পায়। প্যানডোরার ক্যাপ্টেন ওদের ধরে শিকল বেঁধে নিয়ে যায় ইংল্যান্ডে। সেখানে সামরিক আদালতে বিচার হয় লোকগুলোর। তিন কি চারজনকে--আমার ঠিক মনে নেই ফাঁসি দেয়া হয়।'

'ওদের নামগুলো আপনার মনে আছে?'

মাথা নাড়ল ওয়েবার। 'দুঃখিত, যা বললাম এর বাইরে কিছু আমার মনে

নেই।'

'যে ছেলেটা আপনাকে নিয়ে এসেছে, থার্সডে অক্টোবর, ও ক্রিশ্চিয়ানের ছেলে।'

'কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান কোথায়? আর যারা এসেছিল আপনার সাথে? যদ্দূর মনে পড়ছে বারো জন বা আরও বেশি ছিলেন আপনারা।'

'ন'জন,' বলল স্মিথ। 'মানে আমরা শ্বেতাঙ্গ ছিলাম ন'জন। এ ছাড়া ইন্ডিয়ান পুরুষ ছিল ছ'জন আর মেয়ে বারো জন। ওরা তাহিতি থেকে এসেছিল আমাদের সাথে। সন্ধ্যায় যে মহিলাদের দেখলেন ওরাই, যে সব ছেলেমেয়ে দেখেছেন তাদের মা।'

'কিন্তু বাবাগুলো?'

'আমি ছাড়া আর কেউ নেই।'

'অন্য কোথাও চলে গেছে?'

মাথা নাড়ল স্মিথ। 'না। মারা গেছে, স্যার।'

ওয়েবার কিছু বলল না। আশা করল তার সঙ্গী নিজে থেকেই শোনাবে বাকি কাহিনী।

ঠিক তা-ই। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্মিথ বলল, 'ধৈর্য ধরে শুনতে পারবেন আপনি? অন্তত দুটো সন্ধ্যা তো লাগবে আমার কাহিনী শুনতে।'

'মানে এখানে যা যা ঘটেছে তার সবিস্তার বর্ণনা?'

'হ্যাঁ।'

'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমি শুনব। শুধু আমি কেন, ইংল্যান্ডে এমন শত শত মানুষ আছে যারা হাজার হাজার লিগ সাগর পাড়ি দিয়ে ছুটে আসবে এ কাহিনী শোনার জন্যে। আপনি চিন্তা করবেন না। শুরু করুন তারপর দেখবেন কেমন ধৈর্যশীল শ্রোতা আমি।'

'বেশ, স্যার। তাহলে শুরু করি একেবারে শুরু থেকে...'

পনেরো

কোন পর্যন্ত বলেছিলাম যেন, স্যার? (পরদিন সন্ধ্যায় আবার শুরু করল স্মিথ)। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান আর আমি আহত অবস্থায় শুয়ে আছি ঘরে। পরে অন্যদের কাছে যা শুনেছি তাছাড়া ওই সময়কার কোন কথাই আমি বলতে পারব না। নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন মেয়েদের মনের অবস্থা তখন কেমন। মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানকে ঘরে রেখেই মোয়েটুয়া আর নানাই বনে চলে গেছে। জেনি আর টাউরুয়া রয়েছে মিসেস ক্রিশ্চিয়ানের কাছে। স্বামী কেন ফিরছে না এই বলে সে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে দু'জনকে। নিশ্চয়ই আপনার স্মরণ আছে, হত্যালীলা যেদিন শুরু হলো সেই সকালেই একটা কন্যা প্রসব করেছিল মিসেস ক্রিশ্চিয়ান।

হুটিয়া রয়ে গিয়েছিল বলহাদির সাথে আমাদের সেবা-শুশ্রূষা করার জন্যে।

মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের শরীর থেকে এত রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল যে তিনি মরার মত পড়ে ছিলেন। আমার গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। ওদের কাছে শুনেছি, টানা তিন দিন আমি অনবরত প্রলাপ বকেছিলাম আর হাত পা ছুঁড়েছিলাম। বাকি মহিলারা ম্যাককয়, কুইনটাল আর মিলস-এর ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। এমন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল ওরা, বাচ্চাগুলোর কথা না ভাবতে হলে হয়তো না খেয়েই মারা পড়ত সব ক'জন।

কুইনটাল একা ছিল তার বাড়িতে। বেশির ভাগ সময় দরজায় গালে হাত দিয়ে বসে থাকত। কারও সাথে কথা বলত না। ওর মনের ভেতর কী চলছিল আমি জানি না। হয়তো মিলস এবং জ্যাক উইলিয়ামসকে হারানোর বেদনা অনুভব করছিল বা মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের দুরবস্থার কথা বা মিনারীর বাড়ি পুড়িয়ে সে কী ভাবে সবার কপালে দুর্ভোগ নামিয়ে এনেছে তা ভাবছিল।

হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছিল ভোরে, আপনি জানেন। ১৭৯৩-এর বাইশে সেপ্টেম্বর। তারিখটা আমি ভুলব না জীবনে। শেষ ইন্ডিয়ান পুরুষটা মারা পড়েছিল তেইশ তারিখ রাতে। পরদিন সকালে মোয়েট্টুয়া আর নানাই মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানকে রেখে চলে যাওয়ার একটু পরে টাউরুয়া এল মিসেস ক্রিশ্চিয়ানের কাছ থেকে, আমার মেয়েমানুষের সাথে কথা বলার জন্যে। বলহাদিকে ও যা বলে তার মর্মার্থ হচ্ছে মিসেস ক্রিশ্চিয়ান স্বামীর জন্যে এমন উতলা হয়ে উঠেছে যে তাকে কিছুতেই বিছানায় রাখা যাচ্ছে না, সত্যি কথাটা এবার বলতে হবে বোধ হয়। সবাই এক মত হলো যে, হ্যাঁ, এবার বলতে হবে কথাটা।

ওরা যথেষ্ট নরম করে খবরটা দেয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মিসেস ক্রিশ্চিয়ান ওদের ভণিতা শুনেই সত্য আন্দাজ করে ফেলেছিল। একটা কথাও না বলে ও নেমে দাঁড়ায় বিছানা থেকে। যা পরা ছিল তার ওপরই একটা চাদর মত জড়িয়ে নবজাত বাচ্চাটাকে নিয়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। আমাদের বাড়ি পৌঁছে সে সোজা গিয়ে বসে মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের বিছানার পাশে।

মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের গায়েও তখন প্রচণ্ড জ্বর। চোখ দুটো বন্ধ। হুটিয়া মাইমিতির কাছ থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে সরে গেল এক পাশে। আর মাইমিতি জলপট্টি দিতে লাগল মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের কপালে জ্বর নামানোর জন্যে। মহিলা কী রকম আঘাত পেয়েছিল শুনলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। সেদিনই সকালে তার স্তনে দুধ এসেছিল পুরো মাত্রায়, সন্ধ্যা নাগাদ তা আবার শুকিয়ে গিয়েছিল একদম। আমার স্ত্রী ভাবের নরম সর খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল বাচ্চাটাকে।

সেই রাত, পরের দিন এবং তার পরের রাত আমি আর মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান শুয়ে রইলাম সেখানে। মহিলারা এবং মিস্টার ইয়ং সেবা শুশ্রূষা করল আমাদের। তৃতীয় দিন ভোরে জ্বর নেমে গেল আমার শরীর থেকে। চোখ মেললাম আমি।

আমার অবস্থা দেখে নিজেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। নিজের বাড়িতে শুয়ে আছি অথচ বিড়ালের মত দুর্বল, মারাত্মক আহত। আমার বাঁ কাঁধ এবং ঘাড় অবশ। নড়ার চেষ্টা করলেই তীব্র ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে সব কথা মনে পড়ল আমার–জেনি এসেছিল আমার টারো খেতে। ওকে বিদায় করে দিয়ে গোট হাউসে উঠেছিলাম আমি মিস্টার ইয়ং-এর দেখা পাওয়ার আশায়। গোট হাউসে

তাকে না পেয়ে নেমে এসেছিলাম মূল উপত্যকায়। সন্ধ্যার দিকে পা টিপে টিপে এগোচ্ছিলাম মিস্টার ইয়ং-এর কলা বাগানের দিকে। সারাদিন কিছু খাইনি, খিদে পেয়েছিল খুব। এক জায়গায় একটা গাছে পাকা ফল দেখে পাড়তে উঠেছিলাম। সেই সময় ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল তে মোয়া আর নিহাউ। নিহাউ-এর কোমরে ঝুলছিল মিলস-এর কাটা মুণ্ড। গাছ থেকে নামার আগেই গুলি লাগে আমার বাঁ কাঁধে। তার পর আবছাভাবে জেনির মুখটা মনে পড়ছে, এপর সব অন্ধকার। টারো বাগানে ও বলেছিল তিনজন মারা পড়েছে। তখন পর্যন্ত এটুকুই আমি জানি।

ঘরের অন্য বিছানাটায় কেউ শুয়ে আছে দেখতে পেলাম। কিন্তু কে বুঝতে পারলাম না। মিসেস ক্রিশ্চিয়ান বসে আছে বিছানাটার পাশে। আমার দিকে পিঠ। টাউরুয়া আর আমার স্ত্রী মাদুরে বসে একটা ছোট্ট বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে, পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে মিস্টার ইয়ং। ওর নাম ধরে ডাকলাম আমি।

বলহাদি লাফ দিয়ে উঠল। বাচ্চাটাও এবং আর যারা ছিল তারাও। মিস্টার ইয়ং প্রায় ছুটে আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

'আলেক্স!' বলল সে। 'ধন্যবাদ ঈশ্বরকে, জ্ঞান ফিরেছে তোমার!'

বলহাদি মৃদু হাসার চেষ্টা করল আমার দিকে তাকিয়ে। আমার কপালে হাত রেখে মাথা ঝাঁকাল একটু।

'ওই বিছানায় কে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান।'

'বেঁচে আছেন উনি?'

'হ্যাঁ।'

মিসেস ক্রিশ্চিয়ান উঠে এসে নরম করে আমার সাথে কথা বলল দু'চারটা। মিস্টার ইয়ং বলহাদিকে ইশারা করল বাচ্চাটাকে সরিয়ে নিতে। আমার পাশে একটা টুল টেনে বসল সে।

'নেড,' ফিসফিস করে বললাম আমি, 'কি হয়েছে আমাকে বলো, নইলে উৎকণ্ঠায় আবার আমি জ্ঞান হারাব।'

সংক্ষেপে যা যা জানে বলল ইয়ং। শুনে আমার বুকটা ভেঙে যেতে লাগল। কুইনটাল আর ম্যাককয়-এর ওপর আক্রোশে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল। ওরাই দায়ী সব কিছুর জন্যে। মিনারী তেতাহিতি দু'জনই উঁচু দরের গোত্রপতি নিজের দেশে। অথচ এখানে, যেহেতু তাদের চামড়া সাদা নয়; ম্যাককয়, কুইনটাল, মার্টিন এবং মিলস-এর মনে হলো ওরা জমির মালিক হওয়ার যোগ্য নয়। ঈশ্বর চেয়েছিলেন এদ্বীপে আমরা একটা ছোটখাট স্বর্গ রচনা করব, অথচ ওদের কারণে গড়লাম নরক।

প্রায় পুরো সকাল আমি ঘুমিয়ে কাটালাম। আবার যখন জাগলাম তখন আগের চেয়ে অনেকটা ভাল বোধ করছি। মাইমিতি তখনও মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের বিছানার পাশে। এমন করুণ মুখে সে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে, দেখলে পাষাণ হৃদয়ও না গলে পারে না। ঠিক তক্ষুণি দেখলাম তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দ্রুত অথচ নিঃশব্দে বিছানার মাথার কাছে চলে এল সে। হাঁটু গেড়ে বসে মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের

হাত তুলে নিল একটা। জ্ঞান ফিরেছে তাঁর।

প্রথম কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, "এ কী, মাইমিতি? কোথায় আমরা?'

'নেড-এর বাড়িতে।'

মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানকে একটু পানি খাওয়াল মাইমিতি।

'নেড আছে এখানে?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান।

দরজার কাছে ছিল মিস্টার ইয়ং। বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল।

'কী ব্যাপার, নেড? কী হয়েছে?'

'এখন কোন রকম ভাবনা চিন্তা করবেন না, কথাও বলবেন না,' জবাব দিল মিস্টার ইয়ং।

'মিনারী কই?'

'মারা গেছে।'

'বাকি ইন্ডিয়ান পুরুষরা?'

'সবাই মারা গেছে।'

আস্তে ঘাড় কাত করে আমাকে দেখলেন মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান। 'তুমি আহত, স্মিথ?'

'হ্যাঁ, স্যার, তবে মারাত্মক না,' আমি বললাম।

এর পর যখন কথা বললেন তাঁর কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে দৃঢ় শোনাল।

'নেড, কী হয়েছে বলো আমাকে। পুরোটা। আমি শুনতে চাই।'

মিস্টার ইয়ং তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু লাভ হলো না। অবশেষে বলল সে। দ্রুত এবং সংক্ষেপে। শুনে চুপ করে রইলেন মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান। কেমন যে তাঁর লাগছে কিছুই আমরা বুঝতে পারলাম না বাইরে থেকে দেখে। স্রেফ শুয়ে রইলেন তিনি ছাদের দিকে তাকিয়ে। তার পর চোখ বন্ধ হয়ে গেল তাঁর। মিস্টার ইয়ং পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মিসেস ক্রিশ্চিয়ান তাঁর পাশ থেকে নড়ল না মুহূর্তের জন্যেও। বেশ কিছুক্ষণ পর থার্সডে অক্টোবর এল দরজার কাছে। ও তখন তিন বছরের। মুখে একটা আঙুল দিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল সে। চোখ গোল গোল করে দেখছে ঘরের ভেতরটা। অনেকক্ষণ পর পা টিপে টিপে, ভয়ে ভয়ে সে এগোল বাপের বিছানার দিকে। মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান ঘাড় কাত করে দেখলেন ছেলেকে। কী যে এক করুণ বিষাদমাখা চেহারা হলো তাঁর আপনি কল্পনা করতে পারবেন না।

'বাইরে নিয়ে যাও ছেলেটাকে,' বললেন তিনি।

মাইমিতি উঠে দরজার বাইরে ছেড়ে দিয়ে এল ছেলেকে। ফিরতে তার দু'তিন মিনিট দেরি হলো। আমার ধারণা ওই সময়টুকু তার লেগেছিল আত্মসংবরণ করতে।

বিকেল হলো। এর ভেতর একটু পরপরই বলহাদি আমাকে ডাবের মিষ্টি পানি খাইয়েছে। মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান সজ্ঞানেই আছেন। কিন্তু কথা বলছেন খুব সামান্য। আমার মনে হয় সে সময় ব্লাই এবং তার সঙ্গে যাদের ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল তাদের কথা ভাবছিলেন তিনি।

সন্ধ্যার আঁধার যখন ঘনিয়ে আসছে সে সময় মিসেস ক্রিশ্চিয়ান এক চুমুক পানি খাওয়াল তাঁকে। পেয়ালাটা রেখে নিজের জায়গায় এসে বসল মাইমিতি। ওর একটা হাত ধরে মৃদু একটু হাসলেন ক্রিশ্চিয়ান। তার পর আস্তে মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন আমার দিকে।

'আলেক্স।'

'স্যার?'

এর পর যে কথাটা তিনি বললেন, শুনে অবাক হয়ে গেলাম আমি। কথাটা এখন আর হুবহু মনে নেই আমার। 'এই সুযোগ,' বা 'এখনও সুযোগ আছে,'—এই ধরনের কী একটা বলেছিলেন তিনি।

কোন জবাব আশা করেননি তিনি, আমিও দেইনি। আমি তখন ভাবছি কথাটা দিয়ে কী বোঝাতে চাইলেন তিনি! 'এই সুযোগ,' যদি বলে থাকেন তাহলে বলতে হয় এর চেয়ে তিক্ত কথা মৃত্যু মুহূর্তে আর কেউ বলেনি। এর একটাই অর্থ হতে পারে, 'আমি চলে যাচ্ছি, এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেখ তোমরা ভাল থাকতে পারো কিনা।'

অনেকক্ষণ পর আবার তাঁর গলা শুনলাম: 'বাচ্চাদের কখনও জানতে দিও না!' এটাই আমার শোনা তাঁর শেষ কথা।

নিশ্চয়ই ঝিমুনি লেগে এসেছিল আমার। যখন চোখ মেললাম তখন ঘর অন্ধকার। মিসেস ক্রিশ্চিয়ানের বুক ভাঙা চিৎকারে ঝিমুনি কেটেছে আমার। বুঝতে পারলাম, সব শেষ।

পরের একটা মাস খুব করুণ গেল আমাদের। চারদিকে মৃত্যুর মত নীরবতা কেবল। প্রথমে আমার ভয় হয়েছিল মিসেস ক্রিশ্চিয়ান হয়তো পাগল হয়ে যাবে। কাঁদার মানুষ ও নয়। দুঃখে পাথর হয়ে যাওয়া ধাত ওর, যা মেয়েদের ভেতর খুব বেশি দেখা যায় না। ও যদি কাঁদত আমি দুশ্চিন্তা করতাম না, কিন্তু এক ফোঁটা পানি বেরোল না ওর চোখ দিয়ে। নিষ্প্রাণ মুখে নিত্য দিনের কাজকর্ম করে গেল। কখনও কখনও দেখেছি পুরো একটা দিন কেটে গেছে ও কোন কথা বলেনি।

হ্যাঁ, সময়টা সত্যিই ভীষণ খারাপ ছিল আমাদের জন্যে। এতগুলো লোক হঠাৎ করে নেই হয়ে যাওয়ায় কী যে নিঃসঙ্গ লাগত বুঝিয়ে বলতে পারব না। একমাত্র মার্টিন ছাড়া আর প্রত্যেকের জন্যেই মন কেমন করত। শ্বেতাঙ্গ, ইন্ডিয়ান সবার জন্যে। আর একটা জিনিস অনুভব করলাম, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের প্রয়োজনীয়তা। যারা বেঁচে ছিলাম তাদের ভেতর তাঁর স্থান নেয়ার যোগ্য কেউ ছিল না। আমরা হয়ে গিয়েছিলাম পালকহীন এক পাল মেষের মত।

আমাদের ভেতর সবচেয়ে বেশি ভেঙে পড়েছিল মিস্টার ইয়ং। রাতারাতি লোকটা কেমন যে বদলে গিয়েছিল আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। পাহাড়ে উঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত সাগরের দিকে তাকিয়ে। যখন বসতির ভেতর দিয়ে হাঁটত মনে হত ঘুমের ঘোরে পথ চলছে। আগে কৌতুক, চুটকির অসম্ভব ভক্ত ছিল। মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের মৃত্যুর পর ওকে আর হাসতে দেখিনি। আমার নিজের মনও ভীষণ খারাপ ছিল, তা সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে চেষ্টা করতাম তাকে হাসিখুশি

রাখার। লাভ হত না। নানা সমস্যা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ করতাম, ও-ও চেষ্টা করত আগ্রহ দেখাতে, কিন্তু বুঝতে আমার বাকি থাকত না আগ্রহটা আসছে না ওর ভেতর থেকে।

বাচ্চাগুলো না থাকলে কী যে হত ভাবলে মাঝে মাঝে শিউরে উঠি আমি। আর সব মহিলা তো বটেই মিসেস ক্রিশ্চিয়ানও আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল ওদের মুখ চেয়ে। যদিও আগের মত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কেউ হলো না, তবে অনেকটাই হলো।

ভয়ানক ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার প্রায় মাসখানেক পর একদিন মাইমিতি, মিস্টার ইয়ং আর আমি আলাপ করছিলাম আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। এদিন মোয়েটুয়া আর নানাইয়ের কথা বলল মাইমিতি। নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে মিনারী আর তেতাহিতির স্ত্রী দু'জন। আহত মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানকে আমাদের বাড়িতে রেখে যাওয়ার পর আর ওরা বসতির কাছে আসেনি। দ্বীপের অন্য পাশে জ্যাক উইলিয়ামস-এর কেবিনে আশ্রয় নিয়েছিল ওরা। মেয়েদের কেউ কেউ সন্দেহ করছিল, ওদের স্বামীরা যে সাদা মানুষদের সবাইকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল তা ওরা জানত। এই সন্দেহের ফলে মহিলাদের ভেতর আবার একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। মাইমিতি আর টাউরুয়ার জন্যেই তেমন কিছু ঘটতে পারেনি। ওরা দু'জন মোয়েটুয়া আর নানাইকে নিরপরাধ বলে ভাবত।

মিসেস ক্রিশ্চিয়ান মিস্টার ইয়ংকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলল, 'নেড, আমার হয়ে তুমি গিয়ে বলবে ওদের এখানে আসতে?'

চলে গেল ইয়ং। ফিরল ঘণ্টা খানেকের মধ্যে, দু'জনকে নিয়ে। ও আগে ঘরে ঢুকল। মোয়েটুয়া আর নানাই রইল দরজার বাইরে। মোয়েটুয়াকে আপনি দেখেছেন, স্যার; যৌবনে ও কেমন ছিল ওর এখনকার চেহারা দেখে সহজেই অনুমান করতে পারেন। তরুণ তাজা ওক গাছের সাথেই একমাত্র ওর সে চেহারার তুলনা চলে। মিনারীর যোগ্য স্ত্রী ছিল।

প্রুডেন্স বা হুটিয়া বা অন্যান্য মহিলা, যাদের স্বামীদের খুন করেছে ওদের স্বামীরা তাদের ভয়ে সে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল ভাববেন না। একমাত্র মাইমিতি ছাড়া আর কারও তোয়াক্কা ও করত না, এখনও করে না। মোয়েটুয়া জানত ওর স্বামীর হত্যাকারী কুইনটাল। সে যদি ঘরের ভেতর থাকে তাহলে তাকে দেখে ওর প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠতে পারে। এই ভয়েই ও সরাসরি ঘরে ঢোকেনি।

নানাইয়ের অবশ্য এসব দুশ্চিন্তা ছিল না। ও শান্ত স্বভাবের মেয়ে। বেঁচে থাকার জন্যে ওর একটা অবলম্বন দরকার। তেতাহিতি মারা যাওয়ার পর ওর সেই অবলম্বন হয়ে উঠেছে মোয়েটুয়া। তাই মোয়েটুয়া যেহেতু ঘরে ঢোকেনি ও-ও ঢোকেনি।

যাহোক, যা বলছিলাম, ওরা এসেছে শুনে মাইমিতি নিজে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। হাত ধরে দু'জনকে ঘরে এনে বলল:

'মোয়েটুয়া, আমাদের স্বামীরা যা করেছে করেছে। তোমার স্বামী হয়তো আমার

স্বামীকে হত্যা করেছে, কিন্তু এখন দু'জনই মৃত। নানাই, ক্রিশ্চিয়ান আর তেতাহিতি বন্ধু ছিল। আমরা ছিলাম বোনের মত। তোমাদের দু'জনের জন্যে আমার মনে ভালবাসা ছাড়া আর কিছু নেই। তোমরা এখানে এসে থাকবে আমাদের সাথে?'

মাইমিতি কী বলেছিল তা-ই কেবল আমি বলতে পারলাম, কী ভাবে বলেছিল তা পারলাম না। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, এমন আন্তরিক কথা আমি জীবনে শুনিনি। মোয়েটুয়া এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আমরা থাকব।' এরপর তিনজন গলা জড়াজড়ি করে সে কী কান্না! এই প্রথম আমি মিসেস ক্রিশ্চিয়ানকে কাঁদতে দেখলাম।

আমি হাঁটতে পারার মত সুস্থ হয়ে উঠতেই ও আমাকে বলল আমি যদি ওর বাড়িতে উঠে যাই আর ওকে ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার বাড়িতে থাকতে দেই তাহলে ও খুবই খুশি হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমি রাজি হলাম। মাইমিতির মনের অবস্থা বুঝতে পারছিলাম আমি। যে বাড়িতে ও মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের সঙ্গে বাস করেছে সে বাড়িতে একা থাকা ওর জন্যে শুধু পীড়াদায়ক নয়, রীতিমত আতঙ্ককর। আমরা, মানে আমি আমার স্ত্রী, হুটিয়া আর প্রুডেন্স উঠে গেলাম ও বাড়িতে। শেষের দু'জন ঠিক করেছিল আমাদের সাথে থাকবে। মিস্টার ইয়ং টাউরুয়া আর জেনিকে নিয়ে চলে গেল মিলস-এর বাড়িতে। কুইনটাল আর ম্যাককয় তাদের বাড়িতেই রইল। ওদের স্ত্রীরা ছাড়া সুজানাহ থাকতে লাগল ওদের সাথে।

আমার সম্পূর্ণ সুস্থ হতে বেশ সময় লাগল। বাঁ হাতটা যখন কাজ করার মত হলো তখন ক্রিসমাসের আর দেরি নেই খুব। বুঝতেই পারছেন আমার সে সময়কার মনের অবস্থা। সারাদিন বাড়িতে বসে থাকতে হত বলে আরও বেশি খারাপ লাগত। কুইনটাল আর ম্যাককয় পারতপক্ষে আমার কাছে ঘেঁষত না। ওই ভয়ানক ঘটনার জন্যে আমি যে ওদের দায়ী ভাবি তা ওরা জানত।

ম্যাককয়-এর চোলাইখানার কথা আপনাকে বলেছি। সুস্থ হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই ওটার কথা জানতে পারি আমি। তাই বলে ততদিন ম্যাককয়-এর মদ খাওয়া বন্ধ ছিল না। ক'দিন যেতে না যেতেই যথারীতি আবার সে চালু করেছিল তার চোলাইখানা। ব্যাপারটা প্রথম ধরা পড়ে কুইনটালের কাছে। দু'জন একই বাড়িতে থাকত। সব কিছু মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে আসতে কুইনটাল তার নিয়মিত কাজ কর্ম–যেমন কাঠ কাটা, বাগান পরিষ্কার করা ইত্যাদি শুরু করেছিল। হঠাৎই একদিন ওর খেয়াল হলো ম্যাককয় বেশ কিছুদিন ধরে বাড়িতে আসছে না। কী হলো, কোথায় গেল ভেবে খুঁজতে শুরু করল কুইনটাল। কয়েক দিন খোঁজার পর ম্যাককয়কে পেল দ্বীপের পশ্চিম অংশের এক গিরিখাতে। চোলাইখানার পাশেই ছোট একটা কুটির বানিয়ে সেখানে থাকছে সে।

এর পর যা ঘটল তা অত্যন্ত সরল এবং স্বাভাবিক। দ্বীপে মদখোরের সংখ্যা ছিল এক, বেড়ে দাঁড়াল দুই। বাউন্টির বড় তামার কেটলিটা গোপনে নিয়ে গেল ওরা। চোলাইখানাটাকে নতুন ভাবে সাজানো হলো।

শুরুতে দু'জনই মাত্রা রেখে পান করত। কিন্তু দ্বীপে যা ঘটে গেছে তারপর চাইলেই কি মাত্রা রাখা সম্ভব? কয়েক দিনের মধ্যেই ওরা বাড়িতে মদ নিয়ে আসতে

লাগল। এবং বাড়ির মেয়েদের শেখাল মদ খেতে। খুব বেশি দিন লাগল না, প্রুডেন্স এবং হুটিয়া এবং জেনিকেও ওরা পেয়ে গেল দলে। এ সময়ই আমি প্রথম জানতে পারি ব্যাপারটা।

হুটিয়া আর প্রুডেন্সকে আমি ঠেকানোর চেষ্টা করেছিলাম প্রথমে কিন্তু ওরা ততদিনে টের পেয়ে গেছে, মদ খেলে এখানে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে তা কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ভুলে থাকা যায়। সুতরাং, বুঝতেই পারছেন, আমার চেষ্টায় কোন কাজ হয়নি। তবে সৌভাগ্য, ওই ক'জনই; আর কোন মেয়ে মদের প্রতি আসক্তি বোধ করেনি।

ক'দিন পর এক সন্ধ্যায় মিস্টার ইয়ং এল আমার সাথে দেখা করতে। একদম নতুন মানুষ মনে হচ্ছিল তাকে। বুঝতে অসুবিধা হলো না কোত্থেকে আসছে সে।

'আলেক্স,' বলল ইয়ং, 'একটা জিনিস এনেছি তোমার জন্যে, একটু খেলে বেশ ভাল বোধ করবে।'

'কী?' জিনিসটা কী জেনেও প্রশ্ন করলাম আমি।

বগলের নিচ থেকে একটা বোতল বের করে টেবিলের ওপর রাখল সে।

'উইল ম্যাককয় পাঠিয়েছে তোমার জন্যে। দারুণ জিনিস, আলেক্স। সেরা লন্ডন জিনও এর তুলনায় কিছু না।'

'দেখতেই পাচ্ছি রেশ খানিকটা টেনে এসেছ তুমি,' আমি বললাম।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ইয়ং। 'মদটা ভাল, কেন খাব না? আমাদের যে জীবন এখন একটু যদি উৎফুল্ল হওয়ার উপাদান না থাকে, বাঁচব কী করে?'

'তোমার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত, নেড। কিন্তু ভেবে দেখেছ এ আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে? কুইনটালকে মাতাল অবস্থায় কখনও দেখোনি তুমি। আমি দেখেছি। স্রেফ উন্মাদ হয়ে ওঠে ও।'

'কেন? এতক্ষণ তো এক সাথেই খেলাম আমরা। খারাপ কিছু তো দেখলাম না।'

'হতে পারে। কখনও কখনও শান্তই থাকে ও। কিন্তু কখন যে অশান্ত হবে টেরও পাবে না। আর অশান্ত হলে···

'জাহান্নামে যাক কুইনটাল,' একটু জড়িত কণ্ঠে বলল ইয়ং, 'ও শান্ত থাক না থাক মদ যতক্ষণ পাওয়া যাবে আমি খাব। অবশ্যই পরিমাণ মত। কী ভাল যে আজ লাগছে!'

আমি কিছু বললাম না। ও বোতলটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, আলেক্স!' বলল সে। 'তুমি যদি মদ থেকে দূরে থাকতে চাও থাকো, আর কখনও তোমাকে সাধব না!'

হঠাৎ আমার কী যে হলো; ওকে বসতে বললাম। নিজে যেচে মদের বোতলটা নিলাম ওর হাত থেকে। মাঝে মাঝে সুবুদ্ধির পরিচয় দিলেও মদের ভক্ত আমি বরাবরই। দুটো আধ পাইন্ট আর এক ক্যালাবাশ পানি এনে বসে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জনে মিলে শেষ করে ফেললাম বোতলটা। মিস্টার ইয়ং ঠিকই বলেছিল, একেবারে পালকের মত হালকা হয়ে গেল আমার মন। গান বেরোল গলা দিয়ে। বহুদিন পর আমাদের দু'জনকে এত খোশমেজাজে দেখে বলহাদির তো খুশি

আর ধরে না। মদ খাওয়ার অপকারিতা সম্পর্কে তখন পর্যন্ত মেয়েদের কেউ কিছু জানত না। সুতরাং ওরা কোন বাধা দিল না আমাদের।

এর পরের কথা আর কী বলব, স্যার, মদের ফল ফলতে শুরু করল। প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত আমরা চার পুরুষ আর পাঁচ মেয়ে কুইনটাল-ম্যাককয়ের বাড়িতে মিলিত হয়ে খেতে লাগলাম। মদ তৈরির দায়িত্ব ম্যাককয় আর কুইনটালই পালন করতে লাগল। আমাকে বা মিস্টার ইয়ংকে হাত লাগাতে হলো না। প্রথম প্রথম আমরা শান্তভাবে পরিমাণ মতই খেতাম। দিনে আধ পাইন্টের বেশি না। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই পরিমাণ বাড়তে শুরু করল। আগে পুরুষ মানুষ ছিলাম বারো তেরো জন, এখন চারজন। ফলে খেত খামার করার জন্যে অস্বাভাবিক পরিশ্রম করতে হচ্ছিল আমাদের। এই কষ্ট ভুলতে গিয়েই পানের পরিমাণ বাড়াতে হলো। তারপর থেকে বাড়তেই লাগল। প্রতি সন্ধ্যায় মাতাল হওয়াটা আমাদের নিয়মে দাঁড়িয়ে গেল। পাঁচ মেয়ের যাদের স্বামী আছে অর্থাৎ সারাহ আর মেরি অবশ্য পরিমাণ মতই পান করত। কিন্তু সুজানাহ, হান্না, প্রুডেন্স পান করত পুরুষদের সমান, এবং পুরুষদের মত বদ্ধ মাতাল হয়ে উঠত তারা।

কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই মারপিট শুরু হয়ে গেল। পুরুষে পুরুষে শুধু না, নারীতে পুরুষে এবং নারীতে নারীতেও। এক রাতে কুইনটাল তো আরেকটু হলে মেরেই ফেলছিল সারাহকে। মোট কথা মাতাল হওয়ার মত মারামারি করাটাও আমাদের নিয়ম হয়ে গিয়েছিল।

পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে দেরি হলো না মিসেস ক্রিশ্চিয়ানের। মিস্টার ইয়ং আর আমার কাছে এসে সে মিনতি করল, আর কিছু না হোক অন্তত বাচ্চাদের কথা ভেবে যেন আমরা সংযত আচরণ করি। লজ্জিত হয়ে আমরা প্রতিশ্রুতি দিলাম। প্রতিশ্রুতি মত চলার চেষ্টাও করলাম কয়েক দিন। তার পর আবার যে কে সেই। আমি আর মিস্টার ইয়ং মেপে খাওয়ার পক্ষপাতি হলেও কুইনটাল ম্যাককয় তা মানতে রাজি হলো না। মিসেস ক্রিশ্চিয়ান এমন সুরুচিসম্পন্ন মহিলা যে আর সে এল না আমাদের কাছে, শুধু ম্যাককয় আর কুইনটালের বাচ্চাগুলোকে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে। এদিকে সারাহ এবং মেরিরও পিটুনি খেতে খেতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। ওরাও চলে গেল মাইমিতির কাছে। ম্যাককয়-এর অবশ্য তাতে কিছু এসে গেল না, কিন্তু কুইনটাল রেগে উঠল। সারাহকে ফিরিয়ে আনবে বলে ঠিক করল সে। আমরা অনেক করে বুঝিয়ে শান্ত করলাম ওকে। তিন মাস কেটে গেল এভাবে। তারপর এমন এক ঘটনা ঘটল যা আমাদের মত ইতরদেরও চেতনা ফিরিয়ে দিল।

সেদিন মাঝ রাতে টলতে টলতে আমি বাড়ি ফিরেছি। বলহাদি আমাকে শুইয়ে দিল বিছানায়। ওই সময় আমার এই বউটা কী দুঃসহ মর্ম যাতনা যে সয়েছে, তবু আমাকে ছেড়ে যায়নি। ইচ্ছে করলে ও-ও মিসেস ক্রিশ্চিয়ানের বাড়িতে চলে যেতে পারত, কিন্তু যায়নি। সে দিনগুলোয় ও আমার পাশে ছিল বলেই আমার মনে হয় এখনও আমি বেঁচে আছি।

যাহোক, শুইয়ে দেয়ার পর পরই আমি ঘুমিয়ে গেছি। হঠাৎ বলহাদির হাতের ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলাম।

'জলদি, আলেক্স!' ও বলল। 'আর সবাইকে জাগিয়ে তাড়াতাড়ি চলো! কুইনটাল এইমাত্র মাইমিতির বাড়ির দিকে গেল! নিশ্চয়ই কোন বদমতলব আছে!'

কোনমতে বিছানা থেকে নেমে ছুটলাম ম্যাককয়-এর বাড়ির দিকে। ওকে জাগালাম। মিস্টার ইয়ংও সে রাতে ও বাড়িতে ঘুমিয়েছিল। তাকেও জাগালাম। তিন জনে ছুটলাম মিসেস ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ির দিকে। অর্ধেক পথ যাওয়ার আগেই শুনতে পেলাম, কুইনটাল দরজা ধাক্কাচ্ছে। আরও কিছুটা এগোনোর পর চাঁদের আলোয় দেখলাম বেড়া দেয়ার খাটো একটা খুঁটি হাতে দাঁড়িয়ে কুইনটাল। সেটা দিয়ে দুমদাম ঘা মারছে দরজায়। ম্যাককয় চিৎকার করে ডাকল ওকে। কুইনটাল কান দিল না সে চিৎকারে। ঘরের ভেতর থেকে বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। একটু পরেই মিসেস ক্রিশ্চিয়ানের শান্ত শীতল গলা শুনতে পেলাম।

'আমার কাছে একটা মাস্কেট আছে,' বলল সে। 'ও যদি ভেতরে ঢোকে আমি নির্দ্বিধায় গুলি করব। তোমরা দূরে সরে থাকো।'

আমাদের ভেতর একমাত্র ম্যাককয়-এরই ক্ষমতা ছিল কুইনটালকে বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করার। ও ছুটে গিয়ে তার হাত ধরল। 'ম্যাট, পাগল হয়েছ?' বলল ও। কুইনটাল ঘুরে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল ম্যাককয়কে। দরজার ওপর আছড়ে পড়ল ম্যাককয়।

'মোয়েটুয়াকে চাই আমি!' চিৎকার করল কুইনটাল।

আমি আর মিস্টার ইয়ং ছুটে গেলাম এর পর। উইলও উঠে এসেছে আবার। কিন্তু তিন জন এক হয়েও কায়দা করতে পারলাম না কুইনটালকে। অবশেষে হাত লাগাল মেয়েরা। বলহাদি আমাদের সাথে যোগ দিয়ে টেনে সরানোর চেষ্টা করল পশুটাকে। একই সময় সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল মোয়েটুয়া। একাই দু'জন পুরুষের শক্তি ধরে ও দেহে। তার ওপর আছে তার মন ভর্তি কুইনটালের জন্যে ঘৃণা। ছুটে এসে ওর গলা চেপে ধরল সে। মোয়েটুয়ার হাতে সে রাতে মারাই পড়ত হয়তো কুইনটাল যদি না মাই ঠেকাত। আধ মরা অবস্থায় কুইনটালকে বেঁধে ম্যাককয়-এর বাড়িতে নিয়ে এলাম আমরা।

এর পর আর কোন মেয়ে আমাদের ওপর বিন্দুমাত্র আস্থা রাখতে পারল না। ভোর হওয়ার আগেই প্রুডেন্স আর হুটিয়া চলে গেল আমাদের ছেড়ে। সুজানাহকেও নিয়ে গেল ওরা। সব ক'জন উঠল মিসেস ক্রিশ্চিয়ানের বাড়িতে।

সেই একই সকালে বলহাদিও গেল মিসেস ক্রিশ্চিয়ানের ওখানে। ফিরল বিকেলে। তখনও আমার মদের ঘোর কাটেনি। তার ভেতরই লক্ষ করলাম ওর চোখে কেমন ভীত সন্ত্রস্ত চাউনি। একবার কিছু একটা সে আমাকে বলতে চাইল, কিন্তু তক্ষুণি আবার সামলে নিল। কী ও বলতে গিয়েও বলল না তা আর আমি জানতে চাইলাম না। সন্ধ্যায় কিছু খেতে দিতে বললাম ওকে। ও এনে দিল। খেয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। এক ঘুমে রাত পেরিয়ে গেল। যখন জাগলাম তখন সূর্য বেশ খানিকটা উঠে এসেছে।

রাতে ভাল ঘুম হওয়ায় তখন আমার মাথা পরিষ্কার। বলহাদিকে খুঁজলাম। বাড়ির কোথাও পেলাম না ওকে। একটু পরেই মেঘ জমতে শুরু করল দক্ষিণ পুব আকাশে। ভয়ানক গরম গেছে আগের ক'টা দিন। বুঝলাম ঝড় হবে। ঝড় হবে

বুঝতে পেরেও রোজ সকালের মত হাঁটতে হাঁটতে সাগর পাড়ে গেলাম আমি। পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই আচমকা শুরু হয়ে গেল ঝড়। তখন আর বাড়ি ফেরার সময় নেই। দৌড়ে বিশাল এক পাথরের খাঁজে আশ্রয় নিলাম। দশ, পনেরো মিনিটের মধ্যেই ঝড় থেমে গেল। পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরার আগে সাগরের দিকে একবার তাকালাম। অমনি চোখে পড়ল দূরে একটা কী যেন ভাসছে। দেখতে অনেকটা ওল্টানো নৌকার মত। চোখ রগড়ে আবার তাকালাম। হ্যাঁ, ওল্টানো নৌকাই। তার কিনার ধরে হাত পা ছুঁড়ছে অনেক ক'জন মানুষ।

আমি কী রকম চমকে গিয়েছিলাম নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন? দিগন্তের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত চষে ফেলল আমার চোখ জাহাজটার খোঁজে–যে জাহাজ থেকে নৌকাটা ভাসানো হয়েছে বলে অনুমান করছিলাম। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। এক দৌড়ে ম্যাককয়-এর বাড়িতে গেলাম স্পাইগ্লাস আনতে।

ওকে আর মিস্টার ইয়ংকে পেলাম সেখানে। দু'জনেই ঘুমিয়ে তখনও। ধাক্কাধাক্কি করে ওদের ঘুম থেকে তুলে বললাম যা দেখেছি। চমকে উঠল ওরাও। স্পাইগ্লাস নিয়ে তিনজনে এবার ছুটে গেলাম সাগর পাড়ে। দূরবীন চোখে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে ধক করে উঠল আমার বুকের ভেতর। ওল্টানো নৌকাটা আর কিছু নয় আমাদেরই কাটারটা। আর ওটার কিনার ধরে যারা ভাসছে তারা আমাদের মহিলারা। ওল্টানো তলিটার ওপর গাদাগাদি করে বসিয়ে রেখেছে বাচ্চাদের।

এ দৃশ্য দেখে আমাদের অবস্থা কী হতে পারে বুঝতেই পারছেন। প্রথমে তো বিশ্বাসই করতে পারিনি চোখে ঠিক দেখছি। যখন বিশ্বাস হলো, এক মুহূর্ত দেরি না করে ছুটলাম ম্যাককয়-এর বাড়িতে কুইনটালকে আনতে। ও তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। ধাক্কাধাক্কিতে কাজ হলো না, রীতিমত লাথি হাঁকাতে হলো তাকে জাগাতে। বিশ্রী এক গাল দিয়ে উঠে বসল কুইনটাল। ম্যাককয় ওকে জানাল ঘটনাটা। শুনে তক্ষুণি উঠে দাঁড়াল ও। চারজন ছুটে গেলাম খাঁড়ির যেখানে আমাদের ক্যানোগুলো রাখা হয় সেখানে। বড় ক্যানোটা জলে ভাসিয়ে আমি আর ইয়ং রওনা হয়ে গেলাম। অন্য ক্যানোটা নিয়ে আসতে লাগল ম্যাককয় আর কুইনটাল।

প্রাণপণে বৈঠা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম আমরা। মেয়েগুলো যদি আমাদের দেশী হত, কোন সন্দেহ নেই সেদিন একাধিক বাচ্চা ডুবে মারা যেত। ওরা ইন্ডিয়ান বলেই তেমন কিছু ঘটেনি। ওল্টানো কাটারটার কেবল খানেকের ভেতর পৌঁছুতেই গ্রুডেন্স আর মেরি তাদের বাচ্চাদের নিয়ে সাঁতরে আমাদের দিকে আসতে শুরু করল। বাচ্চা দুটোকে আগে ক্যানোয় তুলে দিয়ে ওরা উঠে বসল। পরের মিনিটখানেকের ভেতর আমরা পৌঁছে গেলাম কাটারের পাশে। মিসেস ক্রিশ্চিয়ানের কাছ থেকে বাচ্চা মেরিকে নিলাম। তারপর একে একে বড় বাচ্চাগুলোকে।

ম্যাককয় আর কুইনটালও এসে পড়েছে অন্য ক্যানোটা নিয়ে।

'ম্যাট ঠিক আছে তো?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল কুইনটাল।

'হ্যাঁ, আছে!' আমি জবাব দিলাম।

কাছে এসে বাচ্চাটাকে নিরাপদ দেখার পর কুইনটালের মুখে যে স্বস্তি ফুটে উঠেছিল আজীবন তা আমার মনে থাকবে। দুই ক্যানোয় সবাইকে এঁটে গেল।

মিসেস ক্রিশ্চিয়ান সব শেষে উঠল। এরপর কাটারটাকে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে আমরা ফিরে চললাম তীরের দিকে। কয়েকটা মেয়ে কাঁদছিল। কিন্তু পুরো পথে কোন কথা বলেনি কেউ। মিসেস ক্রিশ্চিয়ানের চেহারায় এমন এক হতাশা ফুটে উঠেছিল, তার সে চেহারা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার মনে হানা দিয়ে বেড়াবে।

বললে বিশ্বাস করবেন, স্যার? বাচ্চাদের নিয়ে ওই কাটারে করে ওরা তাহিতি চলে যেতে চেয়েছিল! মিসেস ক্রিশ্চিয়ান মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের কাছে কম্পাস দেখে দিক ঠিক করা শিখেছিল। পিটকেয়ার্ন থেকে কোন দিকে গেলে তাহিতি পাওয়া যাবে তা-ও তার জানা ছিল। এইটুকুর ওপর ভরসা করে অতবড় একটা ঝুঁকি নিয়েছিল ওরা। ওই ঝড়টা যদি না হত, কোন সন্দেহ নেই চিরদিনের জন্যে আমরা হারাতাম ওদের।

সেদিন সন্ধ্যায় আমরা চার পুরুষ মিলিত হলাম, পান করার জন্যে নয়। ম্যাককয়ই প্রথম কথা বলল:

'মিস্টার ইয়ং, আমার উচিত শিক্ষা হয়ে গেছে! সব দোষ আমার। আমি যদি ওই পাতন যন্ত্রটা না বানাতাম, আজ এসব কিছুই ঘটত না। আমার কারণে আরও বিপদ ঘটুক, আমি চাই না। এখানে আমাদের ছেলেমেয়ে আছে, চমৎকার মেয়েমানুষরা আছে। এখন থেকে আমি ভদ্র জীবন যাপন করতে চাই।'

'আমি এক্কমত তোমার সঙ্গে, উইল।' উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললাম।

আমরা সবাই একমত হলাম, এমনকি শপথ পর্যন্ত নিলাম যে আর মদ বানানো হবে না, এখন থেকে নতুন জীবন শুরু করব আমরা। হ্যাঁ, সেদিন সন্ধ্যায় আমরা আন্তরিকভাবে ভেবেছিলাম, আশা করেছিলাম, আসছে দিনগুলো আমরা শান্তিতে কাটাতে পারব।

ষোলো

এবার, স্যার, তিনটে বছর পেরিয়ে আসছি আমি। এই সময়টার কথা আমি মনেও করতে চাই না। বলেছিলাম এখানে যা যা ঘটেছে সব বলব, কিন্তু সব শোনা আপনার উচিত হবে না। ওই বছরগুলো সম্পর্কে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, আমরা খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। রাতারাতি না অবশ্য। মেয়েরা দ্বীপ ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করার পর দু'তিন মাস আমরা আমাদের কথা রেখেছিলাম। এক ফোঁটা মদ স্পর্শ করিনি কেউ। চার জনই চেষ্টা করেছিলাম নতুন করে শুরু করার। কিন্তু তারপর আবার সেই পুরনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি। শপথ ভেঙে মদ খাওয়া শুরু করলাম আমরা। এবং কয়েক সপ্তা যেতে না যেতেই মাইমিতি বসতি ছেড়ে তার তিন বাচ্চাকে নিয়ে আউতে উপত্যকায় চলে গেল থাকবার জন্যে। মোয়েটুয়া আর নানাইও গেল ওর সঙ্গে। ওখানে ওরা আমাদের, মানে পুরুষদের কারও সাহায্য ছাড়াই ঘর তুলে বাস করতে লাগল। এবং আরও কয়েক

সপ্তা যেতে না যেতেই জেনি আর টাউরুয়াও চলে গেল ওখানে। সাথে নিয়ে গেল সব ক'টা বাচ্চাকে।

এই পুরোটা সময় বলহাদি আমার সাথে থেকেছে আর আশা করেছে আমার চেতনা ফিরবে একদিন। ম্যাককয়-এর মেরিও তা-ই করেছে। কিন্তু আমরা সামান্যই নজর দিয়েছি ওদের দিকে। শেষে বিরক্ত হয়ে ওরাও চলে গেল মিসেস ক্রিশ্চিয়ানের ওখানে। মেয়েদের চারজন—হুটিয়া, সুজানাহ, প্রুডেন্স আর সারাহ; মানে কুইনটালের মেয়েমানুষ আমাদের সাথে রয়ে গেল। আমরা এই আটজনে পরের কয়েকটা মাস এমন এক জীবন যাপন করেছি যার কথা ভাবলেও এখন আমার লজ্জা হয়।

মিস্টার ইয়ং ভদ্রঘরের ছেলে। ও যে কী করে আমাদের মত ছোটলোকদের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল ভেবে পাই না। নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা ওর ছিল না। আমাদের ওর পথে নিতে পারবে না ভেবে ও-ই আমাদের পথ ধরেছিল।

১৭৯৭-এর শেষাশেষি পর্যন্ত এভাবেই চলেছে। তারপর ঘটল সেই ঘটনা। একটা শুয়োর মেরে আমরা উৎসব করছিলাম। আমরা চার পুরুষ আর যাদের কথা বললাম সেই চার মেয়ে। ঘটনাক্রমে সেদিন জেনি আর মোয়েটুয়া বসতিতে এসেছিল। পুরোপুরি মত্ত আমরা তখন। মোয়েটুয়াকে দেখেই ম্যাককয়-এর মনে পড়ে গেল চার বছর আগে ঠিক এই সপ্তায় এ দ্বীপের শেষ ইন্ডিয়ান পুরুষটা নিহত হয়েছিল। তখন সে এমনই মাতাল যে সদম্ভে ঘোষণা করল, সেদিনের সেই ঘটনা স্মরণ করার জন্যেই আমরা এই উৎসব করছি। এরপর কুইনটাল মোয়েটুয়াকে অভিনয় করে দেখাল কীভাবে সে তার স্বামীকে পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে ফেলে দিয়েছিল। আমি নিজে কী করেছিলাম মনে নেই আমার। তবে কুইনটাল বা ম্যাককয়-এর চেয়ে ভাল কিছু যে করিনি তাতে সন্দেহ নেই।

আতঙ্কিত অবস্থায় ছুটে পালানোর চেষ্টা করেছিল মোয়েটুয়া আর জেনি। কিন্তু ম্যাককয় আর কুইনটাল ওদের ধরে ফেলে। এক দফা মারামারি হয় দু'দলে। আমি এমন মাতাল ছিলাম যে তাতে অংশ নিতে পারিনি। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখি মিস্টার ইয়ং বিছানায় শুয়ে আছে; কুইনটাল আর ম্যাককয় পড়ে আছে মাটিতে। ম্যাককয়-এর পোশাক আশাক ছেঁড়া, সারা গায়ে আঁচড় কামড়ের দাগ। কুইনটালের মুখে দাড়িতে জমাট বেঁধে আছে রক্ত, কপালে গভীর একটা ক্ষত। ঘরের টেবিল, বেঞ্চ সব উল্টে পড়ে আছে। মেঝেতে বোতল, গ্লাস ভাঙা টুকরো ছড়ানো।

ওদের না জাগিয়ে বাড়ি গেলাম আমি। কাউকে পেলাম না সেখানে। পাওয়ার কথাও নয়। মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের ঘরে ঢুকলাম। প্রুডেন্স আর সুজানাহ সেসময় থাকত ওখানে। মাইমিতি আউতে উপত্যকায় চলে যাওয়ার পর একবারের জন্যে পা রাখেনি সেখানে বা বসতিতে।

বাউন্টির ক্রোনোমিটারটা ছিল মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের ঘরে। ওটায় চাবি দিলাম। এই একটা কাজ আমি নিষ্ঠার সাথে করতাম। এখনও করি। মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের দিন পঞ্জিকারও দায়িত্ব নিয়েছিলাম আমি। একদিন উনি বলেছিলেন; 'আলেক্স, আমার বা ইয়ং-এর যদি কিছু হয় দিনপঞ্জী রাখাটা তুমি চালিয়ে যেও। নইলে

তোমরা জানতেও পারবে না কোথায় আছ।'

ভাবছেন এ ঘটনার পর আমরা ভাল হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন ভাল বা মন্দ হওয়ার ঊর্ধ্বে আমরা। ঘড়িটায় চাবি দিয়েই ফিরে গেলাম আমি আড্ডায় এবং আবার মদ নিয়ে বসলাম। বাকিরাও এর ভেতর উঠে বসে গেছে। পর দিনটাও এমন চলল। তিন দিনের দিন মদের প্রতি একটু অনীহা জাগল আমার। সকালে একটুও খেলাম না। দুপুর নাগাদ মাথাটা পরিষ্কার হয়ে এল। খিদে পাওয়ায় খাবার খুঁজতে গিয়ে দেখলাম ঘরে কিছুই নেই। আমাদের চার মদের সঙ্গিনী আমাদের রান্নাবান্না করত। ঘরে কিছু নেই, তার মানে আজ রান্না করেনি ওরা। কেন খোঁজ নিতে বেরিয়ে বসতিতে পেলাম না কাউকে। গোসল করছে ভেবে ব্রাউনের কুয়ার কাছে গেলাম। সেখানেও কেউ নেই। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম কোথায় গেল সব। পর দিনও ওদের দেখা পেলাম না, তার পর দিনও না। পাকা কলা আর নারকেল ছাড়া আর কিছু খাওয়া জুটল না আমাদের এ কদিন।

অবশেষে ক্ষুধায় অস্থির হয়ে বসতি ছেড়ে বনের পথ ধরলাম আমি। কুইনটাল, ম্যাককয় আর ইয়ং বাড়িতেই রইল। নিজের অজান্তেই কখন যে আউতে উপত্যকায় পৌঁছে গেছি টের পাইনি। পেলাম চোখের সামনে অদ্ভুত এক জিনিস দেখে। ছোটখাট একটা দুর্গ দাঁড়িয়ে আছে সামনে। মোটামুটি মোটা গাছের গুঁড়ি গায়ে গায়ে লাগিয়ে মাটিতে পুঁতে ঘিরে ফেলা হয়েছে খানিকটা জায়গা। কম পক্ষে বারো ফুট উঁচু খুঁটিগুলো। অনুমান করলাম ঘেরটা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিশ গজ করে। সামনে জমি পরিষ্কার করা হয়েছে ইয়ামের খেত করার জন্যে। একধারে মোরগ মুরগিদের অন্য ধারে শুয়োরের খোঁয়াড়!

হতভম্বের মত আমি দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ধীর পায়ে এগোতে শুরু করলাম। অবশেষে মেয়েদের কয়েকজন দেখল আমাকে। চারজন এগিয়ে এল। একেবারে সামনে মিসেস ক্রিশ্চিয়ান। তার পেছনে পাশাপাশি মোয়েটুয়া, প্রুডেন্স আর হুটিয়া। আমার কাছ থেকে দশ বারো গজ মত দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। মাইমিতি বলল:

'যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়াও, আলেক্স! কী চাও তুমি?'

কী বলব আমি কিছু বুঝে পেলাম না। অবশেষে কোন মতে জিজ্ঞেস করলাম: 'বলহাদি কই?'

'আছে এখানে।'

'আমি ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।'

সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকাল মিসেস ক্রিশ্চিয়ান। তারপর আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠে বলল 'যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও। বলহাদির আর প্রয়োজন নেই তোমাকে।'

'ও নিজের মুখে বলুক সে কথা।' মাইমিতি সত্য কথা বলেছে বুঝতে পেরেও আমি বললাম।

পেছন ফিরে বাকি মেয়েদের ইশারা করল মাইমিতি। ঘেরের বাইরে এসে খেতের প্রান্তে দাঁড়াল ওরা। বলহাদিকেও দেখলাম তাদের ভেতর। মাইমিতি ওকে জিজ্ঞেস করল আমার সাথে যেতে চায় কিনা। বলহাদি সরাসরি জবাব দিল

'না।'

এর পর মাইমিতি বলল, 'শুনলে তো? এবার ফিরে যাও, আলেক্স। আর একটা কথা মনে রাখবে, দ্বীপের অন্য পাশে থাকবে তোমরা, ওখানে যা খুশি করো, আমরা বাধা দিতে যাব না, কিন্তু আজ থেকে তোমাদের কেউ যদি আউতে উপত্যকায় পা ফেল নিজের দায়িত্বে ফেলবে। সবগুলো মাস্কেট এবং বারুদ, গুলি, সীসা আমরা নিয়ে এসেছি। তুমি ভাল করেই জানো আমাদের অর্ধেকেরও বেশি তোমাদের পুরুষদের মতই নিখুঁত নিশানায় গুলি ছুঁড়তে পারে। সুতরাং সাবধান। গিয়ে তোমার বন্ধুদেরও জানিয়ে দেবে এ কথা।'

'তুমি কি মনে করো, মাইমিতি, আমরা তোমার এই আদেশ মেনে নেব?' একরোখা স্বরে আমি বললাম। 'আমাদের স্ত্রীদের ফিরিয়ে দাও তার পর দেখা যাবে...'

'কিছুই দেখার নেই,' আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল টাউরুয়া। 'তোমাদের অনেক সুযোগ দেয়া হয়েছে। শুয়োরের চেয়ে নীচ তোমরা। আমরা কেউ আর তোমাদের কাছে ফিরে যাব না। তুমি এবার যেতে পারো।'

ওরা যে গুরুত্বের সঙ্গে বলছে বুঝতে আমার অসুবিধা হলো না। তবু আমি গালিগালাজ শুরু করলাম। ভয় দেখাতে লাগলাম। সারাহর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করলাম: 'কুইনটালকে গিয়ে বলি আগে তারপর মজা টের পাবে! পিটিয়ে আধমরা করবে তোমাকে।'

সারাহর মুখটা শুকিয়ে গেল। মাইমিতির আশ্রয়ে একশো ভাগ নিরাপদ বোধ করছে না সে, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বেশ মজা পেলাম আমি। কিন্তু এর পর মাইমিতি যা বলল তা শুনে আর রইল না মজাটা।

'তোমার কুইনটালকে বলে দিও,' আগের মত শান্ত কণ্ঠে বলল সে, 'আমরা এখানে রাত দিন পাহারা রাখি। ও বা তোমাদের আর কেউ যদি আমাদের ওপর হামলা চালাতে আসে; শপথ করে বলছি, সেই আসা তার শেষ আসা হবে। এবার ভাগো। তোমাকে আর কিছু বলার নেই আমাদের।'

যে পথে গিয়েছিলাম সে পথে ফিরে এলাম আমি। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। যেন মাইমিতির কথাগুলোর মর্ম তখনও আমার মাথায় ঢোকেনি। অবশেষে উঠলাম আমি। একে একে বসতির সবগুলো বাড়ি, সবগুলো ঘর ভাল করে তল্লাশী করলাম। একটা মাস্কেট, পিস্তল, বা গুলির দেখা পেলাম না। গুদামে পেলাম না একটুও বারুদ। তার মানে মিসেস ক্রিশ্চিয়ান ঠিকই বলেছে।

বাড়িতে ফিরে এলাম। ম্যাককয় আর কুইনটাল তখনও ঘুমাচ্ছে মাতাল অবস্থায়। ওদের জাগানোর চেষ্টা করলাম না আমি। করলেও সফল হতাম কিনা সন্দেহ। মিস্টার ইয়ং বাড়িতে ছিল না। খুঁজতে বেরিয়ে সাগরের দিকের ঢালে বসে থাকতে দেখলাম তাকে। কাছে গিয়ে ওকে বললাম সব কথা।

'এ ছাড়া আর কী আশা করতে পারতাম আমরা,' তিক্ত হেসে ও বলল। 'আরও আগে যে ওরা আমাদের ছেড়ে যায়নি কেন সেটাই আশ্চর্য।'

'এখন কী করব আমরা?' ওর নির্লিপ্ত ভাব দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কী করার আছে? কিছুই না, আলেক্স। ওদেরকে ওদের মত থাকতে দেয়ার

পক্ষে আমি। তোমরা তোমাদের যা ইচ্ছা করতে পারো।' এই বলে ইয়ং উঠে ওর বাড়ির দিকে চলে গেল। আমি ওর সাথে যেতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম ও একা থাকতে চাইছে তাই ওকে বিরক্ত করলাম না।

বিকেলে ম্যাককয় আর কুইনটাল ঘুম থেকে ওঠার পর ওদের বললাম মেয়েরা আমাকে কী বলেছে।

ইয়ং-এর কথারই প্রতিধ্বনি করল ম্যাককয়। 'এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারত না,' বলল সে। 'ওরা ওদের মত থাক, আমরা আমাদের মত।'

'কী!' চিৎকার করল ম্যাট। 'বাকি জীবনে আর ওদের কাছে পাব না?'

'থামো তো,' বলল ম্যাককয়। 'তুমি কি ভাবো বেশি দিন ওরা অমনি থাকতে পারবে? শিগ্‌গিরই, দেখবে আপনিই মাথা নুইয়ে আসছে আমাদের কাছে। মাইমিতি আর টাউরুয়া ওদের উস্কেছে। থাক কিছুদিন একা···'

'না,' আগের মতই চিৎকার করল ম্যাট। 'আমি ওদের ছেড়ে দেব না। যে করেই হোক ওদের কাউকে না কাউকে আমি ধরে আনব।'

'উঁহুঁ, ম্যাট, অমন বোকামি করতে যেও না,' বলল ম্যাককয়। 'সবগুলো মাস্কেট ওরা দখল করেছে, এবং ওদের অন্তত ছ'জন আমাদের মতই গুলি ছুঁড়তে পারে। এখন ওদের ঘাঁটানো ঠিক হবে না। বললাম তো, আমরা বিরক্ত না করলে নিজে থেকেই ওরা আসবে আমাদের কাছে।'

'তোমরা চাইলে থাকতে পারো চুপ করে,' বলল কুইনটাল। 'আমি যাচ্ছি।' আর একটা কথাও না বলে উঠে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। জানালা দিয়ে দেখলাম, উপত্যকার দিকে যাচ্ছে সে।

'কী মনে হয় তোমার, আলেক্স?' ম্যাককয় জিজ্ঞেস করল, 'ওর কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করবে ওরা?'

আমি নিজেও জানি না প্রশ্নটার উত্তর। তা-ই বললাম ম্যাককয়কে।

'চলো, আমরাও যাই,' বলল ম্যাককয়, 'দেখি গিয়ে ওরা কী করে। ওদের দুর্গটাও দেখতে চাই আমি।'

রওনা হলাম আমরা কুইনটালের পেছন পেছন। আউতে উপত্যকার ওপরের অংশে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত ওকে দেখতে পেলাম না। যখন দেখলাম তখন বনের প্রান্তে পৌঁছে গেছে ও। তাকিয়ে আছে দুর্গটার দিকে।

'ও ঈশ্বর!' অস্ফুট একটা ধ্বনি বেরোল ম্যাককয়-এর গলা দিয়ে।

কুইনটালের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা।

'কবে বানাল ওরা এটা?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল কুইনটাল।

'সে নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই,' বলল ম্যাককয়, 'দেখছ তো কেমন মজবুত। যদি পাগল না হয়ে থাকো, আশা করি আমাদের সঙ্গে ফিরে যাবে তুমি। চলো।'

'না, তোমরা ইচ্ছে হলে যেতে পারো,' গোঁয়ারের মত বলল কুইনটাল। 'আমি যে জন্যে এসেছি তা না করে যাব না।'

একটা গাছ থেকে মোটা একটা ডাল ভেঙে নিয়ে সে এগিয়ে গেল। দুর্গের সামনের ফাঁকা জায়গায় তখনও কাজ করছিল মেয়েরা। কুইনটাল বন থেকে বেরিয়ে

সামান্য এগোতেই ওকে দেখে ফেলল তাদের কয়েকজন। আমরা ভেবেছিলাম ওকে দেখা মাত্র ভয়ে হুড়োহুড়ি করে দুর্গে ঢুকে পড়বে মেয়েগুলো। কিন্তু তেমন কিছু তো করলই না বরং এক জায়গায় সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে সবাই অপেক্ষা করতে লাগল কুইনটালের জন্যে! সারির মাঝখানে অবস্থান নিয়েছে মোয়েটুয়া আর প্রুডেন্স। মোয়েটুয়ার হাতে ডাণ্ডা আর প্রুডেন্সের কাছে মাস্কেট। মিসেস ক্রিশ্চিয়ান সারির এক প্রান্তে, অন্য প্রান্তে হুটিয়া, বলহাদি আর টাউরুয়া।

মোয়েটুয়া হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল আর প্রুডেন্স ওর কাঁধে মাস্কেটের নল রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মিসেস ক্রিশ্চিয়ান একটা পাথরের পেছনে হাঁটু মুড়ে বসে পাথরের ওপর মাস্কেট রাখল। বিশ সেকেন্ডেরও কম সময়ের ভেতর ওরা তৈরি হয়ে গেল কুইনটালের জন্যে। ওদের কাছ থেকে ষাট গজ মত দূরে পৌঁছে একটু দাঁড়াল কুইনটাল। তারপর আবার এগিয়ে যেতে লাগল ধীর এবং নিশ্চিত পদক্ষেপে। তিন পা যাওয়ার আগেই গর্জে উঠল মাইমিতির মাস্কেট। চরকির মত আধ পাক ঘুরে বসে পড়তে দেখলাম কুইনটালকে। কয়েক সেকেন্ড পর সে হিংস্র এক গর্জন করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার। প্রুডেন্সের মাস্কেট থেকে এবার গুলি ছুটল। আর বীরত্ব দেখানোর চেষ্টা করল না কুইনটাল। ঘুরে চোঁ চাঁ দৌড় লাগাল আমাদের দিকে। মেয়েরা ছুটে আসতে লাগল পেছন পেছন মোয়েটুয়ার নেতৃত্বে। পড়ি কি মরি করে ছুটতে ছুটতে আমাদের কাছে এল কুইনটাল এবং না দাঁড়িয়েই দৌড়াতে লাগল মূল উপত্যকার ওপাশে বসতির দিকে। মেয়েদের উদ্দেশ্য কী দেখার জন্যে দাঁড়ালাম না আমি আর ম্যাককয়। ঊর্ধ্বশ্বাসে অনুসরণ করলাম কুইনটালকে।

বাড়ি পৌঁছে দেখলাম ও দরজার কাছের বেঞ্চটায় বসে আছে বাঁ কাঁধ ধরে। মাইমিতির গুলিটা ওখানকার খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু প্রুডেন্স হত্যার উদ্দেশ্যেই গুলি চালিয়েছিল। কুইনটালের একটা কান উড়িয়ে নিয়ে গেছে গুলিটা। ম্যাককয় আর আমাকে পরের একটা ঘণ্টা ব্যস্ত থাকতে হলো ওর পরিচর্যায়।

আর কোন সন্দেহ নেই, মাইমিতি যা বলেছে তা-ই বোঝাতে চেয়েছে। ফালতু ভয় দেখানোর জন্যে বলেনি। এর পরও ম্যাককয়-এর ধারণা হয়েছে মেয়েরা—সবাই না হলেও অন্তত কয়েক জন ফিরে আসবে। কুইনটালের কাঁধে পট্টি বাঁধতে বাঁধতে ও বলল:

'চিন্তা কোরো না, ম্যাট, ওদের পেছনে ছুটতে হবে না, ওরাই ছুটবে আমাদের পেছনে। আমি বলছি, দেখো, এই সপ্তা ঘোরার আগেই ওদের দু'বা তিন জন এখানে চলে আসবে।'

কিন্তু দু'মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও কেউ এল না।

এই দু'মাসে মিস্টার ইয়ং-এর চেহারা সামান্যই দেখেছি আমরা। মেয়েদের দুর্গটার কথা যেদিন বলি তার পর একবারও ও ম্যাককয়-এর বাড়িতে আসেনি। আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এক ফোঁটা মদ স্পর্শ করেনি। ওর সাথে দেখা সাক্ষাৎ যা হয়, বনে বা সাগর পাড়ে বা ওর বাড়িতে গেলে। ওর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে বেশ চিন্তিত আমি। বছর খানেক আগে থেকে শুরু হয়েছে হাঁপানির সমস্যা। চিকিৎসার অভাবে তা এই এক বছরে গুরুতর হয়ে উঠেছে। দেখাশোনার জন্যে

একজন মানুষ ওর সত্যিই দরকার, কিন্তু কোথায় পাবে? কুইনটাল তো নয়ই, আমি বা ম্যাককয়ও সার্বক্ষণিকভাবে একজন হাঁপানি রোগীর সেবা করার যোগ্য ছিলাম না। তখন সে মানসিকতাও আমাদের ছিল না। ওর অসুস্থতার কথা মেয়েদের জানাতে চেয়েছিলাম আমি, ও দেয়নি। এই সময়টায় আমার মনে হত, বেঁচে থেকেও মরে গেছে ইয়ং। দেখা হলে হাসি মুখে কথা বলত ঠিকই কিন্তু বুঝতে পারতাম হাসিটা ফোটাতে কী কষ্ট করতে হচ্ছে ওকে।

দু'মাস লাগল কুইনটালের ক্ষত ভাল হতে। এর পর ও আর ম্যাককয় ঠিক করল, যথেষ্ট অপেক্ষা করা হয়েছে, আর নয়। এবার কিছু কাজ দেখাতে হবে। আমি বাধা দেয়ার চেষ্টা করলাম। বললাম তাতে ঝামেলাই শুধু বাড়বে। আমার কোন কথাই ওরা শুনতে রাজি হলো না।

'কী করবে তুমি?' অবশেষে ম্যাককয়কে জিজ্ঞেস করলাম। 'আসতে চাক না চাক মেরিকে নিয়ে আসবে?'

'মেরি?' ও বলল। 'আমার সামনে এখন হামাগুড়ি দিয়ে কাঁদলেও ওকে আমি নেব না। আরও মেয়ে আছে ওখানে। তাঁদের একটাকে ধরে নিয়ে আসব!'

কুইনটালেরও এক ইচ্ছা, পছন্দ মত একটা মেয়েকে ধরে আনবে সে। আমার সব আবেদন ব্যর্থ হলো, ওরা ওদের গোঁ ছাড়তে রাজি হলো না। মিসেস ক্রিশ্চিয়ানকে খবরটা জানিয়ে আসার কথা ভাবলাম একবার আমি। কিন্তু ভয় হলো, যদি আমাকে দেখেই ওরা গুলি করে বসে। আমাকে বলা হয়েছে আউতে উপত্যকায় না যেতে, আমি যাব না। বাকিরা যা খুশি করুক।

কয়েকটা দিন শলা পরামর্শ করে কাটাল ম্যাককয় আর কুইনটাল। তারপর এক ভোরে রওনা হলো ওরা। দু'জনই মাতাল তখন তবে পুরোপুরি বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত নয়। সেদিন আমি আমার বাড়িতে ছিলাম, ঘটনাটা পরে শুনেছি।

প্রথম দিন কুইনটাল যে দিক দিয়ে গিয়েছিল এদিন সে পথে যায়নি ওরা। ঘুর পথে পাহাড়ের ওপর গিয়ে এক ঝোপের ভেতর ঘাপটি মেরে বসে ছিল দু'জন। ওখান থেকে দুর্গের সামনের খেত, বাগান পরিষ্কার দেখা যায়। কয়েকটা মেয়ে বাগানে কাজ করছিল। প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল মাস্কেট। পুরো দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ম্যাককয় আর কুইনটাল দেখতে পায়, নানাই আর জেনি বেরিয়ে আসছে দুর্গ থেকে। হাতে ঝুড়ি, দু'জনই নিরস্ত্র। পশ্চিম দিকে এগিয়ে যায় ওরা।

দক্ষিণের পাহাড়ের নিচে খাড়া এক উপত্যাকা নেমে গেছে সাগরের দিকে। নানাই আর জেনি সেদিকেই যাচ্ছে যতক্ষণ না এব্যাপারে নিশ্চিত হলো ততক্ষণ অপেক্ষা করল ম্যাককয় আর কুইনটাল। তারপর ঘুরে চলে গেল আউতে উপত্যকার পশ্চিম পাশে। পথের ধারে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে বসে রইল। একটু পরেই দেখল মেয়ে দুটো আসছে। নানাইয়ের কাঁধে একটা লাঠিতে বাঁধা এক কাঁদি কলা আর হাতের ঝুড়িতে শেলফিশ। জেনির হাতে শুধু ঝুড়ি। ওরা কাছাকাছি হতেই ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে দু'জনের ওপর লাফিয়ে পড়ল ম্যাককয় আর কুইনটাল। ম্যাককয় জেনির ওপর, কুইনটাল নানাইয়ের ওপর। এমন আচমকা আক্রান্ত হলো মেয়ে দুটো যে ওরা বাধা দেয়া দূরে থাক কোন শব্দও করতে পারল না। দু'জনকে বেঁধে, মুখের ভেতর গোঁজ ভরে বাড়িতে নিয়ে এল ম্যাককয় আর কুইনটাল।

নানাই ভীতু বেশি। সেজন্যে বাড়িতে এনে আগে ওর বাঁধন খুলে দিল কুইনটাল। ম্যাককয় গালাগালি, বকাঝকা করতে লাগল জেনিকে। জেনিও কম যায় না। ম্যাককয়-এর গালাগালির জবাবে সে-ও মুখ ছোটাল। 'আমার গায়ে হাত তুলে দেখ, উইল ম্যাককয়, তোমার জান না নেয়া পর্যন্ত আমি শান্ত হব না,' বলল সে। 'আলেক্স আর নেড ইয়ং কোথায়?'

'তা দিয়ে তোর কী দরকার!' বলল ম্যাককয়। 'অনেকদিন ধরে নেড অসুস্থ তার পরও তোরা আটকে রেখেছিস টাউরুয়াকে!'

এর পর ও বলে আমিও নিজের জন্যে একটা মেয়ে শিকার করতে গেছি, শিগগিরই এসে যোগ দেব ওদের সাথে।

নানাই এক কোণে গুটিসুটি হয়ে বসে ছিল। ও এইসময় লাফ দিয়ে উঠে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু দরজার কাছ পর্যন্ত যাওয়ার আগেই ধরা পড়ে কুইনটালের হাতে। কুইনটাল চুল ধরে টানতে টানতে ওকে ফিরিয়ে আনে আগের জায়গায়। এর পরের ঘটনা আর শুনতে চাইবেন না। প্রথমে মেয়ে দুটোকে ওরা ওদের সাথে মদ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। না পেরে শেষে চড়াও হয় ওদের শরীরের ওপর। রাতে কুইনটাল আর ম্যাককয় ঘুমিয়ে পড়ার পর ওরা পালায়। পরদিন সকালে আমি ওখানে পৌঁছে দেখি, ঝড়ের পরের চেহারা হয়েছে ঘরটার। ম্যাককয় তার কামড় খাওয়া হাতের পরিচর্যা করছে। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করলাম আমি। ওরা কোন জবাব দিল না।

সতেরো

পরদিন মিস্টার ইয়ং এল আমাদের সাথে দেখা করতে। হাঁপানির খুব বাড়াবাড়ি দেখা দিয়েছে এটুকুই সে বলতে পারল। তারপর কুঁকড়ে গেল কাশির দমকে। সেই সকালে প্রথম বুঝতে পারি কী শোচনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তার শরীর। হাড্ডির ওপর চামড়া ছাড়া কিছু প্রায় নেই। বেশ কয়েক মিনিট এক টানা কাশল সে। তারপর একটু সুস্থ হয়ে বলল কী জন্যে এসেছে।

'মেয়েরা একটা খবর পাঠিয়েছে আমাকে দিয়ে তোমাদের কাছে,' বলল সে। 'মাইমিতি বলেছে, তোমাদের তিন জনকে দ্বীপ ছাড়তে হবে। ওরা সবাই একমত এ ব্যাপারে। কাটারটা এবং আর যা যা দরকার নিতে পারো তোমরা, কিন্তু এখানে থাকতে পারবে না কিছুতেই।'

'থাকতে পারব না!' আমি বললাম। 'কোথায় যাব?'

'তা ওরা বলেনি। তাহিতিতে বা যেখানে খুশি। প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে ওরা তিন দিন সময় দিয়েছে তোমাদের।'

'ওরা কি ভেবেছে ওরা বললেই আমরা লেজ গুটিয়ে পালাব?' বলল ম্যাককয়।

'মাইমিতি বলেছে, তোমাদের যেতেই হবে,' জবাব দিল ইয়ং প্রায় ফিসফিসে কণ্ঠে। 'আমার মনে হয় ওর কথা মেনে নেয়া উচিত হবে তোমাদের। আমিও

তোমাদের সাথে যাব।'

'তুমি!' আমি বললাম। 'না, নেড, তা আমরা হতে দিতে পারি না; তোমার শরীরের যা···।'

হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিল সে। 'দাঁড়াও, আলেক্স।···যা হয় হবে, আমি যেতে চাই।···আর কিছু না, এখান থেকে স্রেফ চলে যেতে চাই···। তাহিতি থেকে আসার সময় পশ্চিমে যে দ্বীপগুলো দেখেছিলাম তার কোনটায় উঠে পড়তে পারব আশা করি। অন্তত চেষ্টা তো করতে পারব।'

'আর যদি আমরা না যাই?' জিজ্ঞেস করল ম্যাককয়।

'মাইমিতি ফালতু কথা বলেছে বলে আমার মনে হয়নি। ওরা কোন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই নেবে।'

হাসল কুইনটাল। 'চেষ্টা করে দেখুক।'

ইয়ংকে ওরা যেতে বলেনি। তবু ও কেন যেতে চাইছে আমি বুঝতে পারছি। আমাদের চারজনের মধ্যে একমাত্র ও-ই সেক্সট্যান্টের ব্যবহার জানে। ওকে ছাড়া আমরা যে কোথাও পৌঁছুতে পারব না তা নিশ্চিত। সে কারণেই ও যেতে চাইছে আমাদের সঙ্গে। আমাদের সম্পর্কে ভাবছে বটে ও, কিন্তু নারী এবং শিশুদের নিয়ে ভাবছে আরও বেশি। ওদেরকে শান্তিতে থাকার একটা সুযোগ দিতে চায়।

'তোমার মত কী, আলেক্স?' কুইনটাল জিজ্ঞেস করল। 'কুত্তিগুলোর আদেশ মেনে নেবে? এই তুমি আর উইলের কারণেই আজ এ অবস্থা। নইলে অনেক আগেই আমরা ওদের বুঝিয়ে দিতে পারতাম কারা এখানকার প্রভু।'

'হ্যাঁ, কদিন আগে দারুণ বীরত্ব দেখিয়েছ তুমি,' আমি বললাম। 'একটা কান আর কাঁধের খানিকটা খুইয়ে কত জোরে দৌড়াতে পারো দেখিয়েছ। আমরা বাধা না দিলে ওই ধরনের আরও কিছু দেখাতে আর কি। তুমি আর উইলই ওদের এমনটা করতে বাধ্য করেছ।'

'বাধ্য করেছি!' বলল ম্যাককয়। 'কালকের আগ পর্যন্ত তো আমরা দূরেই ছিলাম ওদের কাছ থেকে।'

'তার পর কাল কী করেছ?'

এবার আর কথা ফুটল না ম্যাককয় আর কুইনটালের মুখে।

'যা-ই হোক, কিছু করে থাকো আর না-ই থাকো ওরা যা বলেছে গুরুত্বের সঙ্গেই বলেছে,' বলল ইয়ং।

'বসো, উইল, ম্যাট,' আমি বললাম, 'ভাল করে সব দিক বিবেচনা করে দেখি কোনটা করলে ভাল হবে।'

দীর্ঘ আলাপ হলো। কিন্তু ম্যাককয় বা কুইনটাল কাউকে বোঝাতে পারলাম না আমাদের চলে যাওয়াটাই উচিত হবে। শেষে বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল মিস্টার ইয়ং।

'আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি,' বলল সে। 'এবার তোমরা বুঝে দেখ তোমরা কী করবে। যাওয়ার আগে একটাই পরামর্শ দেব, সাবধানে থেকো।'

চলে গেল মিস্টার ইয়ং।

ম্যাককয় ওর পাতনযন্ত্রটা নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। ওর ভয় মেয়েরা

গোপনে গিয়ে ওটা নষ্ট করে ফেলতে পারে। কুইনটালের সাথে বুদ্ধি করে দু'জনে ওটা মূল উপত্যকার এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে এল। কয়েক মাস চলার মত মদ আমাদের হাতে মওজুদ ছিল। সেগুলোও লুকিয়ে রাখা হলো নিরাপদ জায়গায়।

এরপর শুরু হলো অপেক্ষার পালা। ম্যাককয় আর কুইনটালের ইচ্ছা তিন দিন পর মেয়েরা কী করে দেখে আমরা (আসলে ওরা দু'জন) যা করার করব।

তিন দিন পার হয়ে গেল, মেয়েদের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। আমি অবাক হলেও ম্যাককয় বা কুইনটাল মোটেই আশ্চর্য হলো না। ওরা এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে লাগল যার অর্থ, 'ভীতু কোথাকার!' দুপুরে খাওয়ার পর যথারীতি আমরা দিবানিদ্রা দিতে লেগে গেলাম। বিকেলের মাঝামাঝি নাগাদ আমি উঠলাম। বন্ধ জানালার দু'চারটে চিলতে ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকছে ঘরে। বিছানা থেকে নেমে হাই তুলতে তুলতে গিয়ে দাঁড়ালাম একটা জানালার সামনে। কপাটটা মেলে দিলাম অলস ভঙ্গিতে। অমনি ওপাশের বনের প্রান্ত থেকে গর্জে উঠল একটা মাস্কেট। আমার মাথার এক কি দুই ইঞ্চি পাশ দিয়ে চলে গেল গুলি। ঝট করে বসে পড়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলাম আমি।

ম্যাককয় আর কুইনটাল জেগে গেছে গুলির শব্দে। দু'জন এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'কী ও?' আমি ওদের চুপ থাকতে ইশারা করে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলাম দেয়ালের তক্তায় একটা ছোট ছিদ্রের দিকে। সেখানে চোখ রেখে দেখতে পেলাম সামনের গজ বিশেক প্রশস্ত পরিষ্কার করা জায়গাটা। তার ওপাশে বন। বনের দিকে তাকিয়ে প্রথমে কিছু দেখতে পেলাম না। তীক্ষ্ণ চোখে বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করার পর নজরে পড়ল এক ঝোপের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা মাস্কেটের নল। ফুটোয় চোখ রেখে যতটা সম্ভব ডানে বাঁয়ে তাকালাম। প্রথম ঝোপটা ছাড়িয়ে কিছুটা ওপাশে আরও একটা মাস্কেটের নল। মিনিট খানেক যেতে না যেতেই একটা গাছের পেছনে পলকের জন্যে দেখলাম হুটিয়াকে।

দেয়ালের কাছ থেকে সরে এসে ম্যাককয় আর কুইনটালকে বললাম যা দেখেছি। এরপর দেয়ালের ফাঁক ফোকর দিয়ে বাকি তিন দিক দেখলাম আমরা। একই দৃশ্য। প্রতি দিক থেকে একাধিক মাস্কেট তাক করে আছে ঘরের দিকে। আমাদের ঘিরে ফেলেছে মেয়েরা। সম্ভব হলে ওরা যে আমাদের হত্যা করবে তাতে সন্দেহ নেই। ম্যাককয় মিসেস ক্রিশ্চিয়ানের নাম ধরে ডাকাডাকি করল। জবাবে একটা গুলি ছুটে এসে কাঠের দেয়াল ভেদ করল। মেয়েদের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ওদের সব সতর্কবাণী, সব হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারিনি এ ধরনের ব্যবস্থা ওরা নেবে। ম্যাককয় আর কুইনটালের মুখ শুকিয়ে গেছে। আমার দিকে পারতপক্ষে আর চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। এদিকে দ্বিতীয় গুলিটা ছোঁড়ার পর থেকে মেয়েরা নিয়মিত বিরতিতে একটা বা দুটো করে গুলি ছুঁড়ে চলেছে দরজা বা জানালা লক্ষ্য করে। মেঝেতে শুয়ে থাকা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। চোদ্দটা মাস্কেট আর আধ ডজন পিস্তল আছে ওদের কাছে, এবং

যারা গুলি ছুঁড়তে পারে না তারা অন্যদের সাহায্য করছে মাস্কেটে গুলি বারুদ ভরে দিয়ে। আমাদের অবস্থা তখন ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত।

'চলো আচমকা উঠে ছুটে বেরিয়ে যাই,' কুইনটাল এক সময় বলল।

আমি ওকে সমর্থন করলাম।

'বোকার মত কথা বোলো না,' বলল ম্যাককয়। ওরা 'তা-ই চাইছে। শোনো, দিনের আলো যতক্ষণ আছে পালানোর কোন আশা নেই আমাদের। যা-ই করি অন্ধকার হওয়ার আগে করা উচিত হবে না।'

মনে হলো ঠিকই বলেছে ম্যাককয়। সুতরাং অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। অবশেষে সন্ধ্যা হলো। দরজা জানালা সব বন্ধ থাকায় গোধূলির আলো মিলিয়ে যাওয়ার অনেক আগেই ঘরের ভেতর অন্ধকার নেমে এসেছে। বাইরে অন্ধকার হওয়ার পর হঠাৎ দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম নারকেলের ডগার মশাল হাতে কয়েকটা মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের কাছে। জ্বলন্ত ডগাগুলো চালের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল ওরা।

দু'মিনিট যেতে না যেতেই পুরো বাড়ি অগ্নিকুণ্ড হয়ে উঠল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় রইল না আমাদের। কুইনটালটা এমন মাথা মোটা, ও উঠেই এগিয়ে গেল দরজার কপাটে ঠেকনা দিয়ে রাখা বেঞ্চ-টুলগুলো সরানোর জন্যে। সাগরের দিকের একটা জানালা খুলে লাফিয়ে পড়তে পড়তে আমি শুনলাম ওই দরজা লক্ষ্য করে একের পর এক গুলি ছুঁড়ছে মেয়েরা। লাফ দিয়ে যে মুহূর্তে মাটিতে পড়েছি সেই মুহূর্তে কুইনটালের আর্তচিৎকার পৌঁছুল আমার কানে। একই সময় একটা গুলি শিস কেটে বেরিয়ে গেল আমার কানের পাশ দিয়ে। কুইনটালকে সাহায্য করার ইচ্ছা থাকলেও উপায় রইল না। দ্বিতীয় গুলিটা আসার আগেই রান্নাঘরের দিকে একটা লাফ দিলাম আমি তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে। এক ছুটে পশ্চিমের পাহাড় পেরিয়ে গোট-হাউস চূড়ায় উঠে বসে রইলাম। সেখান থেকে দেখতে লাগলাম ম্যাককয়-এর বাড়ির পুড়ে যাওয়া। গোট-হাউস চূড়ায় পৌঁছুনোর পর আর কোন গুলির শব্দ শুনলাম না। চাঁদ না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম ওখানে। তারপর উঠে ধীরে ধীরে রওনা হলাম মিস্টার ইয়ং-এর বাড়ির দিকে।

আশপাশে কেউ নেই নিশ্চিত হওয়ার পর বাড়িতে ঢুকলাম আমি। কিন্তু ভেতরেও কেউ নেই। পরে জেনেছিলাম, আগের দিন কয়েকটা মেয়ে এসে ওকে খাটিয়ায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওদের দুর্গে। যা হোক, মিস্টার ইয়ংকে না পেয়ে তার ঘরে বসে ভাবতে লাগলাম এবার কী করব। কানে এল ম্যাককয়-এর নিচু সতর্ক গলা। মিস্টার ইয়ংকে ডাকছে।

বাড়ির সামনের অশ্বত্থ গাছটার নিচে লুকিয়ে ছিল ও। পায়ের মাংসল অংশে গুলি খেয়েছে। বলল, মোয়েটুয়া ওকে তাড়া করেছিল, কোনমতে বনের ভেতর ঢুকে বেঁচেছে। কুইনটালকে দেখেনি।

ওর পায়ের ক্ষত বেশ বড়ই। জায়গাটা পরিষ্কার করে বেঁধে দিলাম।

'ওরা আমাদের সত্যি সত্যি খুন করতে চেয়েছিল,' পট্টি বাঁধা শেষ হতে না হতেই উঠে দাঁড়িয়ে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে ম্যাককয় বলল। 'কুইনটালকে বোধ হয় শেষ

করে ফেলেছে! পালাই আমি!'

'আমারও তাই মনে হয়,' আমি বললাম। 'তবে রাতে আর ওরা কিছু করবে বলে মনে হয় না! ভোর না হওয়া পর্যন্ত এখানেই আমরা অপেক্ষা করতে পারি তারপর দেখব কী করা যায়।'

পরদিন ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ম্যাককয়-এর আহত পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। বেশিদূর যেতে পারল না ও। এক ঝোপে ওকে লুকিয়ে রেখে আমি একা নজর রাখতে লাগলাম বসতির দিকে। দুপুর পর্যন্ত তাকিয়ে থেকে মেয়েদের কাউকে দেখতে পেলাম না। কুইনটালকেও না। বসতির আশপাশের বনে খুঁজলাম। পেলাম না ওকে। অবশেষে ফিরে গেলাম ম্যাককয়-এর কাছে। ও সব শুনে রায় দিল, নিশ্চয়ই মারা গেছে কুইনটাল।

পুরো দশ দিন বসতি থেকে দূরে রইলাম আমরা। তারপর দুরু দুরু বুকে উঠলাম মিস্টার ইয়ং-এর বাড়িতে। কেবলই মনে হচ্ছিল মেয়েরা বোধহয় লুকিয়ে থেকে নজর রাখছে। সুযোগ সুবিধা মত এসে হত্যা করবে আমাদের। কিন্তু তিন সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পরও যখন কিছু ঘটল না, আমরা বুঝতে পারলাম, ওদের না ঘাঁটালে আমাদের আর কিছু করবে না মেয়েরা। এই তিন সপ্তাহ আহত পায়ের কারণে ঘরে শুয়ে বসে কাটাতে হলো ম্যাককয়কে। আর আমি ঘুরে বেড়ালাম খাবার আর কুইনটালের মৃতদেহের খোঁজে। সবচেয়ে আশ্চর্য যে ঘটনা, এ সময়ে আমরা মদ খাইনি একটুও। ইচ্ছে করলেই খেতে পারতাম, তবু খাইনি। মদ খাওয়ার কোন রকম আগ্রহই বোধ করিনি। না আমি, না ম্যাককয়।

একদিন সূর্যোদয়ের আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ম্যাককয়। ফিরে জানাল, ওর মেয়েমানুষ মেরির সঙ্গে বনের ভেতর দেখা করেছে ও। অন্যরা কেউ টের পায়নি।

'কুইনটালের কী হয়েছে কিছু বলতে পারল?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তেমন কিছু না। ওরা ওর গায়ে গুলি লাগাতে পেরেছে এটুকু বুঝেছে, কিন্তু ঠিক কী হয়েছে জানে না।'

'আমরা ওকে খুঁজে পাইনি, মেরিকে বলেছ?'

'হ্যাঁ। শুনে ও অবাক হলো। ওরা ভেবেছিল কুইনটাল মারাত্মক আহত; আর আমরা দু'জন ওর শুশ্রূষা করছি।'

'আরেকটা ব্যাপার জানতে চাই,' বললাম আমি, 'ওরা যেদিন তোমার বাড়ি পুড়িয়ে দিল মেরি আর বলহাদি এসেছিল অন্যদের সাথে?'

'না। ওরা অন্যদের ঠেকানোর চেষ্টা করেছিল। সারাহ কুইনটালও ছিল ওদের সাথে। ওদের সাথে আমরা যত খারাপ ব্যবহারই করে থাকি না কেন আমাদের মৃত্যু ওরা চায়নি।'

'অন্য মেয়েরা এখন কী ভাবছে আমাদের সম্পর্কে?'

'আমরা ওদের বিরক্ত না করলে ওরা আর কিছু বলবে না আমাদের।'

'একটা ব্যাপার আমার আশ্চর্য লাগছে, উইল, মেরিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করোনি তুমি?'

'করেছিলাম। এল না। ওকে তো আমি কম ভোগাইনি, আলেক্স।'

'উইল,' আমি বললাম, 'অভিশপ্ত চোলাই যন্ত্রটা, নষ্ট করে আবার আমরা ভাল হয়ে যেতে পারি না?'

'পারব না, আলেক্স,' করুণ কণ্ঠে জবাব দিল ম্যাককয়। 'ঈশ্বর মাফ করুন আমাকে, সত্যিই পারব না। এমন নিঃসঙ্গ, নির্জন জায়গায় ওই একটাই আমাদের একটুখানি আনন্দের উৎস। ওটা আমি নিজের হাতে নষ্ট করতে পারব না।'

'তা ঠিক,' আমি বললাম। 'নেড ইয়ং-এর খবর কী?'

'খুবই নাকি অসুস্থ, মেরি বলছিল। ওরা আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার আগের দিন ওকে নিয়ে গেছে এখান থেকে।'

'হুঁ,' আমি বললাম, 'নেডের দেখা আর তাহলে পাচ্ছি না আমরা। ও আর কখনও ফিরবে না আমাদের কাছে। ভালই। সবার জন্যেই ভাল।...আমি কী করব তোমাকে বলে দিচ্ছি, উইল, মেয়েদের ধারে কাছে ঘেঁষব না। যথেষ্ট ঝামেলা হয়েছে, আমি আর তা বাড়াতে চাই না।'

পরদিন মূল উপত্যকা চষে ফেললাম আমরা কুইনটালের দেহের সন্ধানে। সেই শেষ খোঁজা। আগেও খুঁজেছি, সেদিন আবার খুঁজলাম, প্রতিটা ঝোপ তন্নতন্ন করে। পেলাম না কুইনটালকে। ওর ওপর যত ক্ষোভ, যত রাগই থাক না কেন, মনটা সেদিন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। দেশ থেকে এত দূরে বেচারা কোথায় মরে পড়ে আছে, কবর হলো না। ম্যাককয়-এর মনের অবস্থা আরও খারাপ। কুইনটাল ওর বন্ধু ছিল। বাউন্টি ইংল্যান্ড ছাড়ার অনেক আগে থেকেই ওরা বন্ধু। সেই বন্ধুর এই করুণ পরিণতির জন্যে ও নিজেকেই দায়ী ভাবছিল। রাতে আমাকে বললও সে কথা।

'...আমি যদি ওই চোলাইযন্ত্রটা না বানাতাম তাহলে এসব কিছুই হয়তো ঘটত না, আলেক্স। ওটার কারণেই আমার বেশি বেশি টি দরকার হচ্ছিল সেজন্যেই মাথায় ঢুকেছিল জমি ভাগাভাগি করার বুদ্ধি। অন্যদের মাথায়ও আমিই ঢুকিয়েছিলাম বুদ্ধিটা। সেখান থেকেই শুরু খুনোখুনির। এ জন্যে কাউকে যদি দায়ী করতে হয় তো সে আমাকে...।'

এমনি সারারাত বকবক করে গেল ম্যাককয়। একই কথা, একই ঘটনা কতবার যে বলল তার ঠিক নেই। শেষ পর্যন্ত অসহ্য লাগতে লাগল আমার।

'এবার একটু ঘুমানোর চেষ্টা করো, উইল,' রুক্ষকণ্ঠে বলে আমি বেরিয়ে গেলাম বাড়ি ছেড়ে। মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের বাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম তাঁর ধুলো পড়া বিছানায়।

দুপুরবেলা ঘুম ভাঙল আমার। বাইরে তখন ভয়ানক বৃষ্টি। তার মধ্যেই বেরিয়ে আমার শুয়োর এবং মোরগ মুরগিগুলোকে খাবার দিলাম; ব্রাউনের কুয়ায় গিয়ে গোসল করে এলাম। রান্নাঘরে ঢুকে এক টুকরো ইয়াম আর কয়েকটা ডিম সেদ্ধ করে খেলাম। ইতিমধ্যে বৃষ্টি কমেছে। ম্যাককয়-এর জন্যে খানিকটা খাবার নিয়ে গেলাম মিস্টার ইয়ং-এর বাসায়। গিয়ে দেখি ও বোতল নিয়ে বসেছে। আমি যে খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম খেতে বললাম ওকে। ও শান্তভাবে জানাল খাবে না। খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম আমি। হঠাৎ করেই ও খেপে উঠল। চিৎকার করে বলল:

'যাও তো এখান থেকে! জ্বালিও না আমাকে। কাউকে আমার দরকার নেই!'

রেগে উঠলাম আমিও। পাল্টা চিৎকার করলাম; 'ঠিক আছে, যাচ্ছি আমি! ভেবো না তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না!'

ফিরে এলাম মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের বাড়িতে। দু'দিন আর ম্যাককয়-এর কোন খোঁজ খবর নিলাম না। তৃতীয় দিন রাগ ভুলে গেলাম আবার। দেখলাম ঘরের এক কোণে কাদায় মাখামাখি হয়ে কুকুর কুণ্ডলী হয়ে পড়ে আছে ও। মেঝেয় ছড়িয়ে আছে অন্তত আটটা শূন্য মদের বোতল। আমার সাড়া পেয়ে ম্যাককয় সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠল:

'কে? আলেক্স? দরজা বন্ধ করে দাও! জলদি!'

'কী হয়েছে, উইল?' এগিয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আলেক্স!' বলল ও, 'আলেক্স!' আর কিছু ও বলতে পারল না জবাবে।

এমন করুণ দেখাচ্ছিল ওকে! ঠক ঠক করে কাঁপছিল ঠাণ্ডায়।

'কী হয়েছে, উইল?' আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

'ডাঙায় কী করছ?' বলল ও। 'জাহাজে উঠে এসো। পুরনো বন্ধুর মুখ দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না? ...ওকে ঠেকাও! ধরল আমাকে!'

'কাকে ঠেকাব?' অবাক হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

'মিনারী—মিনারীকে! ওই যে দরজার ওখানে দাঁড়িয়ে আছে!'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! মিনারী এখানে আসবে কোত্থেকে? ও ওখানে থাকলে আমি দেখতে পেতাম না? এসো, নিজের চোখে দেখে যাও।'

আস্তে আস্তে উঠে বসে ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে তাকাল ম্যাককয়।

'দেখেছ তো?' আমি বললাম। 'আমরা ছাড়া কেউ নেই এখানে।'

'ও চলে গেছে,' দুর্বল কাঁপা কাঁপা গলায় বলল ও। 'তোমাকে দেখে পালিয়েছে ভয়ে।'

'কেউ পালায়নি, উইল, এখানে কেউ আসেওনি। ওসব তোমার কল্পনা।'

আমার কথা বুঝল কিনা জানি না, আবার আগের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল ম্যাককয়। বুঝতে অসুবিধা হলো না, মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে ও। ওকে এ অবস্থায় রেখে চলে যেতে পারলাম না আমি। রাতটা রইলাম ম্যাককয়ের কাছে। কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না এক বিন্দু। সারারাত ওর প্রলাপ, আতঙ্কিত চিৎকার আর ফিসফিসে কণ্ঠস্বর শুনলাম। ভোরের দিকে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে এল ওর গলা। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়। সারারাতের ধকলের পর এই প্রথম একটু স্বস্তি। আমিও কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে গেলাম।

দুপুরের দিকে ম্যাককয়-এর ভয়ঙ্কর এক চিৎকারে ঘুম ভাঙল আমার। চমকে উঠে বসে দেখি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ও বাচ্চা ছেলের মত লাফাতে লাফাতে। তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে আমিও ছুটলাম পেছন পেছন। কিন্তু ধরতে পারলাম না ওকে। রাতে এবং সকালেও বৃষ্টি হয়েছে। ফলে পথ পিছল হয়ে আছে ভয়ানক। একটু দ্রুত ছোটার চেষ্টা করতেই আছাড় খেলাম। নিরুপায় হয়ে পেছন থেকে ডাকলাম:

'উইল, শোনো! কোথায় যাচ্ছ!'

সাড়া দেয়া বা দাঁড়ানো দূরে থাক আমার দিকে ফিরেও তাকাল না ম্যাককয়। মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল ওপাশের পাহাড় চূড়ার দিকে। চূড়ার ওপাশটা খাড়া নেমে গেছে সাগর পর্যন্ত। মাটি থেকে উঠে আবার আমি ছুটলাম। কিন্তু চূড়ায় পৌঁছানোর আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল ম্যাককয়। ও লাফ দিয়েছিল না পড়ে গেছিল জানি না। আমি পৌঁছে নিচে বিক্ষুব্ধ সাগর ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না।

আঠারো

পরদিন বিকেলে আমি ওর লাশ খুঁজে পেলাম। মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ির পশ্চিমের ছোট্ট উপত্যকার মুখে ভেসে গিয়েছিল। পাথর আর সাগরের তাণ্ডবে এমন ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল যে দেখে বোঝাই যাচ্ছিল না ওটা কোন মানুষের দেহ। লাশটা তুলে আনার সময় আমার মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল আপনি আন্দাজ করতে পারছেন আশা করি। তবু আমি এনেছি ওটা এবং কবর দিয়েছি।

তারপর, স্যার, সোজা চলে গেলাম যেখানে মদের বোতলগুলো লুকিয়ে রেখেছিলাম সেখানে। জায়গাটা ম্যাককয়-এর পুরনো বাড়ির সাগরমুখী অংশের এক পাথুরে কন্দর। একটা একটা করে সবগুলো ভরা বোতল তুলে নিয়ে ভাঙলাম আমি পাথরে আছাড় মেরে মেরে। তারপর গেলাম পাতনযন্ত্রটা যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সেখানে। কুণ্ডলী পাকানো তামার নলটা খুলে নিয়ে এলাম ম্যাককয় যেখান থেকে লাফিয়ে পড়েছিল সেই চূড়ায়। নলটা ছুঁড়ে দিলাম সাগরে।

সারাদিন ম্যাককয়-এর মৃতদেহ খুঁজে এবং তার জন্যে কবর খুঁড়ে ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল টানা এক সপ্তাহ ঘুমাতে পারব। কবর যেখানে খুঁড়েছিলাম তার সবচেয়ে কাছে যে বাড়ি দেখলাম সেটা ইন্ডিয়ানদেরটা। ওটায় ঢুকেই শুয়ে পড়লাম আমি। কিন্তু ঘুম এল না। সম্ভবত ওই বাড়িতে ঢুকেছিলাম বলেই আসেনি। কত স্মৃতি যে ভেসে উঠছিল মনের পর্দায়! প্রত্যেকটার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ইন্ডিয়ানদের কেউ না কেউ, বিশেষ করে মিনারী আর তেতাহিতি। ওদের দু'জনের মত ভাল লোক আমি কমই দেখেছি জীবনে। এখানে আমার নিজের জাতের মানুষদের চেয়ে ওদের সঙ্গই আমার বেশি পছন্দ হত। একটা কথা ভেবে আমি এখনও অবাক হই, আমাদের সবাইকে খুন করার কথা ভাবল কেন ওরা। হয়তো ভেবেছিল আমাদের এক জনকেও যদি খুন করে ওদের আর বন্ধু হিসেবে নিতে পারবে না বাকিরা।

বেশিক্ষণ স্মৃতির মিছিল বিরক্ত করতে পারল না। ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। উঠলাম পরদিন সকালে বেশ বেলা করে। প্রথমেই মনে হলো বসতিতে জীবিত মানুষ এখন আমি একা। কথাটা মনে হতেই গা শিউরানো একটা অনুভূতি হলো। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে ছুটলাম মদের বোতলগুলো যেখানে লুকানো ছিল সে জায়গায়।

মনে তখন একটাই চিন্তা, ভুলেও যদি একটা বোতল বেঁচে গিয়ে থাকে আগের দিন। নিঃসঙ্গতার অনুভূতি ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করছিল আমাকে। কিন্তু সেখানে গিয়ে ছড়িয়ে থাকা ভাঙা কাচে সূর্যের ঝলক ছাড়া আর কিছু দেখলাম না। বিষণ্ন মনে ফিরে এলাম বসতিতে। একবার মনে হলো ম্যাককয়-এর মত নিজেই তৈরি করব মদ। তারপরই মনে পড়ল নলের কুণ্ডলীটা সাগরে ফেলে দিয়েছি আমি নিজেই। অগত্যা নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা ভোলবার জন্যে কাজে ডুবে পড়লাম।

আমি একা মানুষ, আর সমস্যা কেবল খাবারের। ফলে করার মত খুব বেশি কাজ পেলাম না। কয়েক দিন যেতে না যেতেই আবার একঘেয়ে হয়ে উঠল জীবন। শেষে বসতির বাড়িগুলো গোছগাছ, ঝাড়ামোছা করতে লাগলাম। এসব করে দিনটা কোন মতে কেটে গেলেও রাত কিছুতেই কাটতে চায় না। শুয়ে থাকি, ঘুম আসে না। পরপর কত রাত যে নির্ঘুম কাটিয়েছি আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। আউতে উপত্যকা–মানে মেয়েদের দুর্গের ধারে কাছেও যেতাম না। না, ভয়ে নয়। অভিমানে বলতে পারেন। নিশ্চয়ই ওরা টের পেয়েছে আমি একাই বেঁচে আছি–মিস্টার ইয়ং তো ওদের সাথেই থাকে তার পরও ওরা একবার খোঁজ নেয়নি আমার–তাহলে আমি কেন যাব আগ বাড়িয়ে? একদিন মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের টেবিল গোছানোর সময় চোখ পড়ল বাউন্টির রুপোয় বাঁধানো পুরনো বাইবেলটার ওপর। বইটা তুলে নিয়ে খুললাম। কিন্তু কালো কালো অক্ষরগুলো কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না মস্তিষ্কে। ছেলেবেলায় কয়েক বছর স্কুলে গিয়েছিলাম। চেষ্টা করে একটু আধটু পড়তে পারতাম। কিন্তু দীর্ঘদিন চর্চা না থাকায় সে ক্ষমতা পুরোই বেরিয়ে গিয়েছিল মাথা থেকে।

ম্যাককয়কে কবর দেয়ার প্রায় এক মাস পর একদিন আমার বাড়ির পাশের ছোট্ট বাগানটায় নিড়ানি দিচ্ছিলাম। হঠাৎ পেছনের ঝোপে একটা সরসর আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। আমার মেয়েমানুষ বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে।

হাতের কাজ ফেলে বাগানের প্রান্তে এসে বসলাম আমি। একটা কথাও বললাম না কেউ। ও আমার কাছে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে। মাথা রাখল আমার কাঁধে। তারপর নীরবে কাঁদতে লাগল। ওর চোখের পানি ভিজিয়ে নরম করে দিল আমার মন। আমারও বুক ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে কান্না। তবু অনেক কষ্টে মুখে নির্লিপ্ত ভাব ফুটিয়ে বসে রইলাম সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে। কিছুক্ষণ পর, যখন মনে হলো নিজেকে আমি সামলাতে পেরেছি, আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম:

'তোমার মাস্কেট কই, বলহাদি? ওটা ছাড়া আমার কাছে আসতে ভয় করল না? আমার মনে কোন বদ মতলব তো থাকতে পারে।'

ও কিছু বলল না, শুধু আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল আমাকে। এবার আর আমার আবেগ বাঁধ মানল না। ওর হাত আঁকড়ে ধরলাম। তারপর দু'জনেরই মুখে খই ফুটতে লাগল যেন। কত কথা যে আমরা বললাম সেই পুরনো দিনের মত। ম্যাককয় সম্পর্কে বললাম ওকে। শুনে কেঁদে ফেলল বলহাদি। যখন বললাম পাতনযন্ত্রটা আর মদের বোতলগুলো আমি নষ্ট করে ফেলেছি তখন আরও বেশি কাঁদল। এবারের কান্না খুশির। মিস্টার ইয়ং আমার কাছে আসে না বলে দুঃখ

প্রকাশ করলাম। বলহাদি বলল, সেটা মিস্টার ইয়ং-এর দোষ না। সে এমন অসুস্থ যে সারাক্ষণ তাকে বিছানায় শুয়ে কাটাতে হয়।

'ওকে একবার দেখতে পেলে হত,' আমি বললাম।

'তাহলে চলো, আলেক্স,' আমার হাত ধরে বলল বলহাদি। 'এমন একটা দিন যায় না যেদিন ও তোমার কথা বলে না। আজ তোমার কাছে যা শুনলাম তাতে আমাদের মেয়েদের চেয়ে ও অনেক বেশি খুশি হবে। দেখো সবাই কেমন আন্তরিকতার সাথে তোমাকে স্বাগত জানায়। আর মাইমিতি যে কী খুশি হবে তোমার এই পরিবর্তন দেখে!'

ওর সাথে রওনা হলাম আমি। কিন্তু দশ গজ যাওয়ার আগেই দাঁড়িয়ে পড়লাম আবার।

'না, বলহাদি, বললাম। 'আমি এখানেই থাকি। তুমি গিয়ে মাইমিতি আর সবাইকে বলো কেমন দেখে গেলে আমাকে। তারপর ওরা ইচ্ছে হলে আসবে এখানে। আমাকে ওখানে যেতে মানা করেছিল মাইমিতি, আমি যাব না।'

আমাকে একটুও পীড়াপীড়ি করল না বলহাদি। একা রওনা হয়ে গেল সে আউতে উপত্যকার দিকে। তিন ঘণ্টা যেতে না যেতেই সব ক'টা মেয়ে তাদের বাচ্চাদের নিয়ে হাজির হলো বসতিতে। সবার সামনে মাইমিতি, তার পেছনেই মোয়েটুয়া নেড ইয়ংকে পিঠে করে। এমন অনায়াস ভঙ্গিতে আসছে মোয়েটুয়া, মনে হল ও পিঠে করে আনছে একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষকে নয় বাচ্চাকে! বাচ্চাদের অনেককে আমি চিনতে পারলাম না। আগে কখনও দেখিনি এমন কয়েকটা বাচ্চাও দেখলাম। ওদের ভেতর সবচেয়ে বড় অর্থাৎ থার্সডে অক্টোবর তখন আট বছরের, ওর ভাই চার্লস ছ'বছরের আর ছোট্ট মেরি ক্রিশ্চিয়ান পাঁচ বছরের। গুনে দেখলাম বাচ্চার সংখ্যা মোট আঠারো, তার দুটো আমার। বলতে লজ্জা হচ্ছে, দুটোর একটারও জন্ম বলহাদির গর্ভে না। সুন্দর স্বাস্থ্যবান বাচ্চাগুলোকে দেখে এত ভাল লাগল আমার যে গত চার পাঁচ বছরের দুঃখ এক মুহূর্তে ভুলে গেলাম।

মেয়েরা সবাই একে একে এগিয়ে এসে আমাকে অভিনন্দন জানাল। অতীতের কোন কথা কেউ উচ্চারণ করল না। সবচেয়ে যেটা ভাল লাগল, আমার বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ বা ক্ষোভ আর নেই। সবার বয়স বেড়েছে। সেই সাথে বেড়েছে পরিপক্কতা। প্রুডেন্স আর হুটিয়ার মত চটুল স্বভাবের মেয়েদের মধ্যেও বেশ একটা গাম্ভীর্য এবং ভারিক্কী ভাব এসেছে।

সাধারণ ভদ্রতাসূচক কিছু আলাপের পর আমি মেয়েদেরকে বললাম, ওরা যদি আবার বসতিতে ফিরে আসে আমি খুব খুশি হব। ওরা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলো। এবং সেদিন থেকেই জিনিসপত্র সব আনতে শুরু করল দুর্গ থেকে।

পুরনো দিনের মত কয়েকটা গৃহস্থালীতে নিজেদের ভাগ করলাম আমরা। ঠিক হলো মিসেস ক্রিশ্চিয়ান তার ছেলেমেয়ে আর সারাহ আর মেরিকে নিয়ে আমার আর মিস্টার ইয়ং-এর আগের বাড়িতে থাকবে। মোয়েটুয়া, নানাই, সুজানাহ আর জেনি থাকবে মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের বাড়িতে। মিস্টার ইয়ং টাউরুয়া, প্রুডেন্স আর তাদের বাচ্চাদের নিয়ে থাকবে মিলস আর মার্টিন আগে যে বাড়িতে থাকত সেটায়। বলহাদি, হুটিয়া আর আমি, ঠিক হলো, থাকব ইন্ডিয়ানদের বাড়িটায়।

কয়েক দিনের মধ্যেই সব জিনিসপত্র নিয়ে আসা হলো আউতে উপত্যকা থেকে। বসতির বাড়িগুলো আবার ভরে উঠল নারী-শিশুদের কলগুঞ্জনে। যে মিস্টার ইয়ং হাসতে ভুলে গিয়েছিল সে আবার প্রশান্তি খুঁজে পেল মনে। আগের সেই নিরাশ চাউনি দূর হয়ে গেল তার চোখ থেকে। ধীরে হলেও তার সুস্থতা ফিরে আসতে লাগল।

থার্সডে অক্টোবরের মত ছেলের বাবা হতে পারলে যে কোন মানুষই গর্বিত বোধ করবে। এমন কর্মঠ, এমন ভাল, এমন সুন্দর ছেলে আমি আর দেখিনি। বাবা-মা দু'জনেরই স্বভাব ভাগাভাগি করে পেয়েছে সে। ওর পরেই সারাহ ম্যাককয়, ওর চেয়ে কয়েক মাসের ছোট। তারপর সারাহর ভাই সাত বছরের ড্যান। সবশেষে প্রায় এক বয়সী ম্যাট কুইনটাল। আর মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের ছোট ছেলে চার্লস। এই পাঁচজন ছায়ার মত সবসময় ঘুরত আমার পেছন পেছন। দুনিয়ায় কত কিছু যে শিখবার বা শেখাবার আছে তা টের পেলাম এই সময় ওদের শেখাতে বা কৌতূহলের জবাব দিতে গিয়ে।

ক্রিশ্চিয়ানের শেষ আদেশটা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি। অতীতে যে বিয়োগান্তক ঘটনা এখানে ঘটেছিল তা জানাইনি বাচ্চাদের এবং আমরা সবাই একমত যে, জানাবও না।

এক সকালে ওই পাঁচজনকে নিয়ে আমি বেরিয়েছি দ্বীপের পশ্চিমাংশটা ভাল করে ওদের দেখানোর জন্যে। জায়গাটা তো আজ আপনি দেখেছেন, স্যার। পাঁথুরে টিলা আর গিরিখাত ছাড়া প্রায় কিছু নেই ওখানে। গোট-হাউস পাহাড়ের দক্ষিণের শৈলশ্রেণীতে উঠে আমি ছোট্ট সারাহ ম্যাককয়কে নিয়ে একটু বসলাম মিশ্রাম নেয়ার জন্যে। ছেলেরা নতুন জায়গায় আসার আনন্দে লাফাতে লাফাতে নেমে গেল পশ্চিমের পাহাড়ী উপত্যকার দিকে। জায়গাটা পাহাড়ী হলেও বিপদের কোন ভয় নেই। তাই আমি ওদের বাধা দিলাম না। কিছুক্ষণ বসে আমি আর সারাহও এগোলাম ওদের পেছন পেছন। কিন্তু ততক্ষণে চোখের আড়াল হয়ে গেছে ওরা। একেকজন ছড়িয়ে পড়েছে একেক দিকে। দ্বীপে উঠেই যেসব মোরগ-মুরগি আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম তাদের অনেকগুলো ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে এ জায়গায়। এবং গত কয়েক বছরে অবাধে বংশ বিস্তার করেছে। ঝোপে বা গর্তে খুঁজলেই ওদের ডিম পাওয়া যায়। আমার ধারণা হলো ছেলেরা নিশ্চয়ই ডিম খুঁজতে গেছে। হাতের ঝুড়ি ভর্তি হয়ে গেলেই সব একে একে ফিরে আসবে। এই ভেবে ঢাল বেয়ে কিছু দূর নামার পর আর এগোলাম না আমি। আবার একটা পাথরের ওপর বসলাম সারাহকে নিয়ে।

খুব বেশিক্ষণ বসতে হলো না। থার্সডে অক্টোবর, চার্লস আর ড্যান ফিরে এল ঝুড়ি ভর্তি ডিম আর শেলফিশ নিয়ে। কিন্তু ম্যাট কুইনটালের খবর নেই। আধ ঘণ্টা মত অপেক্ষা করার পর দুশ্চিন্তা হতে লাগল আমার। সারাহ আর ফিরে আসা তিন ছেলেকে বসতে বলে আমি রওনা হলাম ওকে খুঁজতে।

সিকি মাইল মত নামার পর ম্যাটকে দেখতে পেলাম আমি। ঝোপ ঝাড়ের পাশ কাটিয়ে যত দ্রুত সম্ভব উঠে আসছে ও চড়াই বেয়ে। ওর ছোটার ভঙ্গি দেখে প্রথমে

মনে হলো কোন মোরগ তাড়া করছে বোধহয়। কিন্তু যখন আমি ডাকলাম নাম ধরে ও সোজা এগিয়ে এল আমার কাছে। এমন আতঙ্কিত অবস্থা বেচারীর যে ঠিক মত কথা বলতে পারছে না। ওকে কোলে তুলে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বুকে জড়িয়ে ধরে রইলাম আমি। তারপর নিজে বসে ওকে আমার হাঁটুর ওপর বসিয়ে ঠাট্টার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলাম:

'কী হয়েছে ম্যাট? তোমার ছায়া দেখে ভয় পেয়ে ছুটছিলে?'

ও আবার শক্ত করে আঁকড়ে ধরল আমাকে। মুখ লুকাল বুকে। অনেকক্ষণ আস্তে আস্তে, নরম করে কথা বলে ওকে আশ্বস্ত করলাম আমি। তারপর ও যা বলল তার মর্মার্থ, ও একটা ভারুয়া ইনো দেখেছে। অশুভ আত্মাকে ইন্ডিয়ানরা বলে ভারুয়া ইনো। আমি একটু অবাক হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন দেখতে ভারুয়া ইনোটা।

ভয়ে রীতিমত কাঁপছিল ছেলেটা, কথা বলবে কী! যা হোক অবশেষে ওকে দিয়ে বলাতে পারলাম জিনিসটা কেমন দেখতে।

'বিরাট একটা মানুষের মত,' বলল ও। 'পাথরের ওপর বসে ছিল।'

'তোমাকে দেখেছে?' আমি জানতে চাইলাম।

'না; আমার দিকে পিঠ দিয়ে বসে ছিল।'

'তুমি কী দেখেছ, বলছি শোনো,' ওর ভয় ভাঙিয়ে দেয়ার জন্যে আমি বললাম। 'তুমি যেখানে গিয়েছিলে ওখানে অনেকগুলো পাথরের মূর্তি আছে। অনেক অনেকদিন আগে এখানে যারা বাস করত তারা বানিয়েছিল ওগুলো। দেখতে বিচ্ছিরি, আর বড় একজন মানুষের চেয়েও বড়। ওগুলোরই একটা দেখেছ তুমি। মানুষের আদলে তৈরি হলেও আসলে ওগুলো মানুষ না, পাথর। ও দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

'আমি ওটাকে নড়তে দেখেছি,' বলল ম্যাট।

'উঁহু। তুমি দেখেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলে; তাই তোমার মনে হয়েছে ওটা নড়ছে বা...'

'না, না! আমি দেখেছি, ওটা নড়ছিল!' জবাব দিল ও। তারপর যতই আমি ওকে বোঝাতে চাইলাম ও ভুল দেখেছে ততই ও ওই এক কথা বলতে লাগল। শেষে ওকে আমি কোলে করে ফিরে এলাম অন্য বাচ্চাদের যেখানে রেখে গিয়েছিলাম সেখানে। ওরা ম্যাটের কথা শোনামাত্র বিশ্বাস করে ফেলল। তবে আমি কাছে থাকায় ম্যাটের মত ভয় পেল না। তখন আমি বললাম:

'সত্যিই যদি ওখানে কোন ভারুয়া ইনো থাকে আমাকে দেখলেই সে ভয়ে উড়ে পালাবে ওই চূড়ার ওপর দিয়ে, আর কোন দিন আসবে না এখানে।'

আশ্বস্ত হলো বাচ্চারা। মাত্র কয়েক সপ্তাহেই ওদের মনে এমন একটা ধারণা হয়েছে (এ ধারণাটা দিয়েছে মূলত ওদের মা-রা) যে, বাবা আলেক্স ইচ্ছে করলে যেকোন অসাধ্য সাধন করতে পারে; এমন কি ভারুয়া ইনোরাও ভয় পায় তাকে। সুতরাং এখন আমাকে যা করতে হবে তা হলো বাচ্চাদের এখানে রেখে কিছুক্ষণের জন্যে ওদের চোখের আড়ালে গিয়ে ফিরে এসে বলতে হবে আত্মাটা চলে গেছে। তা-ই করলাম। ওদের বসিয়ে রেখে আমি একা রওনা হয়ে গেলাম ম্যাট যেদিক

থেকে ছুটে আসছিল সেদিকে।

কিছুদূর যাওয়ার পরই ভুরু কুঁচকে উঠল আমার। সরু একটা পাহাড়ী ঝরনার কাছে ভেজা মাটিতে একটা পায়ের ছাপ! ভুরু কুঁচকে ওঠার কারণ ছাপটা আমার পায়ের সমান। যদ্দূর মনে পড়ে সেই ভয়ানক ঘটনার পর আমরা যারা বেঁচে ছিলাম তাদের কেউ এখানে আসিনি। অথচ ছাপটা, মনে হলো, দু'এক দিনের মধ্যেই পড়েছে। তাহলে কার ছাপ ওটা?

ঝরনাটা পেরিয়ে এগিয়ে গেলাম। গজ পঞ্চাশেক দূরে এক শুকনো গিরিখাত। তার এক ধারে বিরাট একটা পাথর মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। পাথরটার এক অংশ প্রলম্বিত হয়ে ছাদ মত তৈরি করেছে গিরিখাতের ওপর। ঘন ঝোপ বেড়ে উঠেছে তার চারপাশে। ওই ছাদের নিচে অতীত দিনে বহুবার বৃষ্টির সময় আশ্রয় নিয়েছি আমি। নিঃশব্দে ছাদটার কাছে গিয়ে ঝোপ সরাতেই চমকে উঠলাম আমি। ম্যাট কুইনটাল—হ্যাঁ বড় ম্যাট কুইনটাল বসে আছে আমার দিকে পেছন ফিরে; একটু আগে ওর ছেলে যেমন দেখে গেছে ঠিক তেমন।

নাবিকদের ট্রাউজার ছাড়া আর কিছু নেই ওর পরনে। মেয়েরা যেদিন ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল সেদিন ওটাই পরে ছিল কুইন্টাল। যেখানে বসে আছে তার পাশে একটা শুকনো ঘাস আর ফার্নের বিছানা। ইন্ডিয়ান ঢং-এ হাঁটু মুড়ে গুটিসুটি বসে আছে ও। কাছেই পড়ে আছে অসংখ্য ডিমের খোসা। এক দিকে একটা বুনো শুয়োরের ভুক্তাবশেষ। তার হাড়গুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারপাশে। কবে যে শুয়োরটা মারা হয়েছে কে জানে। পচে এমন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে যে কুকুরও তা শুঁকে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

মাথায় স্বাভাবিক বুদ্ধি অক্ষুণ্ন থাকলে আমি নিঃশব্দে সরে আসতাম। কিন্তু তা না করে আমি দম বন্ধ করে এগিয়ে গেলাম কয়েক পা। আস্তে ডাকলাম, 'ম্যাট!'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল ও। অমনি শীতল এক অনুভূতি ওঠা নামা করতে শুরু করল আমার পিঠ বেয়ে। যে চাউনি দেখলাম ওর চোখে পাগলাগারদের বাইরে তা কখনও দেখা যায় না। আগেই ওর মুখ ভর্তি দাড়ি ছিল, এখন তা কোমর পর্যন্ত লম্বা হয়েছে আর ছড়িয়েছে বুকের দু'পাশ পর্যন্ত। বেশ চেষ্টা করে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ফুটিয়ে তুলে আমি বললাম:

'ম্যাট, কোথায় লুকিয়ে ছিলে এতদিন? ঈশ্বরের কসম, আমরা মনে করেছিলাম তুমি মারা গেছ!'

কথাটা আমি ভাল করে শেষও করতে পারিনি, ও ছোঁ মেরে পাশে পড়ে থাকা একটা লাঠি তুলে নিয়ে ভয়ঙ্কর এক গর্জন করে তেড়ে এল আমার দিকে। প্রাণ ভয়ে পেছন ফিরেই ছুটতে শুরু করলাম আমি পাথরের পর পাথর টপকে। কিছুদূর গিয়েই লতাজাতীয় কিছুতে পা বেধে পড়ে গেলাম আমি। পড়েই ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম ম্যাট আমার পেছনে এসে গেছে মনে করে। পরম স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করলাম, না, ত্রিশ চল্লিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে ও। মোটা লাঠিটা ধরা এক হাতে। বিভ্রান্ত চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, যেন বুঝতে পারছে না সত্যিই আমাকে দেখছে কিনা। কিছুক্ষণ অমনি দাঁড়িয়ে থেকে ও ঘুরে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে গিয়ে ঢুকল আস্তানায়।

উঠে দ্রুত আমি ফিরে এলাম বাচ্চাদের কাছে। আমাকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সব ক'জন। কুইনটালের গর্জন ওদের কানে পৌঁছেছিল। সেই থেকে ভয়ে অস্থির হয়ে ছিল তারা। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম ওরা গর্জনটাই কেবল শুনেছে কুইনটালকে তাড়া করতে বা আমাকে পালাতে দেখেনি। তখন আমি বুদ্ধি করে বললাম, অশুভ আত্মাকে ভয় দেখানোর জন্যে আমি গর্জনটা করেছি।

'তুমি দেখেছ ওকে?' ড্যান ম্যাককয় জিজ্ঞেস করল।

'না,' আমি বললাম। 'তবে না দেখলেও এমন ভয় বদমাশটাকে পাইয়ে দিয়েছি, জীবনে আর কখনও এমুখো হবে না। তোমরা কিন্তু এখানে আর আসবে না। ওই দিকে ওই গিরিখাতে মস্ত এক বুনো শুয়োর দেখেছি। ওটাকে আগে মারতে হবে তারপর ইচ্ছে হলে তোমরা এসো আমি মানা করব না।'

বসতিতে ফিরে মিস্টার ইয়ংকে বললাম যা দেখেছি। মাত্র একভাবেই আমরা ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করতে পারলাম: কুইনটালের মাথা এমনই খারাপ হয়েছে যে সে বেমালুম ভুলে গেছে দ্বীপে ও ছাড়া কেউ আছে। মূল উপত্যকার দিকে ও কখনও আসে না। এলে আমরা দেখতাম।

'এতদিন ও এদিকে আসেনি,' বলল মিস্টার ইয়ং, 'কিন্তু যখন তোমাকে একবার দেখেছে তখন সামনে কী করবে কে জানে?' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'সব ঝামেলা থেকে মুক্তি পেয়েছি, ভাবতে না ভাবতেই আরেকটা লাফিয়ে উঠল। সত্যিই এ এক অভিশপ্ত জায়গা।'

আমি নিজেও দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম কী করলে সবচেয়ে ভাল হবে বুঝতে না পেরে। তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছিলাম—আমি ইয়ং দু'জনেই—যে মেয়েদেরকে জানাতে হবে। অতএব ডাকা হলো সবাইকে। আমি সবিস্তারে বর্ণনা করলাম, যা দেখেছি। শুনে প্রত্যেকেই আতঙ্কিত হয়ে উঠল; বিশেষ করে সারাহ, কুইনটালের স্ত্রী। জেনি পরামর্শ দিল ওকে গুলি করে মেরে ফেলার। প্রুডেন্স আর হুটিয়া সমর্থন করল ওকে। মিসেস ক্রিশ্চিয়ান আর বাকিরা এর বিরুদ্ধে মত দিল।

'পাগল একটা মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করব, বলছ কী, জেনি?' আমি বললাম।

'তাহলে আর কী, ছেড়ে দাও ওকে তারপর এসে চড়াও হোক আমাদের ওপর, বাচ্চাদের ওপর!' বলল জেনি। 'আমি বলে রাখছি দেখো, আজ হোক কাল হোক ও তা করবে। তখন তুমি নিজেই আমি যা বললাম তা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে।'

জেনির আশঙ্কা যে এত তাড়াতাড়ি সত্যি হবে আমরা ভাবিনি। দু'দিন পর সবাই বসতিতে যার যার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ির বেড়া মেরামত করছিল জেনি, সুজানাহ্ আর মোয়েটুয়া। আমি সাহায্য করছিলাম ওদের। হঠাৎ শুনলাম গুলির শব্দ। মিস্টার ইয়ং-এর পুরনো বাড়ি অর্থাৎ এখন যেখানে মিসেস ক্রিশ্চিয়ান থাকে সেদিক থেকে এল শব্দটা। হাতের কাজ ফেলে ছুটলাম আমি গিয়ে দেখি বাচ্চা সারাহ ম্যাককয় ঠকঠক করে কাঁপছে মাকে জড়িয়ে ধরে। পাশে মাস্কেট হাতে দাঁড়ানো মিসেস ক্রিশ্চিয়ান। ঘটনা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। সারাহ ম্যাককয় ব্রাউনের কুয়ায় গিয়েছিল পানি আনতে একই সময় ম্যাট

কুইনটালও পৌঁছেছে ব্রাউনের কুয়ায়। বাচ্চা সারাহকে দেখেই ধরার জন্যে তাড়া করে সে। সারাহ আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করতে করতে দৌড়াতে থাকে বসতির দিকে। ইতিমধ্যে সারাহর চিৎকার শুনতে পেয়েছে মাইমিতি। কুইনটাল-আতঙ্কে প্রত্যেক বাড়িতেই দুটো তিনটে মাস্কেট গুলি ভরে তৈরি রাখা হয়েছিল। মাইমিতির বাড়িতে যেগুলো ছিল তার একটা তুলে নিয়ে সে ছুটে যায় সারাহর চিৎকার লক্ষ্য করে। কিছুদূর গিয়ে দেখতে পায় দৃশ্যটা–সারাহ ছুটছে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে, পেছন পেছন আসছে কুইনটাল; প্রায় ধরে ফেলেছে সারাহকে। এক মুহূর্ত দেরি না করে কুইনটালের মাথার সামান্য ওপর দিয়ে গুলি ছোঁড়ে মাইমিতি। গুলির শব্দে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কুইনটাল। তারপর দৌড়ে বনে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আবার স্বস্তি দূর হয়ে গেল সবার মন থেকে। মেয়েরা আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন বাড়িতে থাকার সাহস পেল না। অর্ধেক তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে উঠে গেল মিস্টার ইয়ং-এর বাড়িতে; বাকি অর্ধেক আমার বাড়িতে। মিস্টার ইয়ং তখন একটু সুস্থ হলেও এমন সুস্থ নয় যে গ্রাম ছেড়ে বেরোতে পারবে। তবে আমি সেই বিকেলেই মাস্কেট কাঁধে বেরোলাম কুইনটালের খোঁজে। সবগুলো উপত্যকায় খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না ওকে। উঠলাম দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টায়। সঙ্গে স্পাই গ্লাস নিয়ে বেরিয়েছিলাম। সেটা চোখে লাগিয়ে পর্যবেক্ষণ করলাম পুরো দ্বীপ। দেখলাম না ওকে। হতাশ মনে পশ্চিম দিকে তাকাতেই লক্ষ্য করলাম পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে সৈকতের দিকে যাচ্ছে কুইনটাল। ভারি একটা বোঝা যেন নেমে গেল আমার বুক থেকে। অবশেষে আবার নিজের আস্তানায় ফিরে গেছে ও। বাড়ি ফিরে মেয়েদেরকে জানাতে ওরাও স্বস্তি পেল আমার মত। তবে পরিপূর্ণ স্বস্তি এল না কারও মনে। সবাই জানে যে কোন সময় আবার বসতিতে আসার খেয়াল চাপতে পারে ওর মনে।

রোজ আমি মাস্কেট আর দূরবীন হাতে পাহাড়ে উঠে নজর রাখতে লাগলাম কুইনটালের আস্তানার দিকে। একদিন দেখলাম একটা মরা বুনো শুয়োর ঘাড়ে করে সে যাচ্ছে। ওই কাঁচা মাংস ও খাচ্ছে ভাবতেই আমার গা রি রি করে উঠল। আরেক দিন ওকে দেখলাম সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় বসে আছে একটা পাথরের ওপর। দূরবীন দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম ওর মুখ। হাত নেড়ে, নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে নিজের সঙ্গে কথা বলছিল।

এই রকম মোটামুটি প্রত্যেক দিনই ওকে দেখলাম দ্বীপের পশ্চিম উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায়। একদিন সারাদিন অপেক্ষা করেও ওর ছায়াটাও দেখলাম না। সূর্যাস্তের সামান্য আগে ফিরে আসার কথা ভাবছি চিন্তিত মনে। এই সময় দেখলাম হুটিয়া আর প্রুডেন্স ছুটতে ছুটতে আসছে আমি যেখানে আছি সেদিকে। আমাকে দেখেই ওরা হাতের ইশারায় ডাকল জরুরী ভঙ্গিতে। কাছে পৌঁছুতে বেশিক্ষণ লাগল না আমার।

যা শুনলাম তাতে দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল। কুইনটালের মেয়েমানুষ সারাহ আর মেরি ম্যাককয় বাড়ির কাছে কাজ করছিল। হঠাৎ বন থেকে বেরিয়ে ওদের তাড়া করে কুইনটাল। ঘটনাটা বলেছে মেরি। মেরির পাশ কাটিয়ে গিয়ে প্রথমে

সারাহকে ধরার চেষ্টা করে কুইনটাল। বেচারা সারাহ এমন আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল যে বাড়ির দিকে না গিয়ে উল্টো দিকে ছুটতে শুরু করে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে। তার পরেই টের পায় ফাঁদে পড়ে গেছে সে। উপত্যকার দিকে না গিয়ে চলে এসেছে দ্বীপের পুব দিকে যেখানে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে কয়েকশো ফুট। সেই পাহাড়ের ওপাশটা খাড়া নেমে গেছে নিচে বাউন্টি বে পর্যন্ত। কুইনটালের তাড়া খেয়ে পাহাড়টার চূড়ায় উঠে যায় সারাহ। কুইনটাল পেছনে খুব কাছেই ছিল। চূড়ায় উঠে সারাহ দেখে হয় কুইনটালের হাতে ধরা পড়তে হবে নইলে লাফ দিতে হবে নিচে। ও ধরা পড়ার চেয়ে লাফ দেয়াই বেশি পছন্দ করেছে।

হুটিয়া আর প্রুডেন্সের কাছে ঘটনাটা শুনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম আমি বসতির দিকে। আমার বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম সব ক'জন মেয়ে আর বাচ্চাকে সেখানে জড় করেছে মিস্টার ইয়ং। তিনটে মেয়ে, মাস্কেট হাতে গেছে সারাহর দেহের সন্ধানে। কুইনটাল কোন দিকে গেছে কেউ বলতে পারল না। সারাহ ছাড়া একমাত্র মেরিই দেখেছিল ওকে। ও সারাহর দিকে ছুটতেই মেরি দৌড়ে চলে এসেছে ঘরে, আর কিছু দেখার জন্যে অপেক্ষা করেনি। আবার ছুটলাম আমি খাঁড়ির দিকে। আধাআধি পথ যাওয়ার পর দেখা হলো মেয়েদের সাথে। মোয়েটুয়ার হাতে সারাহ। তখনও শ্বাস প্রশ্বাস চলছে। তবে বাড়ি নিতে নিতে মারা গেল সে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মেয়েরা সারাহর দেহটা বিছানায় নামিয়ে রেখে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। কয়েকজন তার পাশে বসে বিলাপ করে কাঁদতে লাগল, বাড়ির কেউ মারা গেলে ইন্ডিয়ানরা যেমন কাঁদে। মিস্টার ইয়ং আর আমি শান্ত করার চেষ্টা কললাম ওদের। কিন্তু কেঁদেই চলল ওরা। বাচ্চারাও যোগ দিল মা-দের সাথে। একমাত্র মিসেস ক্রিশ্চিয়ান আর টাউরুয়াকেই দেখলাম শান্ত।

সারাহর দেহ তুলে আনার আধ ঘণ্টা পর হঠাৎ সবার খেয়াল হলো সুজানাহ নেই। মাইমিতিই প্রথম লক্ষ করল ব্যাপারটা এবং বলল সবাইকে। প্রথমে তো আমি বিশ্বাসই করতে পারলাম না। কারণ সারাহর দেহ আনায় মেয়েদের সাহায্য করতে যাওয়ার আগেও আমি সুজানাহকে দেখে গেছি অন্যদের সাথে। বিকেলে যা ঘটে গেছে তারপর ও একা কাউকে কিছু না বলে কোথাও যাবে, মনে হয় না। একটু পরেই এক বাচ্চা বলল, সে ওকে রান্নাঘরে যেতে দেখেছিল। রান্নাঘরটা বাড়ি থেকে বিশ গজ মত দূরে। আর কোন সন্দেহ রইল না কুইনটাল ওটার আশপাশে কোথাও লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল এমন একটা সুযোগের জন্যে। সুজানাহকে সে ধরে নিয়ে গেছে।

কেউ কেউ বলল কুইনটাল ওকে নিয়ে খালি বাড়িগুলোর কোন একটায় উঠে থাকতে পারে। সুতরাং বাতি নিয়ে আমি বেরোলাম দেখতে। কিন্তু না, পাওয়া গেল না ওদের—না সুজানাহকে না কুইনটালকে। সকাল হওয়ার আগে আর কিছু করার নেই আমাদের। রাতটা যে কী ভাবে কেটেছিল সেদিন! জীবনে আর কোন রাত অত দীর্ঘ মনে হয়নি আমার। অনেক রাতে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলাম সেখানে এল জেনি। সারাহর মৃত্যুর জন্যে সরাসরি আমাকে দায়ী করল সে। আশঙ্কা প্রকাশ করল, সুজানাহও হয়তো এতক্ষণে মারা গেছে।

'তুমি যদি অর্ধেকও পুরুষ হতে, আলেক্স স্মিথ,' বলল সে, 'প্রথম দিন

জানোয়ারটাকে দেখেই মেরে রেখে আসতে।'

আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না।

পরদিন ভোরের প্রথম আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলাম মিস্টার ইয়ং আর আমি। দু'জনের কাছেই একটা করে মাস্কেট। তা ছাড়াও আমি কোমরে ঝুলিয়ে নিয়েছি একটা কুঠার; যদি প্রয়োজন হয় এই ভেবে। মুখে উচ্চারণ না করলেও মনে মনে দু'জনই জানি আমরা খুন করতে যাচ্ছি কুইনটালকে। বুঝতেই পারছেন আমাদের তখনকার মনের অবস্থা। বসতির ভেতর দিয়ে গিয়ে ব্রাউনের কুয়া পেরিয়ে আমরা পশ্চিম পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। দু'জনেই চুপ। সারা পথে একটাই মাত্র কথা হলো আমাদের ভেতর। কথাটা বলল ইয়ং।

'আলেক্স, ওকে যদি আমরা পাই, আমাদের দিকে পেছন ফিরে থাকুক আর সামনে ফিরে থাকুক, দেখামাত্র গুলি করব, এবং করব মারার জন্যে।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম কুইনটালকে প্রথম দিন যেখানে দেখেছি সেই গিরিখাতটার কাছে। নেডকে রেখে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম আমি। ঝোপ সরিয়ে উঁকি দিলাম।

সুজানাহ্ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। কাপড় বলতে কিছু নেই পরনে। হাত-পা বাঁধা বাকলের ফালি দিয়ে। কুইনটালকে দেখলাম না কোথাও। ভাল করে যখন নিশ্চিত হলাম সত্যিই কুইনটাল নেই, দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলাম আমি। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে মুক্ত করলাম সুজানাহকে। বেচারার তখন শোচনীয় অবস্থা। সারা শরীরে আঁচড় কামড়ের দাগ। আতঙ্কে আধমরা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম পুরো মরে যায়নি দেখে। বাঁধন কাটার সময় একটাও শব্দ করেনি ও। ফিসফিস করে বললাম, 'চুপচাপ বেরিয়ে যাও, সুজানাহ, বাইরে নেড আছে। বদমাশটা কই?'

সুজানাহ হাত তুলে সামনের অন্ধকার একটা কোণের দিকে ইশারা করল। ধরে ওকে দাঁড় করিয়ে দিলাম আমি। প্রথমে একটু টলমল করলেও শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারল সে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল গুহামত জায়গাটা থেকে।

মাস্কেট হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি সুজানাহর ইশারা করা জায়গাটার দিকে। বারো কদম যাওয়ার আগেই দেখতে পেলাম ওকে। ঘুমাচ্ছে অঘোরে। সঙ্গে সঙ্গে আমি সরে এলাম সেখান থেকে। কিছুটা দূরে এসে মাস্কেট তাক করলাম। কিন্তু ট্রিগার টানতে পারলাম না। সে সময়কার মত খারাপ অনুভূতি জীবনে হয়নি আমার। দাঁড়িয়ে আছি ম্যাট কুইনটালের দিকে তাকিয়ে। বাউন্টির ম্যাট কুইনটাল ছবির মত ভেসে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে। তারপর আমার মনে পড়ল মেয়েদের কথা, বাচ্চাদের কথা, মৃত সারাহর মুখটা। বুঝতে পারলাম, যত কষ্টকরই হোক কাজটা আমাকে করতে হবে।

এক মুঠো নুড়ি তুলে নিয়ে আমি ওর দিকে ছুঁড়ে দিলাম। চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল কুইনটাল। জেগে মাথা তুলতেই দেখতে পেল আমাকে। লাঠিটা পাশেই ছিল। ওটা হাতে নিয়েই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। তেড়ে আসতে লাগল আমার দিকে। ট্রিগার টানলাম আমি। কিন্তু এমনই কপাল, গুলি ছুটল না মাস্কেট থেকে। কোনমতে এক দিকে সরে যাফিয়ে পড়ে কোমর থেকে কুঠারটা খুলে হাতে নেয়ার সময় পেলাম আমি। কুইনটাল এমন জোরে ছুটে এসে লাঠি চালিয়েছিল যে আমি সরে যেতেই ও

হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। পর মুহূর্তে উঠে বসল হাঁটুতে ভর দিয়ে। ততক্ষণে কুঠার হাতে প্রস্তুত আমি। কুঠারটা সর্বশক্তিতে নামিয়ে আনলাম ওর মাথায়।

উনিশ

মৃত্যু যন্ত্রণা টের পাওয়ার আগেই মারা গেল কুইনটাল। একটা শব্দ বেরোল না ওর গলা দিয়ে। অন্তরাত্মা পর্যন্ত আমার কাঁপছে তখন। বসে একটু সুস্থ হয়ে নিলাম। তারপর কুঠারটা রেখে আস্তে আস্তে গেলাম মিস্টার ইয়ং যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। সুজানাহকে কী অবস্থায় পাব ধারণা ছিল না আমাদের। মৃত পেলে মুড়ে নেয়ার জন্যে টাপার একটা চাদর দিয়ে দিয়েছিল মাইমিতি। ওটা গায়ে জড়িয়ে ইয়ং-এর পাশে গুটিসুটি বসে আছে জীবিত সুজানাহ।

'ওকে নিয়ে বসতিতে চলে যাও, নেড,' আমি বললাম। 'মেয়েরা ওর খবর জানার জন্যে নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে উঠেছে। বোলো, কাজটা হয়েছে। কুইনটাল আর আমাদের জ্বালাতে পারবে না।'

কথা বলার সময় নিজের গলা আমার অপরিচিত মনে হলো। মিস্টার ইয়ং নীরবে শুনল। একটা কথাও না বলে সুজানাহকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল বসতির দিকে। মিস্টার ইয়ং সুস্থ অবস্থায়ও খুব একটা শক্ত স্বভাবের মানুষ না। রক্তপাত সে অন্তর থেকে ঘৃণা করে। এটা আমি জানি তাই কুইনটালের লাশ দেখার কথা ওকে বলতে পারলাম না। ও-ও দেখতে চাইল না।

আমি আবার ফিরে গেলাম কুইনটালের মৃতদেহের কাছে। যে কুঠার দিয়ে ওকে হত্যা করেছি সেটা দিয়েই কবর খুঁড়লাম। অত্যন্ত কষ্টকর হলেও কাজটা শেষ পর্যন্ত আমি করলাম এবং কুইনটালকে কবরে নামিয়ে মাটি চাপা দিয়ে দিলাম। তারপর সাগরে গিয়ে স্নান করে কুঠারটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফিরলাম বাড়িতে। সেদিনই সারাহকেও কবর দিলাম আমরা।

এরপর প্রায় পক্ষকাল কী আতঙ্কের ভেতর যে কাটাল মেয়েরা, আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। ইন্ডিয়ান মেয়েদের এই এক স্বভাব, কেউ মারা গেলে এমন ভয় পেয়ে যায়! ভাবখানা মৃত ব্যক্তি আবার প্রাণ পেয়ে এগিয়ে আসছে ওদের মারার জন্যে। এই পক্ষকাল ওরা বাচ্চাদের নিয়ে গাদাগাদি করে রাত কাটাল আমার বাড়িতে। প্রতিদিন সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত মোম-বাদামের পলতে জ্বেলে রাখল। সন্ধ্যার পর ভুলেও কেউ বাড়ির বাইরে বেরোল না–মোয়েটুয়ার মত সাহসী মেয়েও না। আস্তে আস্তে অবশ্য এই আতঙ্ক থিতিয়ে এল। মিস্টার ইয়ং আর আমি বুঝিয়ে শুনিয়ে ওদের যার যার বাড়িতে পাঠাতে পারলাম।

অবশেষে, স্যার, দুঃসময়ের অবসান হলো আমাদের। এখনও আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করি কুইনটালকে হত্যা করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। অমন একটা বিকৃত মস্তিষ্ক, পশুর পর্যায়ে নেমে যাওয়া মানুষকে ইচ্ছা মত ঘুরে বেড়াতে দিলে নারী বা শিশুদের একজনেরও প্রাণ নিরাপদ থাকত না। তবে এটাও ঠিক ওকে

মারার পর যে মনোকষ্টে আমি ভুগেছি খুব কম মানুষই জীবনে অত কষ্ট পায়। শান্তি দ্বীপে এল ঠিকই কিন্তু আমার মন থেকে বিদায় নিল দীর্ঘ দিনের জন্যে।

ক'দিনের দুশ্চিন্তা আর ধকলে যেটুকু শক্তি ছিল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল মিস্টার ইয়ং-এর। সপ্তা দুয়েক বিছানায় থাকার পর ধীরে ধীরে সে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল আবার। মাসখানেকের ভেতর অনেকটাই শক্তি পুনরুদ্ধার করতে পারল। সে সময় আমার তো মনেই হতে শুরু করেছিল, আগের স্বাস্থ্য ফিরে পেতে চলেছে ইয়ং। সাধ্য মত সব কাজে হাত লাগাচ্ছে; করছেও। তবে একটা ব্যাপার, আমরা কেউ কখনও কুইনটালের নাম উচ্চারণ করতাম না।

বাচ্চারা তখন কী যে আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল সবার সামনে তা বলার নয়। নতুন একটা জীবন আমাদের সামনে মেলে দিয়েছিল ওরা। এসময় ওদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একুশ-এ। তাদের সবচেয়ে বড় জনের বয়স নয় আর একেবারে ছোটটার কয়েক সপ্তাহ। এখন পর্যন্ত যতদূর জানি সবগুলো বাচ্চাই আমাদের মানে বাউন্টির লোকদের ঔরসজাত। ইণ্ডিয়ান পুরুষদের ঔরসে কোন বাচ্চা জন্মায়নি। মেয়েরা সেরকমই বলেছে। তবে সত্যি কথাটা হচ্ছে কয়েকটা বাচ্চার বাবার পরিচয় এখনও আমরা জানি না। মিসেস ক্রিশ্চিয়ানেরগুলোর ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই তবে বাকিরা সব সময়ই যে এক পুরুষের সন্তান গর্ভে ধরেছে তা নয়। এ সময়ের আগের ছ'বছর যে রুক্ষ, স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করেছি তার কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে পুরুষ এবং মেয়ের আনুপাতিক সংখ্যার কথা। তাছাড়া পুরুষহীন মেয়েরা ওই চরম হতাশাজনক সময়ের অবলম্বন হিসেবে সন্তান কামনা করেছিল ময়িয়া হয়ে। এখনও ওরা সন্তান চায়। আমাদের এখানে বেঁচে থাকার একমাত্র অনুপ্রেরণাই তো ওরা। শুনে অবাক হবেন, সব কিছু আবার শান্ত স্বাভাবিক হয়ে আসার পর বলহাদি আর টাউরুয়া–আমাদের নিজের মেয়েমানুষ একদিন বলল, যে কোন মেয়ে চাইলে তাদের বাচ্চার বাবা হতে হবে আমাকে আর মিস্টার ইয়ংকে। আমরা মেয়েদের আহ্বানে সাড়া দিলে ওরা আপত্তি তো করবেই না বরং খুশি হবে। সে সময় বাচ্চারা যে শান্তি যে অনুপ্রেরণা আমাদের দিয়েছে তাতে এ প্রস্তাব মোটেই অসংযত বা অশ্লীল মনে হয়নি আমার কাছে। এখনও হয় না। আপনি হয়তো একমত হবেন না আমার সাথে, কিন্তু যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে গেল বছরগুলো আমরা কাটিয়েছি ওই অবস্থায় পড়লে নিজেই বুঝতে পারতেন।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ খুনোখুনি কাণ্ডটা যখন ঘটে সে সময় একটা বাচ্চাও সে কথা মনে রাখবার মত বড় ছিল না। ম্যাককয় আর কুইনটালের কথা মনে ছিল চার পাঁচজনের, তবে শিগ্‌গিরই ওরা ভুলে গেল ওদের, বাচ্চারা যেমন যায়। আর আমরা বড়রা কখনোই ওদের সামনে উচ্চারণ করিনি মৃতদের নাম।

ওরা আস্তে আস্তে আমাদের মনের ক্ষত ভাল করে তুলল। অল্প দিনেই ছোট্ট দ্বীপটাতে স্বর্গের প্রশান্তি এনে দিল। একটাই কেবল দুঃখ আমার, যারা মারা গেছে তারা দেখতে পেল না মর্তের এই স্বর্গ।

কুইনটাল মারা যাওয়ার কিছুদিন পর অবিস্মরণীয় এক ঘটনা ঘটল আমার জীবনে। সেই ঘটনার কথা না বললে আমার এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এক রাতে আমি গিয়েছি মিস্টার ইয়ং-এর বাসায়। বেশ রাত তখন। বাচ্চারা তো বটেই,

তাদের মা-রাও ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু মিস্টার ইয়ং তখনও জেগে। টেবিলে বসে বাউন্টির পুরনো লগ বইগুলোর একটায় লিখছে মনোযোগ দিয়ে। প্রায়ই একাজ করতে দেখেছি ওকে। কখনও কৌতূহল দেখাইনি কী করছে সে সম্পর্কে। বরং কাজে এসে থাকলে অপেক্ষা করেছি ওর শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

'এত কী লেখো তুমি, নেড,' আজ জিজ্ঞেস করলাম। 'দিনলিপি রাখছ?'

'তা বলতে পারো,' জবাব দিল ইয়ং। 'কে কবে জন্মেছে বা কবে কী করছি তার একটা বিবরণী আমি রাখছি। তবে সেটাই সব নয়।' এরপর সে বলল, জীবনে যত বই পড়েছে সব থেকে যা যা মনে আছে বা মনে পড়ছে লিখে রাখছে। মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান প্রথম এটা শুরু করেন। এখানে আসার বছরখানেক পর থেকেই অবসর সময়ে পাতার পর পাতা ভরিয়ে তুলতে থাকেন। মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান যতদিন ছিলেন লিখেছেন। উনি মারা যাওয়ার পর ঝামেলার বছরগুলোয় লেখা বন্ধ ছিল। এখন আবার শুরু করেছে ইয়ং।

স্মৃতি থেকে লেখা 'দ্য পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস' গল্পটা থেকে একটুখানি ইয়ং আমাকে পড়ে শোনাল। শুনে আমার এত ভাল লাগল যে পুরো গল্পটা পড়তে বললাম ওকে। ওটা শেষ হতে আরেকটা পড়তে বললাম। সাধারণ এক নাবিক আমি। এত সুন্দর সুন্দর কাহিনী যে পৃথিবীতে লেখা হয়েছে আমার ধারণাই ছিল না। আমার নিজের দেশের নামকরা লেখকদের নামও আমি জানতাম না তখন। মিস্টার ইয়ং তাঁদের সম্পর্কে বলল আমাকে। এক সময় হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল:

'তুমি কখনও লিখতে পড়তে শেখোনি, আলেক্স?'

'সামান্য,' আমি বললাম। 'খুব ছোট বেলায় কয়েক বছর স্কুলে গেছিলাম, ব্যস। এখন তার কিছুই মনে নেই।'

'এখন আবার শুরু করো না কেন?' ও বলল। 'আমি তোমাকে সাহায্য করব। লেখাপড়ায় তোমার আগ্রহ আছে আমি বুঝতে পেরেছি।'

'আগ্রহটা আগে ছিল কিনা জানি না, তবে এখন হচ্ছে। কিন্তু শুরু করতে চাইলেই কী করা যাবে? আমার মাথায় কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। শেখাতে গিয়ে ক'দিনেই বিরক্ত হয়ে উঠবে তুমি।'

'সে দেখা যাবে, তুমি শুরু করতে রাজি কিনা বলো?'

সেই শুরু। পরদিন থেকে মিস্টার ইয়ং আমাকে শেখাতে শুরু করল। প্রথমে শুধুই গল্প শোনা আর বর্ণমালা চেনা। তারপর লিখতে শুরু করা। কী অক্লান্ত পরিশ্রম যে আমরা করেছি—আমরা বলা ঠিক হবে না, করেছে নেড ইয়ং।

কিছুদিন যেতে না যেতেই ও বাইবেল থেকে পড়ে শোনাতে শুরু করল। দেশে থাকতে দু'একদিন শুনেছি বাইবেলের বাণী, কিন্তু মন দেইনি কখনও। আমি তখন দুরন্ত তরুণ। এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দিয়েছি। এখনকার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। সমস্ত অন্তর দিয়ে শুনি এখন। সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে শুরু। তারপর দিনে দিনে ক্রমশ এগিয়ে যাওয়া। রোজ সন্ধ্যায় লেখাপড়ার নিয়মিত অনুশীলন শেষে পাঁচ ঝ ছয় পরিচ্ছেদ করে পড়ে ইয়ং। পরদিন পড়তে বসার আগ পর্যন্ত সেটা নিয়ে ভাবি আমি।

এই ভাবে চলল কয়েক মাস। রোজ সন্ধ্যায় খেয়াল করতাম বাচ্চাদের ভেতর

যারা একটু বড় তারা কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে বা বসে সকৌতূহলে লক্ষ করছে আমার পড়া বা ইয়ং-এর পড়ানো। এক বিকেলে হঠাৎ শুনতে পেলাম তাদের কয়েকজন খেলতে খেলতে গড় গড় করে আউড়ে যাচ্ছে কিছু ইংরেজি কথা। ওই কথাগুলোই কয়েকদিন আগে আমাকে শুনিয়েছে নেড। ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম আমি। একবার শুনেই এমন সুন্দর মনে রেখেছে বাচ্চারা! তা-ও আবার ইংরেজি কথা। ছেলেবেলা থেকে একমাত্র মায়ের ভাষাই শিখেছে ওরা।

সেদিনই পড়তে বসে আমি নেডকে জিজ্ঞেস করলাম বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখানো বা বাইবেলের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে সে কিছু ভাবছে কিনা। বিকেলের কথা বললাম ওকে। আরও বললাম যে, আমার ধারণা বাচ্চারা আমার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি শিখবে।

'এখনও কিছু ভাবিনি, আলেক্স,' জবাব দিল ও। 'ওরা তোমার চেয়ে দ্রুত শিখবে সন্দেহ নেই। কিন্তু কী হবে শিখিয়ে? প্রথমে দ্বিমত থাকলেও এখন আমার মনে হয় মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান ঠিকই বলেছিলেন। মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান চেয়েছিলেন বাচ্চারা এখানে মা-দের ধারায় মা-দের বিশ্বাস নিয়ে বড় হবে। এখন যদি ওদের কিছু আমি শেখাতে চাই বাইবেলের শিক্ষা ছাড়া আর কী দেয়ার আছে আমার? এতদিন ওরা যা জেনেছে, সত্য বলে মেনেছে তার ওপর যদি বাইবেলের পাঠ দেয়া হয় ওদের কচি মাথাগুলো গুলিয়ে যাবে না?'

তখনকার মত কথাটা আমার যুক্তিসঙ্গতই মনে হলো। আর কিছু বললাম না এ প্রসঙ্গে।

ন'মাস কেটে গেল। ধীরে হলেও আমি পড়তে এবং লিখতে শিখলাম। তখন আমার মনে কী যে উত্তেজনা! ছেলেবেলায় অর্জন করা যে ক্ষমতা চর্চা না রাখার কারণে, হারিয়েছিলাম তা আবার ফিরে পেয়েছি। তবে তার জন্যে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাকে। এমন একটা দিন যায়নি যেদিন ইয়ং-এর কাছে পড়তে বসিনি। তাছাড়া আমি নিজে নিজেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি বই খাতা নিয়ে।

এরপর হঠাৎ করেই আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল মিস্টার ইয়ং। তার সেই পুরনো হাঁপানির সমস্যা আগের চেয়ে তীব্রতা নিয়ে দেখা দিল। সে বছর শীতল বর্ষা বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। সেকারণেই বোধহয় অমনটা ঘটেছিল। মেয়েরা যতরকম ইন্ডিয়ান ওষুধপত্র অর্থাৎ গাছপালার রস বা প্রলেপের কথা জানত প্রয়োগ করল একের পর এক। কিছুতেই কিছু হলো না। ক্রমশ খারাপই হতে লাগল ইয়ং-এর অবস্থা। অবশেষে বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতাটাও হারাল সে।

তিনটে দীর্ঘ মাস চলে গেল এভাবে। অবশেষে এক বিকেলে আমাকে ডেকে পাঠাল ও। পিঠের নিচে কয়েকটা বালিশ দিয়ে একটু উঁচু করা হয়েছে ওকে। সাধারণের চেয়ে একটু ভাল দেখলাম এদিন ওর অবস্থা। তবে চেহারায় এমন একটা ভাব যা দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না ও মারা যাচ্ছে। চুপচাপ বসে ছিল ও হাত কোলে করে। জানালা গলে সাগরের দিকে চলে গিয়েছিল দৃষ্টি। আমরা শুধু দু'জনেই ছিলাম ঘরে।

একটু পরেই ইয়ং ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আমার দিকে।

'আলেক্স,' বলল সে, 'সময় থাকতে থাকতেই দু'একটা কথা বলে নিতে চাই

তোমাকে।'

আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। বেঁচে থাকার কী অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও লালন করে মনে মনে তা তো আমি জানি। মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের মৃত্যুর পর ও–শুধু ও কেন আমরা সবাই সচেতনভাবে না হলেও আসলে তো মৃত্যুকেই আহ্বান জানিয়েছিলাম। কিন্তু বাচ্চারা সব বদলে দিয়েছে। এখন ও ওদের মাঝে থেকে আমার পাশাপাশি বুড়ো হতে চায়, ওদের গড়ে দিয়ে যেতে চায় পরিপূর্ণ পুরুষ বা নারী হিসেবে।

'যদি কখনও কোন জাহাজ আসে,' বলে চলল ইয়ং, 'আসবেই আমার ধারণা, আজ হোক কাল হোক; তুমি ওদের জানিও আমাদের আসল পরিচয়। নিশ্চয়ই ওদের ভেতর ভাল মানুষ, বিশ্বাস করা যায় এমন মানুষ থাকবে। তার কাছে খুলে বোলো সব, আলেক্স।'

'বলব, নেড,' আমি বললাম।

'ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলার জন্যে একমাত্র তুমিই রইলে। এ এক মহান পবিত্র দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে কোন গাফিলতি কোরো না। তুমি করবে না জানি, তবু একটু স্মরণ করিয়ে দিলাম।'

আমার একটা হাত তুলে নিয়ে ধরে রইল ইয়ং। 'ব্যস, এটুকুই আমার বলার ছিল,' বলল সে। 'তোমার সাথে থাকতে পারলে সত্যিই ভাল হত কিন্তু তা যে হওয়ার নয়।'

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না, স্যার। দু'হাতে ওর হাত ধরে বসে রইলাম কেবল। আমার গাল বেয়ে অঝোরে ঝরছিল অশ্রু। একটু পরেই মিসেস ক্রিশ্চিয়ান আর টাউরুয়া এল। অশ্রু লুকানোর জন্যে আমি বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

সেরাতেই মারা গেল ইয়ং। পরদিন ওকে আমরা শেষ শয়নে শুইয়ে দিলাম।

পরের কয়েকটা মাস দুঃস্বপ্নের ভেতর কাটল যেন আমার। নিঃসঙ্গতা যে কী ভয়ানক হতে পারে সে-ই প্রথম অনুভব করলাম। বাউন্টিতে করে ইংল্যান্ড থেকে আমরা রওনা হয়েছিলাম পঁয়তাল্লিশ জন সুস্থ সবল মানুষ; আর তখন, আমার ধারণা মতে, বেঁচে আছি আমি কেবল একা। এই চিন্তাটা যে কী দুঃসহ কী ভয়ানক ভাবে আমাকে পীড়িত করছিল, বলে বোঝাতে পারব না। বিদ্রোহ এবং তাতে আমার ভূমিকার কথা মনে হত আমার। মনে হত কী করে ক্যাপ্টেন ব্লাই আর তার সঙ্গের আঠারো জন মানুষকে ছোট্ট এক নৌকায় মাঝ সাগরে ভাসিয়ে দেয়ায় সাহায্য করেছিলাম। রাতে বিছানায় শুলে চোখের সামনে দেখতাম ঢেউয়ের মাথায় লঞ্চটা নাচছে, বা জংলীরা তার আরোহীদের হত্যা করছে বা ক্ষুধা তৃষ্ণায় তিলে তিলে মরছে তারা। এখানে যে রক্তপাত হয়েছে তাও আমার মনে হত। কুঠারের আঘাতে বীভৎস হয়ে যাওয়া কুইনটালের মুখটা মনে পড়ত। রাত দিন ছবিটা ভাসত আমার চোখের সামনে। এই সব স্মৃতি নিয়ে কী করে বাঁচব ভেবে পেতাম না। ঘুম কাকে বলে ভুলে গিয়েছিলাম।

বাচ্চারাও আর প্রশান্তি দিতে পারত না আমার মনে। ওদের দেখলেই আতঙ্ক বোধ করতাম পূর্ণবয়স্ক নর-নারী হওয়ার পর ওরা কী করবে ভেবে। বাইবেলের

সেই বাণী আমার কানে বাজত: 'পিতার পাপ প্রজন্মে প্রজন্মে ঘুরে ঘুরে দেখা দেবে সন্তানদের ভেতর।' এতগুলো নিরপরাধ মানুষের মৃত্যুর জন্যে দায়ী আমরা; আর আমাদের সন্তানরা থাকবে শান্তিতে, সুখে! এ কী সম্ভব? সম্ভব তা আমার বিশ্বাস হত না কিছুতেই। স্বল্প সময়ে যে ঈশ্বরের কথা আমি জেনেছিলাম তা ক্রোধের, প্রতিশোধের; ক্ষমার ঈশ্বর, প্রেমের ঈশ্বরের কথা তখনও জানা হয়নি আমার।

অবশেষে এক দিন—ইয়ং-এর মৃত্যুর প্রায় দু'মাস পর—গিয়ে উঠলাম দ্বীপের দক্ষিণ দিকের সবচেয়ে উঁচু চূড়ায়। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, এ জীবনের ভার আর বহন করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমি লাফিয়ে পড়ব পাহাড় থেকে। আমার সব বোধ বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল সেদিন।

জায়গাটা কেমন ভয়ানক আপনি তো দেখেছেন! খাড়া পাহাড় নেমে গেছে কয়েকশো ফুট নিচে সাগর পর্যন্ত। ওখানেই কুইনটাল আর মিনারী খালি হাতে লড়াই করেছিল। কীভাবে যে সেখানে পৌঁছেছিলাম আমি জানি না। তখন ভরা দুপুর। ভেবেছিলাম নারী ও শিশুরা সবাই বসতিতে, যথানিয়মে খাওয়ার পর বিশ্রাম নিচ্ছে। কিন্তু চূড়ার কিনারার ছ'কদমের ভেতর পৌঁছে দেখলাম বাচ্চাদের তিনজন সেখানে বেড়াল ছানার মত গুটিসুটি হয়ে ঘুমাচ্ছে। বাচ্চা ম্যাট কুইনটাল, এলিজা মিলস আর মিসেস ক্রিশ্চিয়ানের মেয়ে মেরি, ওর বয়স তখন সাত। ম্যাটের পাশে পড়ে আছে ছোট একটা লাঠি। তার এক প্রান্তে বাঁধা একটা ঝুড়ি, তাতে কয়েকটা ইয়াম; আর অন্য প্রান্তে এক কাঁদি কলা। কাছেই এক পাথরের ছায়ায় দু'মেয়ের ডিমভর্তি ঝুড়ি।

আমি ছিটকে পিছিয়ে এলাম কয়েক পা। ভয়ানক কোন দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠা মানুষের মত তাকিয়ে রইলাম ওদের দিকে। কী এক অপূর্ব আনন্দ আর আশার স্রোত যে সে সময় আমার বুককে প্লাবিত করে দিয়েছিল আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। বিশ্বাস করুন, স্যার, সে সময় ওদের ওখানে না দেখলে নিশ্চয়ই আমি লাফ দিতাম। দু'চোখ ভেঙে অশ্রু নামল আমার। আস্তে আস্তে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লাম ওদের পাশে। কে যেন আমার ভেতরে কথা বলে উঠল: 'এদের জন্যেই তোমাকে বাঁচতে হবে, আলেক্স স্মিথ!'

ওই কথা যেন শুনতে পেল মেরি। চোখ মেলে বিভ্রান্ত চোখে তাকাল আমার দিকে। পর মুহূর্তে সে লাফ দিয়ে কাছে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরল।

'আলেক্স! কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

কিন্তু আমার অন্তর তখন এমন পরিপূর্ণ, কোন জবাব দিতে পারলাম না সঙ্গে সঙ্গে। একটু পরেই বললাম, 'কিছু না, লক্ষ্মী মা। খুশিতে কাঁদছি আমি।'

আমাদের কথা শুনে অন্য দু'জনও জেগে গেছে। দু'জন দু'পাশে এসে দাঁড়াল আমার গা ঘেঁষে।

'আলেক্স, কেউ কষ্ট দিয়েছে তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল ম্যাট।

'না, বাবা,' জবাব দিলাম আমি, 'কেউ কষ্ট দেয়নি; তোমরা চমকে দিয়েছ আমাকে। চূড়ার একেবারে কিনারে ঘুমিয়ে ছিলে তিনজন, যদি পড়ে যেতে গড়িয়ে?'

এলিজার মুখ এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। অন্যরাও যোগ দিল সে হাসিতে।

'এই জন্যে কাঁদছিলে তুমি?' বলল এলিজা। 'আমরা তো প্রায়ই ওই নিচে নামি।'

'কী!' আমি আঁতকে উঠলাম। 'নিশ্চয়ই দড়ি বেয়ে না।'

'দড়ি বেয়েই,' হাসতে হাসতে বলল এলিজা।

আমি ঠিক মত কিছু ভেবে উঠতে পারার আগেই ম্যাট বলল, 'দাঁড়াও, তোমাকে দেখাচ্ছি।'

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সে নামতে শুরু করল রশি বেয়ে। আমার তো দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। কিন্তু হাসতে হাসতেই বেশ কিছু দূর নেমে গেল ম্যাট; একটু পরেই উঠে এল আবার। গর্বিত ভঙ্গিতে বলল, 'দেখলে?'

মনে মনে গর্ব বোধ করলাম আমিও, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করলাম না। বরং মৃদু তিরস্কার করে ওদের নিয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে।

আমার জীবনের আরেকটা পর্যায় শুরু হলো।

মিস্টার ইয়ং অসুস্থ হয়ে পড়ার পরপরই আমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার শুরু করলাম নতুন উদ্যমে। বাউন্টির লগবইয়ে মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান আর মিস্টার ইয়ং যা লিখেছিলেন সেগুলো পড়তে শুরু করলাম নিজে নিজে। সত্যি কথা বলতে কি ওই সময় বাইবেলের চেয়েও ওগুলোর প্রতিই আমি বেশি মনোযোগ দিয়েছিলাম। তাই বলে ভাববেন না বাইবেল একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলাম। মিস্টার ইয়ং যেখানে শেষ করেছিল সেখান থেকে শুরু করলাম আমি। প্রতিদিন একটু একটু করে পড়ে চললাম।

বাচ্চাদের নিয়ে দুশ্চিন্তাটা তখনও আমাকে পীড়িত করছে। ওদের সে সময়কার অবস্থা না, ভবিষ্যৎ নিয়েই দুশ্চিন্তা। বাপদের রক্ত বইছে ওদের ধমনীতে। কী করে আমি নিশ্চিত হব, আমরা অতীতে যা করেছি ওরাও ভবিষ্যতে তা করবে না? মিস্টার ইয়ং মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানের বরাত দিয়ে যা-ই বলে থাকুক আমি আর তখন মানতে পারছি না ছেলেমেয়েদের ঈশ্বরের পবিত্র বাণী সম্পর্কে অজ্ঞ রেখে দেয়ার ব্যাপারটা। বেশ কিছুদিন ভাবলাম এ নিয়ে। তারপর সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম: না, পবিত্র ধর্মে ওদের দীক্ষা দিতে হবে। শুরু করব মা-দের দিয়ে।

পর দিন থেকেই শুরু হলো আমার নতুন দায়িত্ব। সন্ধ্যায় সবার সব কাজ যখন শেষ, ওদের এক জায়গায় জড় করলাম আমি—নারী, শিশু, কিশোর সবাইকে। প্রথম বারের মত বললাম এক ঈশ্বরের কথা। ভেবেছিলাম মেয়েদের কেউ কেউ হয়তো প্রতিবাদ করবে, আমার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি চাইবে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম তেমন কিছু তো ঘটলই না বরং অদ্ভুত এক কৌতূহল নিয়ে শুনছে ওরা।

এরপর থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পবিত্র বাইবেল থেকে কিছুটা করে আমি পড়ে শোনাই ওদের। প্রথম প্রথম ওল্ড টেস্টামেন্টের গল্প অংশগুলোই ওরা শুনতে চাইত। আস্তে আস্তে অন্য অংশগুলোতেও ওদের অভ্যস্ত করলাম আমি। কিছুদিন পর মনে হলো ওরা যেন আস্থা আনতে শুরু করেছে বাইবেলে।

বাইবেলের পাঠদান শুরু করার ক'দিন পর থেকে ছেলেমেয়েদের এবং মা-দের যারা যারা শিখতে চাইল তাদের লেখা এবং পড়ার কৌশল শেখাতে শুরু করলাম। ব্যাপারটা মোটেই সহজ ছিল না আমার জন্যে। আমি লিখতে পড়তে জানি ইংরেজি

ভাষা। ওদের তা শিখিয়ে বিশেষ লাভ নেই। অন্তত ওই মুহূর্তে শেখালে ওদের মাতৃভাষাই শেখাতে হবে। অথচ ইন্ডিয়ান ভাষায় লেখার কোন রীতি নেই। বর্ণমালাই নেই ওদের। ইংরেজি বর্ণমালা ব্যবহার করে ইন্ডিয়ান ভাষা লেখা যেতে পারে, ভাবলাম আমি। কিন্তু ভাবা যত সোজা করা ততটাই কঠিন। অথৈ সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলাম আমি। মিস্টার ইয়ং-এর মত শিক্ষিত লোক থাকলে মনে হয় সহজেই সমাধান করতে পারত এ সমস্যার। অনুশোচনা হতে লাগল এই ভেবে, কেন পেছনে লেগে থেকে বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখাতে রাজি করালাম না মিস্টার ইয়ংকে।

অনেক মাথা খাটিয়ে পদ্ধতি একটা বের করলাম আমি ইংরেজি বর্ণমালা ব্যবহার করে ইন্ডিয়ান ভাষা শেখার। সময়ে সময়ে সে পদ্ধতিতে পরিবর্ধন, সংশোধন, পরিমার্জন করতে হলো। তবে শিক্ষা ছেলেমেয়েদের এগোতে লাগল। ওদের শেখাতে গিয়ে আমি নিজে কত কিছু যে শিখলাম, কত কিছু যে আবিষ্কার করলাম, কী বলব। কিছুদিন পর একটু বড় ছেলেমেয়েগুলোকে ইংরেজি শেখাতে শুরু করলাম আমি। বাইবেলের কথা, বা বাউন্টির লগবইয়ে মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান-ইয়ং-এর লেখা কথা এতদিন আমি অনুবাদ করে শুনিয়েছি ওদের। (এই অনুবাদ করতে গিয়েও যে কতবার কত সমস্যায় পড়েছি তার ইয়ত্তা নেই)। ইংরেজি শিখলে নিজেরাই ওরা পড়তে পারবে ওসব।

লেখার সাজ সরঞ্জাম ভর্তি একটা বাক্স ছিল ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের। বেশ ভাল পরিমাণ কাগজ, কালি, কলম, ছিল তাতে। এতদিন ওটা অব্যবহৃতই পড়ে ছিল। এবার সেটা কাজে লাগল। আমার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যেককে খাতা বানিয়ে দিলাম কাগজ দিয়ে। খেয়াল রাখলাম কাগজ যেন অযথা অপচয় না হয়। এক বাক্স কাগজ অনেক সন্দেহ নেই, কিন্তু এতগুলো শিক্ষার্থীর তা শেষ করতে যে খুব বেশি দিন লাগবে না সে ব্যাপারে আমি সচেতন ছিলাম। ব্লাইয়ের কালি শেষ হয়ে যাওয়ার পর মোম-বাদামের ছাই দিয়ে নতুন করে কালি তৈরি করলাম। খুব খারাপ হলো না জিনিসটা। আর কলমের তো কোন অভাবই হয়নি দ্বীপে যেখানে এত মোরগ মুরগি। কাগজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর চ্যাপ্টা পাথর ঘষে ঘষে স্লেট তৈরি করে দিলাম ছেলেমেয়েদের। এখানে এক ধরনের পাথর আছে যা সহজেই পাতলা স্তরে ভাগ করে ফেলা যায়। ওই পাথরই আমরা ব্যবহার করেছি স্লেট বানানোর কাজে।

আমার শেখানোর আগ্রহ যতটা ছিল ছেলেমেয়েদের শেখার আগ্রহ তার চেয়ে কম ছিল না মোটেই। ওদের কখনোই পীড়াপীড়ি করতে বা বোঝাতে হয়নি পড়তে বসার জন্যে–বকাবকি দূরে থাক। প্রত্যেকেই লিখতে এবং লেখা দেখে তার মর্মোদ্ধার করতে শেখার জন্যে উন্মুখ ছিল।

আমার স্কুল প্রথমে শুরু হয়েছিল বড় ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে। ছোটগুলোকেও মোটামুটি একটা বয়েসে পৌঁছুতেই নিয়ে নিতে লাগলাম। বড়রা খুবই সাহায্য করেছে ছোটদের পড়ানোয়। একটু যখন পড়তে শিখল তখন ওদের উৎসাহ দেখে কে! পড়ার মত যা যা আছে সব এক দিনেই পড়ে ফেলবে যেন। আর কত যে তাদের প্রশ্ন! প্রশ্নের চোটে আমার বুড়ো মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। পড়ার মত যা যা ছিল বা আছে আমাদের এখানে তার সব ওদের পড়তে দিয়েছি

কেবল বাইবেল ছাড়া। বাইবেল কখনও ওদের নিজেদের পড়তে দেইনি। ওতে এমন কিছু অংশ আছে যা শুধু বিভ্রান্তই করবে ওদের, মিস্টার ইয়ং যেমন বলেছিল। বেছে বেছে সহজ সরল–বিশেষ করে শিষ্যদের প্রতি খ্রীষ্টের উপদেশ অংশগুলো আমি নিজে পড়ে শুনিয়েছি। ওরা অন্তরের অন্তস্তলে তা গ্রহণ করেছে, এবং সেই মত জীবন যাপন করছে এখন।

আমার গল্প প্রায় শেষ। চাইলে আরও এক রাত বা তারও বেশি সময় ধরে আপনাকে শোনাতে পারব গত পাঁচ বছরে এখানে কী ঘটেছে। কিন্তু আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না, তাই সে চেষ্টা আমি করব না। শুধু এটুকু বললেই বুঝতে পারবেন আশা করি, অত্যন্ত শান্ত, শান্তিময়, নিরিবিলি জীবন যাপন করছি আমরা গত পাঁচ বছর ধরে। বাচ্চাদের জন্যেই আমরা বেঁচে আছি–আমি, ওদের মা-রা। ওদের সুখ, শান্তি ছাড়া আর কিছু ভাবি না আমরা। অতীতে যে কষ্ট, যে দুর্ভোগ আমরা সয়েছি তাকে যেন ওরা নতুন করে ডেকে না আনে সেজন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি সুশিক্ষা দিতে। এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছি, বাকিটা ভবিষ্যতের হাতে।

আর একটা কথা আমি বলতে চাই বাচ্চাদের সম্পর্কে। এখন যেমন আছে তেমন যদি ওদের রাখতে পারতাম, মিস্টার ওয়েবার–বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ, উদাসীন, বাইরের দুনিয়াও ওদের সম্পর্কে অজ্ঞ! এটা আমার আন্তরিক ইচ্ছা। হয়তো বলবেন এটা বোকার মত ইচ্ছা, কিন্তু আপনি যদি আমার জায়গায় থাকতেন আপনিও আমার মতই ভাবতেন। ভাববেন না এ কথা বলে আমি বোঝাতে চাইছি ওরা নিখুঁত, দোষ ত্রুটিহীন। ওরাও রক্ত মাংসের মানুষ। তবে আমি বিশ্বাস করি, অন্তর থেকে বিশ্বাস করি, ওদের মত নিষ্পাপ এবং খাঁটি মনের ছেলেমেয়ে আপনি সারা দুনিয়া খুঁজেও পাবেন না।

ওরা আমার বা আমার বাউন্টির সাথী বন্ধুদের সন্তান ভাবলেই আমার বিস্ময় লাগে। বিশ্বাস হতে চায় না ওরা আমাদেরই রক্ত মাংস। এ এক দৈব ঘটনা! এমন ঘটনার আর কোন নাম দেয়া যেতে পারে না। এমন একটা রাত যায় না যেদিন এ ঘটনা দেখার জন্যে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বলে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই না।

হ্যাঁ, যেমন আছে তেমন যদি ওদের রাখতে পারতাম আর কিছু চাইতাম না আমি। আপনাদের টোপায় যেদিন দেখা গেল সেদিনকার কথা আমি ভুলতে পারব না। রবার্ট ইয়ং প্রথম দেখে আপনাদের। ছুটতে ছুটতে এসে সে বলে: 'আলেক্স! একটা বিরাট ক্যানো আসছে সাগরের ওপর দিয়ে।'

বাচ্চারা জাহাজ না দেখলেও জানত অমন জিনিস আছে পৃথিবীতে। আমার কাছেই শুনেছে। না বলে পারিনি আমি। বাউন্টির জিনিসপত্র দেখে নানা প্রশ্ন করেছে ওরা। সেসবের জবাব দিতে গিয়ে জাহাজ বা বিরাট ক্যানো কী জিনিস ওদের বলতে হয়েছে। সবাই আমরা ছুটে গেলাম সাগরতীরে। আমি যখন জাহাজটা দেখলাম, মিস্টার ওয়েবার, বিশ্বাস করুন, আমার বুক ভেঙে যেতে চাইছিল। আমার কী ইচ্ছা হয়েছিল জানেন? আপনারা তখনও অনেক মাইল দূরে, এখানকার আগুনের ধোঁয়া দেখতে পাননি। আমি ভেবেছিলাম সব আগুন নিবিয়ে দিয়ে মহিলা এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে লুকিয়ে পড়ব বনে, উপত্যকার একেবারে গভীরে।

নিজের জন্যে আমি ভয় পাচ্ছিলাম না। আমি ভাবছিলাম বাচ্চাদের কথা। ওদের বাবারা যে পৃথিবীতে বড় হয়েছে সেই পৃথিবী সম্পর্কে কিছু জানতে দিতে চাইছিলাম না ওদের। অন্তর থেকে আমি চেয়েছিলাম এটা। কিন্তু ওরা এমন চঞ্চল, এমন অস্থির হয়ে উঠেছিল আপনাদের, বিশেষ করে আপনাদের জাহাজটাকে কাছ থেকে দেখার জন্যে যে এটা করলে ওরা ভয়ানক আঘাত পেত মনে। তাই শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছিলাম ক্যানো নিয়ে গিয়ে আপনাদের ডাঙায় আমন্ত্রণ জানানোর।

আপনারা আমাদের কথা জেনেছেন। শিগ্‌গিরই সারা দুনিয়া জানবে। সন্দেহ নেই সামান্য হলেও ওদিকে হৈ চৈ হবে ক্যাপ্টেন ফলগার যখন জানাবেন বাউন্টির বিদ্রোহী নাবিকদের আত্মগোপন স্থানের খোঁজ তিনি পেয়েছেন। আমাদের সম্পর্কে মৌনতা অবলম্বনের জন্যে তাঁকে বা আপনাকে আমি চাপ দেব না, মিস্টার ওয়েবার। কারণ আমি জানি, আমাদের কথা জানানো আপনাদের কর্তব্য। তারপর আরও জাহাজ আসবে···হ্যাঁ, আজ হোক কাল হোক আসবে, মিস্টার ইয়ং যেমন বলেছিল···যাক সে কথা···থার্সডের কাছে শুনলাম আপনাদের পিপেগুলো সব ভরা হয়ে গেছে। কালই ইচ্ছে করলে খাঁড়ি থেকে বের করে নিতে পারবেন ওগুলো···

কিন্তু, আর তো আপনাকে বসিয়ে রাখা ঠিক হচ্ছে না। নিশ্চয়ই ঘুম পেয়েছে আপনার। আমাকে সুযোগ দিলে সারারাত কথা বলতে পারব—কত দিন পর একজন জাহাজী মানুষের সাথে কথা বলছি! শুভরাত্রি, স্যার, ভাল ঘুমান এই কামনা করি। আমি ভোরেই উঠে পড়ব ক্যাপ্টেন ফলগারের সাথে দেখা করার জন্যে।

উপসংহার

পরদিন সূর্যাস্তের সময় আলেকজান্ডার স্মিথ ছেলেমেয়েদের ছ'জনকে নিয়ে বসে আছে খাঁড়ির ওপরের পাহাড় চূড়ায়। সাগরের দিকে চোখ ওদের। একটু নিচে পাহাড়টার সাগরমুখী পাশে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পিটকেয়ার্ন উপনিবেশের বাকি সদস্যরা। সবাই নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে পুব দিকে। পশ্চিমা বাতাসে ভরা পালে এগিয়ে চলেছে টোপায়। তীর থেকে দূরে চলে গেছে ওটা। এবং প্রতি মুহূর্তে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। নীল সাগরের নিঃসঙ্গ বিস্তৃতির মাঝে বাচ্চাদের খেলনা জাহাজের মত দেখাচ্ছে ওটাকে।

স্মিথের বাহু জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ছোট্ট একটা মেয়ে। ওর দিকে তাকাল স্মিথ। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল:

'আর কাঁদে না, মা! এবার শান্ত হও! তোমার দেখাদেখি আমরা সবাই তো কাঁদতে শুরু করব।'

মুখ তুলল মেয়েটা। চোখে পানি নিয়েই হাসার চেষ্টা করল একটু।

'এত তাড়াতাড়ি ওরা চলে গেল,' বিষণ্ন কণ্ঠে জবাব দিল সে। 'আর কখনও ফিরে আসবে না?'

'তা তো আমি বলতে পারি না। কে জানে? হয়তো আসবে?'

'কিন্তু ওরা গেল কোথায়, আলেক্স?' ছেলেদের একজন জিজ্ঞেস করল।

'দেশে···অনেক দূরে···এখান থেকে হাজার হাজার লিগ···।'

'লিগ কী?'

'লিগ? দাঁড়াও একটু ভেবে নেই···যদি আমাদের এই দ্বীপটার সঙ্গে এর অর্ধেক আরেকটা জুড়ে দেয়া হয় তাহলে এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত যেটুকু দূরত্ব হবে তা-ই এক লিগ।'

'বলছ এরকম হাজার হাজার লিগ ওদের পাড়ি দিতে হবে দেশে পৌঁছানোর আগে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আর ওদের দেখতে পাব না আমরা-আঁ-আঁ!'

'মেরি! মেরি! তুমিও আবার র‍্যাচেলের মত কান্না শুরু কোরো না! ক্যাপ্টেন ফলগার, মিস্টার ওমেরার ওঁদের আত্মীয় স্বজনদের কাছে যাবেন না? দেশে তোমাদের মতই ছোট্ট বাবু বাচ্চা আছে ওঁদের। ওঁরা দেশে গেলে তারা কেমন খুশি হবে একবার ভেবেছ?'

'দেশে যেতে কে মানা করছে ওদের? আমি চাই ওঁরা আবার আসুন আমাদের এখানে। কিন্তু দেশ যদি এত দূর হয়···বলে তো গেলেন আবার আসবেন, কিন্তু···'

'হয়তো ওঁরা আসবেন। তবে জাহাজের ব্যাপার তো, জোর করে কিছু বলা যায় না।'

'কোথায় ওঁদের দেশ?'

'ওই দিকে।'

'আমাদের দেশের মত?'

'অ্যাঁ···হ্যাঁ, অনেকটা। তবে যতটা আমাদের মত তার চেয়ে বেশি আমাদের মত না। ওঁদের দেশটা বিরাট। আমাদের এই দেশের মত শত শত কি হাজার হাজার দেশ এক করলেও ওটার সমান হবে না। শীতকালে ওখানে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে। এত ঠাণ্ডা যে ঝরনার পানি জমে যায়।'

'জমে যাওয়া মানে কী?'

'আঁ···ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না তোমাদের। পানি ঠাণ্ডা থেকে আরও ঠাণ্ডা হতে হতে জমে যায়; শক্ত পাথরের মত হয়ে যায়। ইচ্ছে করলে তার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারবে তুমি।'

'তা কী করে হয়, আলেক্স! যিশুর মত আমি পানির ওপর দিয়ে হাঁটব কী করে?'

'না, রবি, ব্যাপারটা সেরকম না। যিশু আমাদের এখানে যেমন, এমন পানির ওপর দিয়েই হেঁটেছিলেন। কিন্তু যেসব জায়গায় অনেক ঠাণ্ডা সেখানে পানি শক্ত হয়ে যায় পাথরের মত। পাথরের ওপর দিয়ে আমরা যেমন হাঁটতে পারি সেই পানির পাথরের ওপর দিয়েও তেমন হাঁটা যায়। আমি নিজে হেঁটেছি।'

আরেকটা ছেলে এবার উৎসুক চোখে তাকাল ওর দিকে।

'আমি ওই পানির পাথর দেখতে চাই! আলেক্স, আবার যদি ওরা আসে আমি যেতে পারি না ওদের সাথে?'

'তুমি যেতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

বছর বারো বয়েসের একটা মেয়ে হাত চেপে ধরল ছেলেটার।

'না, তুমি যাবে না, ড্যান! আমরা তোমাকে যেতে দেব না!'

'আমি আবার ফিরে আসব তো।'

'ফেরার ইচ্ছা তোমার মনে থাকবে তাতে সন্দেহ নেই,' বলল স্মিথ, 'কিন্তু সে সুযোগ পাওয়ার জন্যে হয়তো বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে। এমনও হতে পারে সুযোগ পেলেই না জীবনে। ভেবে দেখ, ড্যান, কেমন একা লাগবে তোমার: আমাদেরই বা কেমন লাগবে তোমাকে ছাড়া? না, বাবা,যা-ই ঘটুক, যা-ই আসুক এখানেই থাকবে তোমরা। দেশ ছেড়ে কেউ কোথাও যাবে না। তোমরা জানো না ও জায়গা কেমন!'

'জানতে চাই! আমরা সবাই! ওই সব দেশের কথা আমাদের বলোনি কেন তুমি?'

'এতদিন হয়ে গেল ওখান থেকে এসেছি যে প্রায় ভুলেই গেছি অমন জায়গা আছে।'

'এখন বলবে তো?'

'হ্যাঁ, আলেক্স, বলতে হবে!'

'আজ রাতেই শোনাবে ওই দেশের গল্প?'

দূরের জাহাজটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে সবাই আগ্রহী চোখে তাকাল স্মিথের দিকে।

'আচ্ছা, আচ্ছা। দেখা যাবে...'

'না, দেখা যাবে না, কথা দিতে হবে!'

'আচ্ছা দিলাম। তবে আজ রাতে না। পরে কোন এক সময় শোনাব। ওই যে থার্সডে আর ম্যাট আসছে। দৌড়াও ক্যানো তুলতে সাহায্য করোগে ওদের। ড্যান, জন, রবি–তিন জনই যাও...আর র‍্যাচেল, মেরি, তোমরা বাসায় চলে যাও, অন্ধকার হওয়ার আগেই। মাকে বোলো আমি আসছি এক্ষুণি।'

সূর্য ডুবে গেছে। তার শেষ লালিমা দ্রুত বিদায় নিচ্ছে আকাশ থেকে। পুব আকাশে সন্ধ্যার প্রথম তারা মিটমিটিয়ে উঠেছে। জাহাজটা এখন দিগন্তের সঙ্গে মিশে গেছে। তবু গালে হাত, হাঁটুতে কনুই রেখে তাকিয়ে আছে বৃদ্ধ নাবিক। ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে যতক্ষণ দৃষ্টি চলল ততক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। তারপর উঠে ধীর পায়ে নেমে চলল পাহাড়ের গা বেয়ে বসতির দিকে।

***

অনুবাদ

পিটকেয়ার্নস আইল্যান্ড

মূল: চার্লস নর্ডহফ/জেমস নরম্যান হল

রূপান্তর: নিয়াজ মোরশেদ

জনহীন দ্বীপ পিটকেয়ার্ন-এ আশ্রয় নিয়েছে বাউন্টির বিদ্রোহীরা।
সঙ্গে আছে বারোজন ইন্ডিয়ান রমণী আর ছ'জন পুরুষ।
তিন বছর নির্ঝঞ্ঝাটেই কাটল। তারপর
শ্বেতাঙ্গরা দাস বানিয়ে ফেলতে চাইল ইন্ডিয়ানদের,
দ্বীপটাকে ভাগ করে নিতে চাইল নিজেদের ভেতর।
প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে উঠল ইন্ডিয়ান পুরুষরা।
শুরু হলো হত্যাকাণ্ড···

পনেরো বছর পর আমেরিকান সীল শিকারী জাহাজ
'টোপায়' গিয়ে দেখল, কিছু মধ্যবয়সী পলিনেশীয়
রমণী আর দু'ডজন শিশু-কিশোর বাস করছে পিটকেয়ার্ন-এ
একজন মাত্র শ্বেতাঙ্গ পুরুষের শাসনাধীনে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০